ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা □ জুলাই-আগস্ট ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

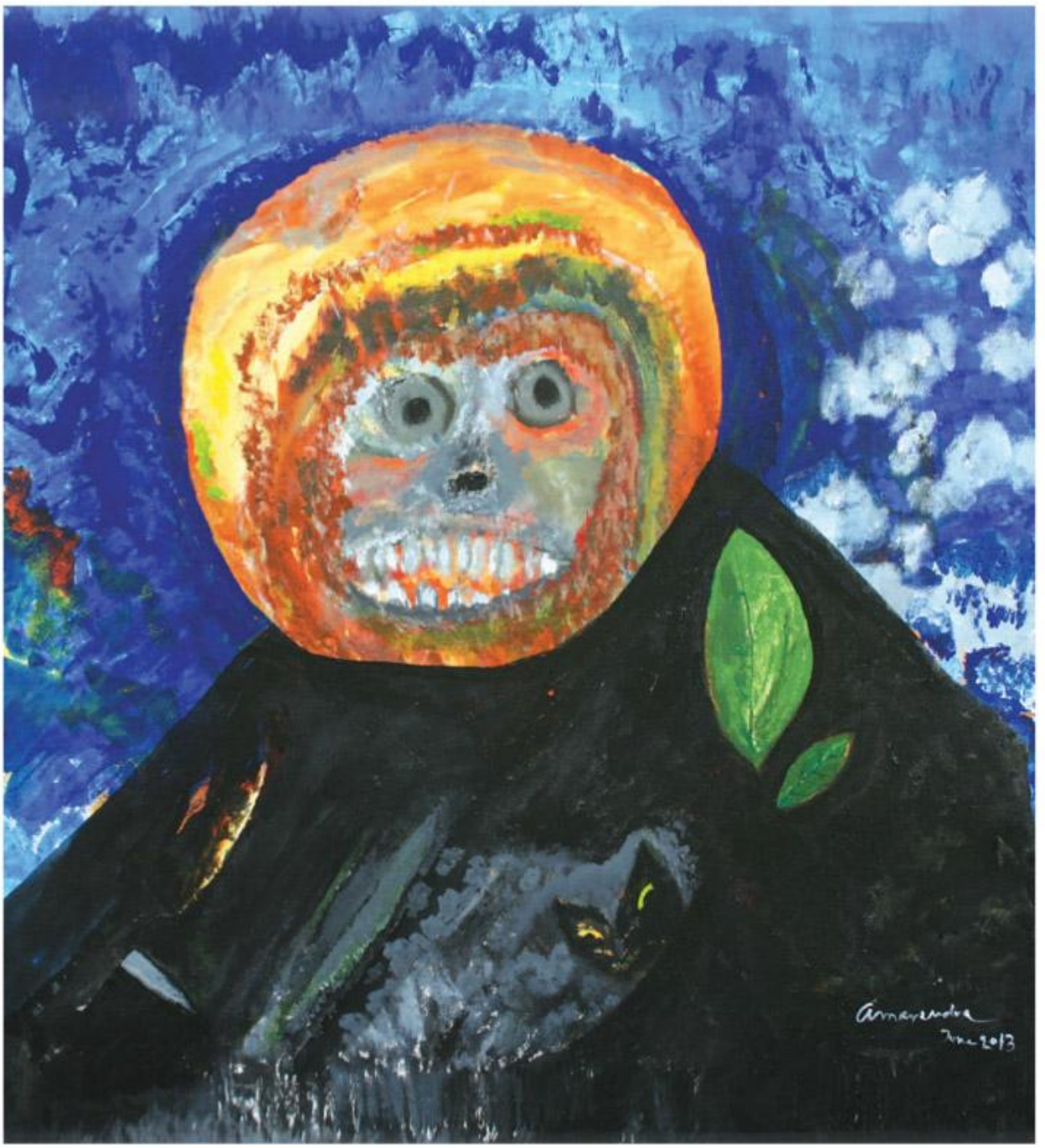

ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ২৪"×২৪"। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

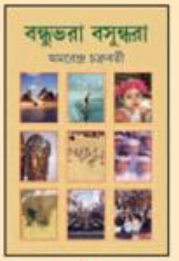

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

জীবনে আমি চাকরি পাইনি বলে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে, তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়ত একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ
ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা। জুলাই-আগস্ট ২০১৩। শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৮। শব্দবক্র ৮

চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডী লাহিড়ী। গোমুখে রহস্যময়ী ৭

পত্রস্মৃতি। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি ৩৩
সূত্র-সংযোজন: দময়ন্তী বসু সিং

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। লেখক-পরিচিতি। প্রতাপকুমার রায় ৬০

হেঁয়ালির ছন্দ। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

স্বনির্বাচিত দুটি গল্প। ভগীরথ মিশ্র ৪৬
অপরাহ্নের আলো ৪৭ বাঘ দেখা ৫১

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৪

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৩৮

বিষাদগাথা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৭৫

ফাদার লুই ১০ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১২
মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

প্রসঙ্গ দেবব্রত বিশ্বাস ৫৪
বরণীয় শিল্পীর স্মরণীয় সঙ্গ। সবিতেন্দ্রনাথ রায়

ক বি তা র পা তা

বীথি চট্টোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত ছয়টি কবিতা ৭১

কবিতা-পরিচয়

ফুল ফুটুক না ফুটুক: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬৮
শঙ্খ ঘোষ

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● অমিতাভ দাশগুপ্ত ৭০

ভ্র ম ণ ক থা

বন্ধুভরা বসুন্ধরা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ২৭

প্র য়া ণ লে খ

শিল্পী গণেশ পাইন। তপন ভট্টাচার্য ৬২
ইন্দ্রনাথ মজুমদার ৬৭

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
সদর স্ট্রিট ৮৫

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৮৭। বই-ঠেক ৮৯

প্রচ্ছদ: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক। ২৪"×২৪"। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই

তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

বকবকম

পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
নবম মুদ্রণ। ₹২০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে

আমার ছেলেবেলা

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹১৮

পবিত্র সরকারের

কথামালা: ছড়ায় ঢালা

চতুর্থ মুদ্রণ। ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই

গৌর যাযাবর

বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০

আমাজনের জঙ্গলে

ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

বরফের বাগান

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫

শাদা ঘোড়া

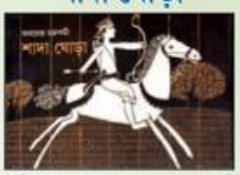

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

নানা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

ঋষিকুমার

পাতায় পাতায়
দেবব্রত ঘোষের ছবি। ₹২০

আমার বনবাস

₹১২

এছাড়াও: পাখির খাতা ₹৪০ টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ₹১৫ তালগাছের ডোঙা ₹২০ হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 Fax: 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২০ □ জুলাই-আগস্ট ২০১৩

ক্ষমতার দরকার শুধু তখনই যখন ক্ষতিকর কিছু করতে চান,
নাহলে তো ভালোবাসাই যথেষ্ট, তাতেই সব কিছু করা যায়।
চার্লি চ্যাপলিন

উৎসর্গ

'যাঁর ডাকে ২১ জুন ২০১৩-র মহামিছিল হাজার হাজার প্রতিবাদীদের পদধ্বনিতে মুখর ও সুরসম্পূর্ণ হয়ে উঠল, সেই শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ ও মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনস্রোতকে প্রণাম' জানিয়ে যিনি মানবিক ন্যায়-অন্যায়ের সমকালীন সংঘর্ষস্রোতে চিরকালীন সত্যসন্ধানী, সেই নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন-কে এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

স ম্পা দ কী য়

আমাদের রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, বামফ্রন্ট আমলের শেষ দশ-পনেরো বছরের স্বেচ্ছাচারী, দুরাচারী, অমানুষিক দলশক্তিনির্ভর, ব্যাপক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একক যুদ্ধে জয়ী, নির্যাতিতের পাশে সদাই বরাভয়দাত্রী, বাংলার দিদি বিপুল জনসমর্থনে, যেন-বা 'দুর্গতিনাশিনী' হয়ে রাজ্যের শাসনভার হাতে নেবার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর কাছে এই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় আমার একটি স্বপ্ন নিবেদন করেছিলাম। সাধারণ্যে পাঠানুরাগ জন্মানোর উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে অল্প আয়ের মানুষের হাতে খুব সস্তায় ভালো ভালো বাংলা বই পৌঁছে দেওয়ার দিবাস্বপ্ন। এই আশায় পেশ করেছিলাম যে, পার্কস্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ডে বিনা তদন্তে তাঁর নির্বিচার ঘোষণা— 'ওসব সাজানো ঘটনা' কিংবা কাটোয়ায় ট্রেন থেকে নামিয়ে বন্দুক ধরে মেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ প্রসঙ্গে নিরুদ্বিগ্ন রায় দান 'ওর স্বামী একজন সি পি এম' ইত্যাদির বিপরীতে, এমনকী আর্থনীতিক বিচার-বিশ্লেষণ হেলায় হারিয়েও, বহুজনের মনে আশা জাগানো রাজ্যের এই নতুন কর্ণধারকে প্রায় আদর্শতাড়িত কৈশোরের আবেগে যে-কোনও অভাবমোচনে ঝাঁপ দিতে দেখা যাচ্ছিল। তখনও বাংলার জনপ্রিয় দিদির দোষত্রুটি বা ভুলভ্রান্তির উল্লেখমাত্র অহংসর্বস্ব তর্জনগর্জন বা দিশাহারা স্বৈরীস্বর দেখা বা শোনা যায়নি।

বই পড়াকে সার্বজনীন নেশা বা দিনযাপনের অঙ্গ কীভাবে করা সম্ভব আমি জানি না। এর সমাজতাত্ত্বিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, ধর্মতাত্ত্বিক, এমনকী নৃতাত্ত্বিক কার্যকারণও আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। আমি শুধু বুঝি এর অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা। আমি শুধু ভাবি, বই নির্ভরতা ছাড়া মানুষ তার লক্ষ্যের অভিমুখে নিরন্তর যাত্রা চালু রাখবে কী করে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবন নিজেই এক মহাগ্রন্থ, বই-ই তার যোগ্য বাহন।

এবছর জুনে দক্ষিণ কোরিয়ায় সোল আন্তর্জাতিক বইমেলায় বই পড়াকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে আমার সেই দিবাস্বপ্নের বাস্তব চেহারাই দেখে এলাম। সেমিনারের সূত্রধর বা ফোরামের ছত্রধর সাজার ফাঁকে এই বিশ্ব বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে দেশটার বইচিত্র দেখে, বইবিস্তার বুঝে আমি মুগ্ধ। শহরের প্রান্তে তেপান্তরের মাঠের আয়তনে গ্রন্থবিপনি ও রাজধানী থেকে দূরে আলাদা একটা 'বুক সিটি' বা বইশহরে সারাদিন আমি আসলে আমার স্বপ্নের বাস্তব নির্মাণের মধ্যে জেগে কাটালাম।

তিরিশ বছর আগে 'যুগান্তর'-এ আমাদের এই কলকাতা শহরে বাংলা প্রকাশন শিল্পের বহুতল বইতীর্থের স্বপ্ন লিখেছিলাম, এত কাল পরে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে তার সূচনা দেখে মন নেচেছিল, এতদিনেও শেষ হল না দেখে দুঃখ হয়।

আমার পুরনো সেই স্বপ্ন এখানে আরেকবার তুলে দিলাম:

"কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় বাংলা বইয়ের আঁতুড় ঘর। ওই অঞ্চলে বা কাছাকাছি কোনও জায়গায় কলকাতা পুরসভা কি বইয়ের একটা বহুতল সুপার মার্কেট বানিয়ে দিতে পারেন না? চার-পাঁচটা লিফটওলা পনেরো-কুড়ি তলা বাড়ি। কী স্থাপত্যের সৌন্দর্যে, কী স্থান সঙ্কুলানের দিক থেকে ওই বই-বাজার হতে পারে কলকাতার এক পরম গর্ব, বাঙালির চোখের মণি। ম্যুরাল শোভিত, স্থায়ী প্রদর্শন ও বিক্রয় কক্ষ-সমৃদ্ধ ও এইরকম আরও অনেক ঐশ্বর্যে সাজিয়ে আমাদের বই-বাজারকে আমরা করে তুলতে পারি কলকাতার চলতি মুহূর্তের বৃহত্তম গ্রন্থাগার। বাঙালির সবচেয়ে বড় মানস ভ্রমণের দেশ। ...খুব সংক্ষেপে বললাম। শুধু একটা ভাবনার আভাস।"

—প্রথম প্রকাশ: 'যুগান্তর', ২৪ মার্চ ১৯৮২

স্বর্ণাক্ষরে সংগ্রহযোগ্য

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক

বিমল মুখার্জির

দুচাকায় দুনিয়া

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের

ভ্রমণবই

ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের

ইছামতীর মশা

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।

দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের

দেশে দেশে

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০**

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের

বহু দেশ ঘুরে

বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং

যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই। দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০

নতুন বই

মৈত্রেয়ী নাগের

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

নেকড়ের চোখ

বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ** ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

---

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে

₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়

অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:

for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ

গোমুখে রহস্যময়ী

লেখা ও ছবি: চণ্ডী লাহিড়ী

গোমুখে যাওয়ার পথে ভুজবাসায় রাত্রিবাস করছি। সেই বরফঘরের অস্থায়ী কেয়ারটেকার তখন গোপালদা। লালবাবা বাইরে। সেই ঘরে আমাদের সপরিবার আশ্রয়। গোমুখ যাওয়া একদিন পিছোলে বিশ্রাম হবে। গোপালদা (লালবাবার প্রধান চেলা) আমায় বললেন— বাঁদিকের ওই বরফের চাঁইটা কষ্ট করে পার হয়ে একটু যান, দেখবেন সাদা হরিণ। বৌদি ও মেয়ের কষ্ট হবে। তাদের নেবেন না।

কষ্ট হল খুবই। দেখি এক টুকরো স্বর্গ। ভূর্জ গাছের পাতা ঝরে গেছে। কালো ডালগুলো সাদা বরফে দাঁড়িয়ে। ধবধবে সাদা হরিণের পাল সেই শুকনো পাতা চিবোচ্ছে। আর খুব কাছেই, এক শ্বেতাঙ্গিনি পাশে ব্যাগ ও পোশাক রেখে ধ্যানে মগ্ন। অনেকটা দূর থেকে সব আমি দেখছি। পায়ের সামান্য শব্দে সাদা হরিণ পালাবে। মনে হচ্ছে, স্কুলে-পড়া তুন্দ্রা অঞ্চল।

তুষার-কুঠরিতে ফিরে এসে গোপালদাকে সব বললাম। এইজন্যই আপনাকে একলা যেতে বলেছি। ওই মেমসাহেবের ছেলে পা পিছলে পড়ে ওইখানে মারা যায়। উনি ওখানে এসে ধ্যানে বসেন। কখন আসেন, কোথায় থাকেন কেউ জানে না। অথচ আমাদের এই কুটির ছাড়া এই বরফের দেশে আশ্রয়ও নেই! এখানে নাকি ছেলের সঙ্গে কথাও বলেন।

ক্ষনের বচন

৭২

ঘোড়া যদি ঘুঙুর পায়
মোল্লা যদি খোল বাজায়
হাতির দাঁতেই যদি বাঁশি
মিলে মিশে কাঁদি হাসি

৭৩

স্বপ্ন দেখিয়ে যদি সেই স্বপ্ন ভাঙো
মরুভূমি হয়ে যায় শ্রাবণের গাঙও

৭৪

দেশকে পৈতৃক ধন যদি ভাবে রাজা
ক্রোধোন্মত্ত মন তার লোভে ভাজা-ভাজা

৭৫

কার কত দেশপ্রেম তা নিয়েও কুস্তি?
দুই দলই মনে মনে এত দ্বেষ পুষতি?

৭৬

নদীই জীবন, নদী মাতৃস্তন্যপান।
সয় না সে তার হত্যা, তার অপমান!

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

৭৬। সাজেহাল

বিশেষণ; যে পরিস্থিতিতে ভরা আলমারির সামনে দাঁড়িয়েও কিছুতেই ঠিক করা যায় না কেমন সাজপোশাক করা উচিত।

— বিদেশ থেকে বড়সাহেব এসেছেন, লেট করার আর দিন পেলেন না?

— কী করব বলুন, বড়সাহেবের সামনে তো আর প্রতি শুক্রবারের মতো টি-শার্ট পরে আসা যায় না। আবার কোটবুট চড়ালে অন্যরা কী ভাববে? এমন সাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম যে কী বলব।

— বড়সাহেব তলব করলে কী বলবেন তাই ভাবুন, নয়তো এবার নাজেহাল হতে হবে।

৭৭। রেশবিহারি

বিশেষণ; যে ব্যক্তি সর্বদাই ঘটমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে উদাসীন থেকে যা ঘটে গেছে তার স্মৃতির মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন > সুবিমলবাবুর মতো রেশবিহারি লোক কম দেখা যায়। ছেলের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় তাকে পড়াতে বসে নিজের স্কুল জীবনের গল্পই করেছেন বেশি। গতকাল মেয়ের বিয়েতে ঠাকুরমশাইকে বারবার বাধা দিয়ে মেয়ে আর হবু জামাইকে নিজের বিয়েতে কী কী নিয়ম মানা হয়নি তাই ঘটা করে শোনাচ্ছিলেন।

৭৮। মীমাংসাশী

বিশেষণ; কোনও জটিল অবস্থার সুরাহা করার জন্য কোনওরকম সহযোগিতা না করে কেবল সমাধানের দাবি করতে থাকেন যিনি > শহর রোগমুক্ত রাখার ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না, তবে সব নাগরিক যদি নিজ নিজ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে এমন মীমাংসাশী হয়ে ওঠেন, তাহলেই বা চলে কী করে?

৭৯। সাঁঝবাতিল

বিশেষণ; যে ব্যক্তি বা ঘটনা একটা আমোদের সন্ধে অনায়াসে মাটি করে দেয় > আর ধন্যবাদ জানাতেই হয় আমাদের অতি আপন বাচ্চুদাকে... আমন্ত্রিত শিল্পী খবর না দিয়ে অনুপস্থিত, এমন সাঁঝবাতিল ঘটনা সত্ত্বেও উনি পুরো একটি ঘণ্টা সকলকে হাস্যকৌতুকে মাতিয়ে রাখলেন।

৮০। সিরিয়ালিক

ক্রিয়া; সিরিয়ালের নেশাগ্রস্ত কেউ একটা কোনও এপিসোড মিস করে গেলে তাকে পরের বেলার রিপিট দেখার সুযোগ না দিয়ে কী ঘটেছে তা যেমন তেমন করে শুনিয়ে দেওয়া > শাশুড়িকে ফেলে পুজোর বাজার করতে যাওয়া? ফেরো না বাছা, এমন শোধ তুলব না! একেবারে তিন তিনটে সিরিয়ালিক করে দেব!

শব্দবক্রমুণি

হেঁয়ালির চন্দ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকস্মৃতি, যা নিয়ে ফোকলোর-বিদ্যা, তার বিপুল উপকরণের একটা বড় ভাগ ছড়া-প্রবাদ-হেঁয়ালির ভাগ। হেঁয়ালি— সেও বহুলতই হেঁয়ালি ছড়া। একটু ভাষার বেঁক আর একটু ছন্দের দোলা— দুয়ে জোড়া হয়ে সে হয়েছে স্মরণযোগ্য, উপভোগ্য।

লোকমুখের সেসব হেঁয়ালি-কথার ওপরে সংগ্রাহকের ভাষার ছন্দের দাগরাজি চড়েছে কোথাও, অন্তঃকরণ তাতে হয়তো বদলায়নি।

।। ১ ।।
সারা জন্মো তারিয়ে খেলুম
ছোটো মেজো হরপ,
পরখ করে গেলুম যত
শাস্ত্রপুঁথির স্বরূপ,
নির্বিবাদে হাতড়ে বেড়াই
চতুঃষষ্ঠী কলা,
বিদ্যেদেবী সরস্বতীর
সব ক-টি মহলা,
বলব কী ভাই দুঃখু, লোকে
বললে না একবারও—
বিদ্যেসাগর, শাস্ত্রনিধি,
কিম্বা কলাকারও

সিম্‌ফোসিয়স্।

।। ২ ।।
একজন তার চোখ আছে, মাথা নেই।
একজন মাথা আছে বটে, চোখ নেই।
নেহাৎই ইচ্ছে করো যদি, জানবেই,
ধরো, এই নাও, ধরিয়ে দিলাম,
একটা সুতোর খেই।

ক্রিস্টিনা রসেটি।

।। ৩ ।।
ভুঁই থেকে গগন
গেরো বাঁধতে হল মন।
গগন বড়োই উচ্চে।
তবে কয় বাছুরের পুচ্ছে
জোড় দিয়ে যায় বাঁধা,
বলতে পারো দাদা?

উইল্কিন ডি ওর্ড সংগৃহীত বিলিতি ধাঁধার ছড়া।

।। ৪ ।।
সাধু ক্লারেতাসের প্রশ্ন
মাস নেই গায়ে, তবু ওড়ে দ্রুতগতি?
আপনি মরেও বহু সন্তানবতী?
নিঃসাড়ে ঢোকে দোর খোলা না পেলেও?
বলো, কী জমে না হাজার ঠান্ডাতেও?

।। ৫ ।।
এই কথাটার জবাব দাও তো সব:
কোন্ সে বাড়িতে অহরহ কলরব?
অথচ সে বাড়ি ঘরবাসী সব বোবা।
বাড়িটিও মনোলোভা।

'আপোলোনিয়স্ অফ টায়ার'।

।। ৬ ।।
হি টি পি টি দেয়াল-ভিটি
চাঁচবেড়া আর চাপদাড়িটি,
হাত দিয়ো না, খোক্‌না সোনা—
কামড়ে দেবে হি টি পি টি।

বিয়াট্রিক্স্ পটার।

।। ৭ ।।
শেকড় রয়েছে, কেউ চোখে দেখে না তা।
অতিকায় গাছ, তারও চেয়ে উঁচু মাথা।
উঁচু, আরো উঁচু উঠে যায় তবু
দশ মাথা তুলে তুলে—
গাছ না যদিও, বাড়ছে না তিলে তিলে।

জে. আর. আর. টল্‌কিন।

।। ৮ ।।
সারং ধরেছে সারং।
গর্জে উঠল সারং।
সঘন নিখাদে নভ মুখ করে
গান গেয়ে ওঠে সারং।
আচমকা খসে যায় মুখ থেকে
ত্রস্ত চকিত সারং।

।। ৯ ।।
শিল্পের সন্তান, যারে প্রকৃতি সামোদে থাকে ঘিরে,
আয়ু বৃদ্ধি না করেও উপেক্ষা করে যে মৃত্যুবাণ;
অবিকলতম— যবে ভেক ধরে আরেকজনার,
যেমন তরুণ-দিনে, বার্ধক্যেও তেমনই অম্লান।

জাঁ জাক্ রুশো।

।। ১০ ।।
ধোঁয়া-সাগরের মাথায় মাথায় টানা
ঝলমল করে ঝিনুক-মোতির সেতু—
ওই উঁচু ধ'রে তখুনি ছায়ায় ছায়ায়
আবছায়া হয়ে ভেসে ভেসে গেল সে তো—

ফ্রিডরিশ শিলার।

।। ১১ ।।
পরিচয় দেবো? মেয়েদের আর
কী বা পরিচয় আছে বলবার!
বুড়ো বর, আছে সিদ্ধি বিভোল।
বিষ ভরা মুখ, কুকথা কেবল।
খালি বাদাবাদি আমার সঙ্গে,
অতি নিগ্‌গুণ, মুখে আগুন গো!
ভূত নাচিয়ে সে ফেরে ঘর ঘর,
জুটোলো পাষাণ বাপে হেন বর...

ভারতচন্দ্র রায় (অনুসরণে)।

।। ১২ ।।
হে সাধু, নিশ্চিন্তে ঘোরো এখন এ পথে,
কুকুরের উপদ্রব নেই হেথা আর!
গোদাবরী-কূলের ওই ঘন বন হতে
বীর সিংহ এসে তাকে করেছে সংহার।

উত্তর:
(১) উইপোকা। *রোমান।* (২) ছুঁচ, আর আলপিন। *বিলিতি।* (৩) একটা লেজেই হয় যদি সে হয় মোটামুটি লম্বা। *বিলিতি।* (৪) যথাক্রমে: তীর; শস্যবীজ; অন্ধকার; গরম জল। (৫) নদী। *অনামা গ্রিক লেখকের গদ্য কাহিনি ৯ম শতাব্দী।* (৬) কাঁটা। *বিলিতি।* (৭) পাহাড়। *বিলিতি।* (৮) 'সারং' শব্দের নানা অর্থ ধরে লেখা কবিতা, ক্রমানুসারে ১. ময়ূর, ২. সাপ, ৩. বজ্র, ৪. ময়ূরের কেকা ডাক ও সারং রাগ, ৫. ব্যাঙ। *পাঞ্জাবি।* (৯) প্রতিকৃতি-ছবি। *ফরাসি।* (১০) রামধনু। *জার্মান।* (১১) শিব, তাঁর ভার্যা গৌরী এবং অনুচর মহাকাল, এই তিন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক চরিত্রের নৃত্য-গীতের সূত্রে কবি লিখেছেন ময়ূরের (নীলকণ্ঠ) ডাক, বিদ্যুতের বিকাশ, নক্ষত্র কেঁপে ওঠা এবং বিশাল কালো মেঘের (মহাকাল ঘন) গুরু গুরু ধ্বনির কথা। *বাংলা।* (১২) কুকুরের বদলে এ বনে এখন সিংহ ঘুরছে, কাজেই এসো না, এই হল অভিপ্রায়। *পুরনো ভারতীয়।*

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ২৫।

ফাদার লুই

চারদিকে গাছপালা, ফুলের সারি আর কী বিস্ময়কর নীরবতা। এই নীরবতায় ছেদ টানে প্রহরে প্রহরে মাপা উপাসনার গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ এবং গির্জার ঘণ্টাধ্বনি।

মূল নাম টমাস মার্টন। লোকে বলেন ফাদার লুই—লুইবাবার লুই ভিলা কেনটাকি রাজ্যের সদরদপ্তর। মধ্য আমেরিকায়। সেখানে থাকেন লুইবাবা। কেনটাকি থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে গেটেসমানি—লুইবাবার আশ্রম। আড়াইশো মৌনী সাধু, গরু-বাছুর, খেত-খামার আর পাখি ডাকা, ছায়ায় ঢাকা এক ঋষি-আশ্রম। যেন ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের কোনও ঋষির আশ্রম। মনেই হয় না, নিউ ইয়র্ক বা শিকাগো এই আশ্রমের অনতিদূরে।

গেটেসমানি যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত কিছু জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী এখানে ভক্তি আর জ্ঞানমার্গের চর্চায় নিবেদিত। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে যখন এই আশ্রমের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াই, মনে হয়েছিল, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এইখানে। জায়গাটার কথা আমাকে বলেছিলেন ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটিরই অধ্যাপক ফ্লয়েড আরপান। বলেছিলেন, তুমি ভারতের লোক, জায়গাটা ভালো লাগবে। ফাদার লুই শুধু একজন পূজনীয় ব্রহ্মচারী নন, আমাদের দেশের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকও। তাঁর রচনার বিস্তর প্রভাব এদেশের মানুষের ও রাষ্ট্রের মধ্যে। ওখানে যাও, ভালো লাগবে।

সত্যিই তাই। আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখি, আর মুগ্ধ হয়ে যাই। তেমনই মুগ্ধ আশ্রমগুরু ফাদার লুইকে দেখে। শ্বেত বসন, গলায় ক্রস, বেঁটেখাটো মানুষ, পঞ্চাশের মতো বয়স, চোখে-মুখে অতল প্রশান্তি। দেখা হতেই বললেন, এখন আমি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করছি। ভালোই হল, এই সময় একজন ভারতীয়ের উপস্থিতি আমাকে প্রেরণা দেবে। লুইবাবা আমাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চারদিকে গাছপালা, ফুলের সারি আর কী বিস্ময়কর নীরবতা। এই নীরবতায় ছেদ টানে প্রহরে প্রহরে মাপা উপাসনার গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ এবং গির্জার ঘণ্টাধ্বনি। আশ্রমের খামারেই উৎপাদিত হয় সব শস্য, আশ্রমের গোশালা দেয় পিপাসা নিবারণের

দুধ এবং আশ্রমগুরুর কথায় এখানকার প্রধান কাজ হল— টু কীপ অ্যালাইভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অব আওয়ার টাইম দ্য স্পিরিট অব সাইলেন্স, প্রেয়ার অ্যান্ড পিস।

লুইবাবা আরও বললেন, আশ্রমিক হতে গেলে হওয়া চাই ধর্মে ক্যাথলিক, বয়স পনেরোর নীচে এবং অবিবাহিত। তার মধ্যে আবার নানা ভাগ— (১) ক্যয়ার মঙ্ক— যাঁদের কাজ দিন-রাত শুধু নামগান করা, (২) ক্যয়ার লেডিজ— যাঁরা আশ্রমে ও গৃহে যাতায়াতের অধিকারী এবং (৩) ব্রাদার্স। তাছাড়া সপ্তাহান্তে আসেন ঈশ্বরপ্রেমী হাজার হাজার মানুষ। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার রাত অবধি আশ্রমে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যান। স্থায়ী আশ্রমিকদের দিনে অন্তত সাড়ে চার ঘণ্টা করতে হয় কায়িক শ্রম এবং অন্তত আট ঘণ্টা চলে উপাসনা ও জ্ঞান-চর্চা। সবাই মৌনী। আশ্রমের ভেতরে রয়েছে ভাব-বিনিময়ের জন্য সাংকেতিক মুদ্রার প্রচলন। একমাত্র বাইরের লোক এলেই, যেমন আপনি, কথা বলা যায়। জরুরি কাজ ছাড়া আশ্রমের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ। রাত দুটোর সময় শয্যাত্যাগের পর উপাসনা, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনবিদ্যাচর্চা আর কায়িক শ্রমে ঠাসা দিনরাত্রি। আশ্রমিক সকলেই নিরামিশাষী। একমাত্র খাদ্য— ফল, দুধ, পনীর ও সবজি।

তিনি জানালেন, ভারতের কেরালা ও মাদুরাইয়ে এই ধরণের দুটি আশ্রম আছে। আর আছে ইতালিতে। তিনি বললেন, ভারতের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। তার কারণ আমাকে ঈশ্বরমুখী করেছেন এক ভারতীয় বাঙালি। নাম মহানামব্রহ্ম ব্রহ্মচারী। থাকেন কলকাতার মানিকতলা মেন রোডে। আমি খ্রিস্টের সেবক। কিন্তু আমার গুরু প্রকৃতপক্ষে উনিই। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে তিনি ছিলেন আমার সহপাঠী। তারপর শিকাগো। ডঃ ব্রহ্মচারীর মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম এক পরিপূর্ণ মানুষকে, যিনি অন্তর্মুখী, ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং সত্ত্বগুণে ঐশ্বর্যবান। তিনি আমাকে প্রভাবিত করেছেন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠায়। তাছাড়া ভারতের একজন প্রাচীন বৌদ্ধভিক্ষুর বাণী আমার আশ্রমের ও জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি ভিক্ষু শান্তিদেব।

লুইবাবাকে বললাম, আমাদের দেশের আর একজন মহাপুরুষ, মহানামব্রহ্ম ব্রহ্মচারীর উপাস্য, সেই চৈতন্যদেব বলেছেন, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা, তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' 'ঠিক তাই'— লুইবাবা আমার কথার খেই ধরে বললেন— ওটাই হচ্ছে ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। সেই কারণেই দরিদ্র ভারত সুইডেন বা আমেরিকার চেয়ে সুখী। মনুষ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাচ্যের দান জ্ঞানে আর পাশ্চাত্য দিয়েছে বিজ্ঞান। পূর্ব দেশ অন্তর্মুখী— ভেতরে তাকায়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি বাইরে। তাই সে অসুখী। তাই সে এত বিলাস বৈভব সত্ত্বেও নিজেকে চেনে না। এই না-চেনা তাকে নিয়ে চলেছে পতনের দিকে, ধ্বংসের মুখে।

গেটসমানি— লুইবাবার আশ্রম।

মনুষ্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রাচ্যের দান জ্ঞানে আর পাশ্চাত্য দিয়েছে বিজ্ঞান। পূর্ব দেশ অন্তর্মুখী— ভেতরে তাকায়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি বাইরে। তাই সে অসুখী। তাই সে এত বিলাস বৈভব সত্ত্বেও নিজেকে চেনে না। এই না-চেনা তাকে নিয়ে চলেছে পতনের দিকে, ধ্বংসের মুখে।

লুইবাবা আরও বললেন, কমিউনিজম সম্পর্কে এত ভয় কেন মার্কিনীদের? এতে ভয়ের কী আছে? আগে যে কমিউনিজম ছিল, এখন কি তাই আছে? রাশিয়া, চিন, কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া— সর্বত্র তার রকম আলাদা। এই আশ্রমই হচ্ছে সত্যিকারের কমিউনিজম স্টেট। এখানে সাধুদের যা রোজগার, তা যায় আশ্রমের যৌথ ভাণ্ডারে। আমাদের কারও কোনও নিজস্ব সম্পত্তি নেই এই আশ্রমে।

জানতে চাইলাম ওঁর জীবনের কথা। একটু হেসে বললেন, অতীত জেনে কী হবে? এই আশ্রমই আমার সব। আমার জন্ম ১৯১৫ সালে। স্পেনে। মা বাবা ও দাদার মৃত্যুর পর চলে আসি আমেরিকায়। পড়ি দর্শনশাস্ত্র। আলাপ হয় মহানামব্রহ্ম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কবিতা ও ছোটগল্পের বই আছে কয়েকটা। ১৯৪১ সাল থেকে এখানে আছি। এটাই আমার সব। আমার কোনও পারিবারিক সম্পর্ক নেই।

লুইবাবার কাছে জানতে চাইলাম, এ যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী? তৎক্ষণাৎ উত্তর— আমরা মানুষই বড় সমস্যা। মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী যন্ত্র। সে-ও ভয়াবহ। এ যুগের মানুষ কক্ষচ্যুত, লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাই সে নিজেকেও বিশ্বাস করে না। তবু আমি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাইনি। আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' 'ঠিক বলেছেন টেগোর। আমি পড়িনি, এবার পড়ব।'

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পর ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর এক লেখায় পড়লাম লুইবাবা লোকান্তরিত হয়েছেন। তাইল্যান্ডে রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন। বড়ই দুঃসংবাদ।

। পর্ব ২৬।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গাছের তলায় ক্লাস। শান্তিনিকেতন

ডাকতাম 'দাদা', কিন্তু আসলে ছিলেন পিতৃপ্রতিম। স্নেহে-মমতায়-শাসনে বাবার মতোই কখনও চোখ রাঙাতেন, আবার অন্য সময় পরম স্নেহে— ক্লাস করার ফাঁকে নিজের আড্ডার এককোণে বসিয়ে দিতেন। এই ছিলেন হীরেনদা— আমাদের শান্তিনিকেতনের ইংরিজির অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সারা জীবন অতিবিখ্যাত এক বাঙালির নাম বহন করে গিয়েছেন, প্রচুর বই লিখেছেন— গল্প, রম্যরচনা, অনুবাদ— নানাধরণের বই এবং প্রচুর আড্ডা দিয়েছেন ছাত্র ও অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আরে, আসল ইউনিভার্সিটি তো গাছের তলায় নয়— এই কালোর দোকানে, চায়ের আড্ডায়।' সেই আড্ডানিকেতনের মধ্যমণি হিসেবে হীরেনদা আমার মতো অভাজনদেরও ঠাঁই দিয়েছেন। অবোধজনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা।

হীরেনদা লিখেছেন অজস্র, বলেছেন তারও বেশি। দেখতে ছোট্টখাট্টো মানুষ, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সুশোভিত চেহারা, রোদ্দুর ঠেকাতে কখনও মাথায় ছাতা, কখনও বই এবং মুখে সিগারেট। তিনি ছিলেন জামশেদপুরের স্কুলে শিক্ষক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চাকরি যায় এবং ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতনের স্কুলে চাকরি পেয়ে ওইখানেই পাকাপাকি চলে আসেন। শেষজীবন— অবসরের জীবন— কাটে কলকাতায়। সেখানেই তাঁর ছাত্রছাত্রী ও গুণগ্রাহীরা তাঁর ৯০তম জন্মপূর্তিতে এক সম্বর্ধনা জানায়। তার কিছুদিন পরেই জীবনাবসান, আমাদের জীবন থেকে একটি উজ্জ্বল তারা খসে গেল। হীরেনদার অভাব আজও অনুভব করি। মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে তার জবাবের অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু তিনি নেই, কে দেবে উত্তর। এখন শুধু মনে তাঁর নিত্য আসা-যাওয়া।

ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে, তাঁর বাড়িতে কিংবা কালোর চায়ের দোকানে আমাদের নিত্য আড্ডা বসত। তিনি একটার পর একটা সিজার্স সিগারেট ধ্বংস করতেন উজ্জ্বল কথার ফাঁকে। তাঁর বাকবিভূতিতে আমরা মুগ্ধ হতাম। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিত হয়ে চা-পান ও সিগারেট ধ্বংস করতে করতে যখন বেরোতেন,

তখন ছাত্র হিসেবে তাঁদের দূর থেকে দেখতাম এবং মনে মনে ভাবতাম, এই বিশেষ আড্ডায় কবে প্রবেশাধিকার পাব। পরে যখন পেলাম, তখনও হীরেনদা মধ্যমণি। হীরেনদার ক্লাসে যতটা শিখেছি তার বেশি শিখেছি তাঁর আড্ডায় এবং তাঁর বৈঠকে। শেষজীবনে যখন কলকাতায় তাঁর একমাত্র পুত্রের বাড়িতে থাকতে এলেন, তখনও সে আড্ডা মুছে যায়নি, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে পর্যন্ত চলেছে। হীরেনদার অদ্ভুত ছিল স্মৃতিশক্তি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বই না দেখেই প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারতেন।

অজস্র লিখেছেন তিনি। শান্তিনিকেতনে আসার আগেই প্রকাশিত হয় দুখানি উপন্যাস— 'বধূ অমিতা' এবং 'বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তারপর শান্তিনিকেতনে আসার পর অজস্র লেখা। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর 'ইন্দ্রজিতের খাতা' এবং 'ইন্দ্রজিতের আসর' নামে ধারাবাহিক রচনা তাঁকে রম্যরচনার ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন দেয়। সেই সময়ই তাঁর অনুবাদ লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্জির প্রেম' ও রেমার্কের 'তিন বন্ধু' কলকাতায় ছাপা হয়। 'প্রাণবন্যা' নামে আরেকটি বড় উপন্যাস লেখেন। শেষ জীবনের তাঁর উপন্যাস 'খেলা ভাঙার খেলা'। তাছাড়া রয়েছে অজস্র রচনা। তাঁর বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পুস্তকাকারে বের হয়নি। তাছাড়া তিনি কিছুদিন ছিলেন ইংরিজি 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র সম্পাদক। সেখানেও তাঁর বহু ইংরিজি প্রবন্ধ আটকে পড়ে আছে। সেগুলোও ছাপানো দরকার। সমরেশ বসুর বই 'বিবর' যখন অশ্লীলতার দায়ে তুমুল হইচই তুলেছে বাংলার আনাচে-কানাচে তখন এই হীরেনদাই 'দেশ' পত্রিকায় বিরাট প্রবন্ধ লিখে 'বিবর' বইটির দারুণ প্রশংসা করেন, হাওয়া পাল্টে যায়।

তাঁর বহু রচনা এখনও বই আকারে ছাপা হয়নি। কোনও উদ্যোগী প্রকাশকের এই দিকে নজর দেওয়া দরকার। তিনি পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার এবং আরও অনেক সম্মান পেয়েছেন অজস্র পাঠকের ভালোবাসায়— যা সেইসব পুরস্কারের চেয়েও বেশি মূল্যবান।

হীরেনদার জন্ম ১৯০৩ সালে। কুমিল্লা জেলার বাবুরহাট গ্রামে। সেই গ্রামেরই হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তাঁর বাবা সারদাচরণ দত্ত— যাঁকে গোপাল হালদার মশাই 'পুণ্যশ্লোক' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর বইয়ে। ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন 'যোগীন', তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও যোগাযোগ ছিল। তিনিই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের হাতেলেখা পত্রিকা 'আশা' প্রকাশ করেন। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরিজি অনার্স নিয়ে পড়ে ১৯২৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়। ১৯২৭ সালে বিয়ে করেন চাঁদপুরের প্রমীলা দেবীকে। প্রমীলার স্বামী বলেই পরে তিনি ছদ্মনাম নেন ইন্দ্রজিৎ। তারপর মেঘের আড়াল থেকে কলমের যুদ্ধ চলে আজীবন।

বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য জামশেদপুরে তাঁর শিক্ষকতার চাকরি চলে যায়। ১৯৪৩ সালে এলেন শান্তিনিকেতন। সেখানকার আনন্দময় জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ঘটে গেল। ইংরিজি ও বাংলা— দুটো বিভাগেই শিক্ষক হিসেবে তাঁর জুড়ি ছিল না। ১৯৫২ সালে তিনি শিক্ষাভবনের অর্থাৎ কলেজের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করবেন না— এই পণ নিয়ে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং পরে কলকাতায় এসে ছেলের বাড়িতে থাকেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়।

কলকাতায় এসেও তাঁর লেখালেখির বিরাম ছিল না। দুবার কঠিন অসুখে পড়েন, দুবারই কঠিন অস্ত্রোপচার করে তাঁকে সারানো হয়। বেশি ভোগেননি। ১৯৯৫ সালের ৬ নভেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। একটি সুখময়-আনন্দময় জীবনের অবসান ঘটে। আমরা, যাঁরা তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন, আমাদের সকলেরই হৃদয় ফাঁকা হয়ে যায় তাঁর চলে যাওয়ার পরই। সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁর মতো কেউ সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারবে না— এই আশঙ্কায় বাকি জীবন কাটাতে হবে।

তাঁর নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা 'নবতি নবীনেষু' নাম দিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে। অনেকে তাঁর সম্পর্কে ওই বইয়ে লিখেছেন, 'সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ, গ্রন্থমুগ্ধ।' 'বহুমাত্রার রসিক' হীরেনদা সম্পর্কে অনেকেই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন সেই বইয়ে।

চাঁদপুর, জামশেদপুর, শান্তিনিকেতন, কলকাতা— সর্বত্র তাঁর গুণগ্রাহী ছড়িয়ে আছেন। সকলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁর পরলোকযাত্রার পর। বাংলা আকাদেমি তাঁর লেখা বই ছাপিয়েছে এবং পরে স্মৃতিসভারও আয়োজন করেছে। সেদিক থেকে তিনি ভাগ্যবান। পরিপূর্ণ জীবনের শেষে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি জমা রেখে তিনি অমৃতলোকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু রেখে গিয়েছেন তাঁর স্মৃতির সুবাস।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কিছুদিন ছিলেন ইংরিজি 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র সম্পাদক। সমরেশ বসুর বই 'বিবর' যখন অশ্লীলতার দায়ে তুমুল হইচই তুলেছে বাংলার আনাচে-কানাচে তখন এই হীরেনদাই 'দেশ' পত্রিকায় বিরাট প্রবন্ধ লিখে 'বিবর' বইটির দারুণ প্রশংসা করেন, হাওয়া পাল্টে যায়।

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

চোদ্দ

২৯ আগস্ট রবিবার ১৯৭১

আজ হাফিজ ঢাকায় এসেছে তার গ্রামের বাড়ি থেকে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হাফিজ গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল মাকে নিয়ে। ঢাকার বাসায় শুধু ওর বড় ভাই ওয়াহিদ ছিল। তা সেও তো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে চিংকুর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল।

বিকেলে হাফিজ এ বাসায় এল রুমীর কাছে এ কয় মাসের সব ঘটনা শুনবে বলে। কিন্তু কোথায় রুমী? সে সকালে নাশতা খেয়ে জিম রিভসের রেকর্ডখানা হাতে করে বেরিয়েছে, বলে গিয়েছে— দুপুরে ওদের মিটিং আছে, তারপর ও যাবে চুল্লুর বাসায়।

হাফিজকে বললাম, 'কী জানি কোথায় গিয়েছে। ওকি কিছু বলে আমাকে? কী যে করে বেড়ায়, আল্লাই জানে। সব গোল্লায় গিয়েছে।' হাফিজ কাঁচুমাচু মুখে বলার চেষ্টা করল, যা খুশি যা-তা করে বেড়াবার মতো ছেলে রুমী নয়।

রুমী এল সন্ধ্যারও পর। হাফিজকে দেখে খুশিতে জড়িয়ে ধরে ছাদের ঘরে চলে গেল নিরিবিলি কথা বলার জন্য।

রাত নটায় খেতে ডাকলাম। নেমে রুমী বলল, আম্মা হাফিজ রাতে থাকবে এখানে। আমাদের গল্প শেষ হয়নি।'

রুমী-জামীর ঘরের এক পাশে একটা ক্যাম্পখাট পেতে হাফিজের জন্য বিছানা পাতল রুমী-জামী মিলে। তারপর রুমী বলল, 'আম্মা মাথাটা কেন জানি খুব দপদপ করছে। ভালো করে বিলি করে দাও তো।'

আমি রুমীর মাথার কাছে বসে ওর চুলে বিলি কাটতে লাগলাম, জামী, হাফিজ নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে খুব নিচুস্বরে কথা বলতে লাগল। মাসুম পাশের ঘরে শোয়— সে উঠে এসে জামীর খাটে বসল। দু'ঘরের মাঝের দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল। কথার শব্দ যেন বাবার কানে না যায়।

সাইড টেবিলে রেডিওটাও খোলা রয়েছে। একের পর এক বাংলা গান হচ্ছে। খুব সম্ভব কলকাতা। হঠাৎ কানে এল খুদিরামের ফাঁসির সেই বিখ্যাত গানের কয়েকটা লাইন।

একবার বিদায় দেয় মা ঘুরে আসি।
ওমা হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে জগৎবাসী।

রুমী বলল, 'কী আশ্চর্য আম্মা! আজকেই দুপুরে এই গানটা শুনেছি। রেডিওতেই, কোন স্টেশন থেকে— জানি না। আবার এখনও— রেডিওতে। একই দিনে দু'বার গানটা শুনলাম, না জানি কপালে কী আছে।'

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নীচে গেটে ধমাধম শব্দ আর লোকের গলা শুনে চমকে জেগে উঠলাম। বাড়ির সামনের পুবদিকের জানালার কাছে উঁকি দিয়ে দেখি— সর্বনাশ! সামনের রাস্তায় মিলিটারি পুলিশ। রাস্তার উজ্জ্বল বাতিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দৌড়ে রুমীদের ঘরে গিয়ে দেখি ওরা চারজনেই পাথরের মূর্তির মতো ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ঘরের পশ্চিমের জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলাম পিছনে বজলুর রহমান, সাত্তার ও কাসেম সাহেবদের বাড়িগুলোর সামনের রাস্তাতেও অনেক মিলিটারি পুলিশ। দক্ষিণের জানলা দিয়ে দেখলাম ডাঃ এ কে খান ও হেশাম সাহেবের বাড়ির সামনের জায়গাটাতেও

পুলিশ। উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দেখলাম আমার পুরো বাগান ভরে মিলিটারি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে! অর্থাৎ বাড়িটা একবারে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে।

আবার রুমীদের ঘরে গেলাম। রুমী দু'একবার অস্থিরভাবে পায়চারি করে বলল, 'কোনওদিক দিয়েই পালাবার ফাঁক নেই। মনে হয় হাজারখানেক পুলিশ এসেছে। রাস্তার বাতিগুলোও এমন জোরালো, একেবারে দিনের মতো করে রেখেছে।'

আমি উদভ্রান্তের মতো ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্টা করলাম, কোনওখান দিয়ে কোনওভাবে রুমীকে পার করে দেওয়া যায় কিনা! না, কোনও দিক দিয়েই কোনও ফাঁক নেই। পুরো বাড়িটার যত জানালা সবকটাতে গ্রিল, পুরো বারান্দা কঠিন গ্রিলে আবদ্ধ। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে পিছনের উঠোনে নামবে, তারও উপায় নেই। পিছনের বাউন্ডারি ওয়াল খুব নিচু। পিছনের রাস্তার বাতি আর অসংখ্য পুলিশের চোখ এড়িয়ে উঠোন দিয়েও পালানো সম্ভব নয়।

ওদিকে সামনের গেটে অসহিষ্ণু হাতের ধমাধম বাড়ি আর ক্রুদ্ধ কণ্ঠের হাঁকডাক ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমি আর শরীফ পরস্পরের দিকে তাকালাম। এই মুহূর্তে আমার মনের ভেতরে কোনও অনুভূতি আমি টের পাচ্ছি না। ভয়-ভীতি-উদ্বেগ সব ফ্রিজ হয়ে আমি যেন পুতুলনাচের পুতুল হয়ে গিয়েছি। কেউ দড়ি দিয়ে যেন আমাকে ঘোরাচ্ছে, ফেরাচ্ছে, চালাচ্ছে। শরীফের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চলো, সামনের বারান্দায় বেরিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী চায়।'

দু'জনে পুবদিকের ছোট বারান্দায় বেরলাম। শরীফ বলল, 'কে ডাকেন? কী চান?'

নীচে থেকে কর্কশ গলায় উর্দুতে কেউ বলল, 'নীচে এসে দরজা খুলুন। এত দেরি করছেন কেন?'

শরীফ আবার বলল, 'ঘুম ভাঙতে দেরি আছে। এত রাতে কী দরকার?'

এবার অন্য একজন একটু মোলায়েমভাবে উর্দুতে বলল, 'বিশেষ কিছু নয়। দরজা খুলুন।'

আমি আর শরীফ দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলাম। দেওয়ালে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম বারোটা বেজে দশ মিনিট।

সদর দরজা খুললেই পোর্চ। রাতে সামনে-পিছনে কোলাপসিবল গেট টেনে নিলে ওটা গ্যারেজ হয়ে যায়। শরীফ দরজা খুলে কোলাপসিবল গেটের ভেতর থেকে লাগানো তালা খুলে গেট ফাঁক করল। একজন খুব অল্পবয়সি আর্মি অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে ও পিছনে তাগড়া চেহারার অনেকেই। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'হোয়াট ক্যান উই ডু ফর ইউ?'

উত্তর দিকের জানালা দিয়ে দেখলাম আমার পুরো বাগান ভরে মিলিটারি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে! অর্থাৎ বাড়িটা একবারে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরেছে। আবার রুমীদের ঘরে গেলাম। রুমী দু'একবার অস্থিরভাবে পায়চারি করে বলল, 'কোনওদিক দিয়েই পালাবার ফাঁক নেই। মনে হয় হাজারখানেক পুলিশ এসেছে। রাস্তার বাতিগুলোও এমন জোরালো, একেবারে দিনের মতো করে রেখেছে।'

অফিসারটি হাত তুলে সালাম দেওয়ার ভঙ্গি করে ইংরিজিতে বলল, 'আমার নাম ক্যাপ্টেন কাইয়ুম। তোমাদের বাড়িটা একটু সার্চ করব।'

আমি বললাম, 'কেন, কী জন্য?'

'এমন কিছু না। এই রুটিন সার্চ আর কী। তোমাদের বাড়িতে মানুষ কয়জন? কে কে থাকে?

আমি বললাম, 'আমি, আমার স্বামী, শ্বশুর, দুই ছেলে, ভাস্তে—'

'ছেলেদের নাম কী?'

'রুমী, জামী—'

ওরা এগিয়ে এল। আমি একটু পাশ কেটে দাঁড়িয়ে বললাম, 'দ্যাখো, আমার শ্বশুর বুড়ো, অন্ধ, হাই ব্লাড প্রেসারের রুগি। তোমাদের প্রতি অনুরোধ, তোমরা শব্দ না করে বাড়ি সার্চ করো। উনি যেন জেগে না যান।

ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে দেখলে মনে হয় কলেজের ছাত্র। ফর্সা, পাতলা গড়ন, খুব মৃদুস্বরে ধীরে কথা বলে। তার সঙ্গের সুবেদারটি দোহারা মধ্যবয়সি। উর্দু উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় বিহারি।

ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের সঙ্গে ওই সুবেদার আর তিন-চারজন সশস্ত্র এম পি ঘরের ভেতরে ঢুকল। এবং মুহূর্তে কয়েকজন একতলায়, কয়েকজন দোতলায় ছড়িয়ে পড়ল। অভ্যস্ত নিপুণতার সঙ্গে ওরা প্রত্যেকটি ঘরের আলমারি, দেরাজ চেক করে দেখল, পিছনের দরজা খুলে উঠোনে উঁকি মারল, বাবার ঘরে পা টিপে টিপে হাঁটল, রুমীদের সবাইকে নাম জিজ্ঞেস করে নীচে নেমে যেতে বলল। আমি প্রায় সব সময়ই ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওদের নীচে যেতে বলছ কেন?'

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বলল, 'কিছু না, একটুখানি রুটিন ইন্টারোগেশান করব।' শরীফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও নীচে আসুন।' ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও নীচে নেমে এসে দেখলাম রুমী, জামী, মাসুম আর হাফিজ পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম পোর্চে এসে শরীফকে বলল, 'এটা আপনার গাড়ি? চালাতে পারেন?' শরীফ ঘাড় নাড়লে সে বলল, 'আপনি গাড়ি চালিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন।'

আমি ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শান্ত মৃদুস্বরে বলল, 'এই তো একটু রমনা থানায়। রুটিন ইন্টারোগেশান। আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই ওরা ফিরে আসবে।'

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতে কয়েকজন পুলিশ গাড়ির পিছনে উঠে বসল। আমি ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলাম, 'আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।'

শরীফ এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি থাকো। বাবা একলা।'

তবু আমি বলতে লাগলাম, 'না, না, আমি যাব।'

বিহারি সুবেদারটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, 'মাইজী, আপনি থাকেন। এনারা এক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াপস আসে যাবেন।' শরীফ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় নীরবে কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। আমি হঠাৎ যেন সম্বিৎ পেয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। তাকিয়ে দেখলাম কয়েকজন পুলিশ রুমী, জামী, মাসুমদের হাঁটিয়ে রওনা হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শরীফের পাশের সিটে উঠে বসল। শরীফ গাড়ি ব্যাক করে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম সেই শূন্য পোর্চে। তারপর বাড়ির ভেতর ঢুকে সব ঘরের সবগুলো বাতি একে একে জ্বালিয়ে দিতে লাগলাম। সদর দরজা হাট করে খোলা রইল, আমি দোতলায় উঠে গেলাম। বাবার ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। যে বাতিগুলো অফ ছিল, সেগুলো সব জ্বেলে দিলাম। তারপর ছাদে গেলাম। ছাদের ঘরের ও বাইরের বাতি দুটোও জ্বেলে দিলাম। তারপর আবার একতলায় নেমে পোর্চে গিয়ে দাঁড়ালাম। একবার গলির

মাঝখানে দাঁড়াই, আবার পোর্চে ফিরে আসি, মাঝে মাঝে বারান্দায় বসি। আধঘণ্টা গেল, একঘণ্টা গেল, দেড়ঘণ্টা গেল। ওরা ফিরে আসে না।

আমি ঘর-বার করতে লাগলাম। আমাদের গলির বিহারি নাইটগার্ডটা মাঝে মাঝে এসে আমাকে বলতে লাগল, 'মাইজী, আপনি আন্দরে যান।' আমি তার কথায় কান দিলাম না। সদর দরজা খোলা রেখে আবার দোতলায় গেলাম, ছাদে গেলাম, আবার নীচে নেমে এলাম। এবার নাইটগার্ড বলল, 'মাইজী, আপনি দরবাজা খুলা রেখে আন্দরে যাবেন না। দরবাজা বন্দো করিয়ে দেন।' আমি এবারও তার কথায় কান দিলাম না। গলি দিয়ে হেঁটে মেইন রোডের মুখ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম। নাইটগার্ডটা এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'মাইজী, আপনি নিন্দ যাবেন না?'

নিন্দ? ওকি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে? ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম কি নামবে?

৩০ আগস্ট সোমবার ১৯৭১

ভোর হয়ে আসছে। ওরা এখনও ফেরেনি। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বলেছিল আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা পরে ফিরবে। আমিও সে বিশ্বাসে ঘর-বার করে পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম? ওরা তো সোজাসুজি ধরে নিয়ে যেতে পারত কিছু না বলে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম মিথ্যে কথা বলল তাহলে?

ক্যাপ্টেন কাইয়ুম গাড়িতে ওঠার আগে ওর ফোন নম্বরটা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেন জিজ্ঞেস করেছিলাম? তাহলে কী অবচেতন মনে আমারও সন্দেহ ছিল যে ওরা অত তাড়াতাড়ি ফিরবে না?

ঘড়িতে ছটা বাজল। জুবলির বাসায় ফোন করলাম। জুবলির ভাইয়ের ছেলে হাফিজ আমাদের বাসা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে— তাকে খবরটা আগে জানানো দরকার। একটা আশার কথা, জুবলির বড় ভাই ফরিদ এখন ঢাকার ডি সি। উনি হয়তো এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারবেন।

তারপর ফোন করলাম মঞ্জুরকে, মিকিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে জুবলি, মাসুমা আমাদের বাসায় এসে গেল। ওদের দেখে এতক্ষণে এই প্রথম আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ওরা আমাকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে চুপ করে রইল। সান্ত্বনার ভাষা কারও মুখে নেই। ওরাও তো সমান দুঃখে দুঃখী। একজনের স্বামী, অন্যজনের ভাই বর্বর পাকবাহিনীর বন্দিশালায়।

একটু পরে নিজেকে সামলে বাবার ঘরে গেলাম ওঁকে উঠিয়ে মুখ-হাত ধুইয়ে হলে

ভোর হয়ে আসছে। ওরা এখনও ফেরেনি। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বলেছিল আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা পরে ফিরবে। আমিও সে বিশ্বাসে ঘর-বার করে পাঁচ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম? ওরা তো সোজাসুজি ধরে নিয়ে যেতে পারত কিছু না বলে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম মিথ্যে কথা বলল তাহলে?

ইজিচেয়ারে বসাতে। জুবলি, মাসুমা রান্নাঘরে গেল বারেককে নিয়ে কিছু চা-নাশতার ব্যবস্থা করতে।

বাবাকে তুলতেই উনি বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, 'মাগো, তুমি কেন? মাসুমা কই?'

আমি প্রাণপণে গলা স্বাভাবিক রেখে বললাম, 'ওরা চারজনেই ভোরবেলা উঠে সাভার গিয়েছে। আজ ওখানে হাটবার কিনা, সস্তায় কিছু বাজার করে আনবে।

বাবা আর কিছু বললেন না।

ওঁকে চা-নাশতা খাইয়ে নীচে গিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসলাম। শুধু এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু খেতে পারলাম না, মাসুমা, জুবলির পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও।

হঠাৎ গেটের কাছে গাড়ির শব্দ হল। দৌড়ে পোর্চে বেরোলাম। একটা সাদা গাড়ি। শরীফরা ফিরে আসছে! আমাকে দৌড়ে গেটের কাছে যেতে দেখেই কিনা জানি না গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে গলিতেই থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিরাশায় মন ভরে গেল। গাড়িতে মাত্র একজন আরোহী— সে-ই চালাচ্ছে। গাড়িটাও টয়োটা, আমাদের হিলম্যান মিংকস নয়। দরজা খুলে চালক নামতেই দেখলাম— স্বপন! তার গায়ে টকটকে লাল একটা জামা, চুল উসকোখুসকো, চোখ লাল, মুখে উদভ্রান্ত ভাব। সে কিছু বলার আগেই আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'শিগগির পালাও স্বপন। রুমী ধরা পড়েছে। কাল রাতে আর্মি এসে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গিয়েছে। শিগগির চলে যাও এখান থেকে। এভাবে গাড়িতে একা ঘুরো না। কোথাও লুকিয়ে থাকো।'

স্বপনের মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোল না। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসতেই আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। সে গেটে গাড়ি ঢুকিয়ে ব্যাক করে বেরিয়ে চলে গেল। আমি শূন্য মন নিয়ে ঘরে এসে বসলাম। দশ মিনিট যেতে না যেতেই দরজায় খুব আস্তে ঠুকঠুক নক। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখি দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে— শুকনো মুখ, চোখের চাউনিতে চাপা ভয়। ওরা ঘরে ঢুকলে বললাম, 'তুমি শাহাদত চৌধুরীর ছোট ভাই ফতে না? আর তুমি জিয়া। তোমরা কেন এসেছ? শিগগির পালাও। কাল রাতে রুমীকে নিয়ে গিয়েছে, ওই সঙ্গে বাড়ির সবাইকে।'

ফতে অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমাদের বাড়িও রেইড হয়েছে। আর্মি আমার সেজো দুলাভাইকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

'আর কাউকে নিয়েছে?'

'না, আমি কাল বিকেলেই খবর পেয়েছিলাম, সামাদকে ধরেছে। আমি আমার ছোট দুই বোনকে নিয়ে হাটখোলার বাড়ি থেকে অন্যখানে চলে গিয়েছিলাম, সেজো দুলাভাই কদিন আগেই গ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলেন। তাই উনি আব্বা-মা'র সঙ্গে বাড়িতেই ছিলেন।'

'তোমরা আর দাঁড়িয়ো না। তাড়াতাড়ি চলে যাও।'

ফতে আপশোস আর দুঃখভরা স্বরে বলল, 'আমি এ বাড়ি চিনতাম না। কাল রাতে আন্দাজে এ গলি সে গলি অনেক খুঁজেছি— যদি রুমীকে খবরটা দিতে পারি— আজ সকালে জিয়াকে পেয়ে— জিয়া এ বাসা চেনে— তা কোনও লাভ হল না—

কথা অসমাপ্ত রেখেই ফতে আর তার পাশে পাশে মাথা নিচু করে জিয়া বেরিয়ে গেল।

পড়শীরা একে একে আসতে শুরু করেছেন। তারা সবাই রাতে জেগে উঠে নিজ নিজ ঘরের মাঝখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু কেউ দরজা খুলতে সাহস পাননি। সানু, মঞ্জু, খুকুর হেফাজতে আমাকে রেখে মাসুমা, জুবলি পরে আবার আসবে বলে বিদায় নিল।

আটটার সময় থেকে আর্মি এক্সচেঞ্জে ফোন করতে লাগলাম ক্যাপ্টেন কাইয়ুমকে চেয়ে। কিন্তু কোনও হদিশ করতে পারলাম না। একবার বলে 'উনি এখনও আসেননি।' আরেকবার শুনি 'এই একসটেনশান ওনার নয়।' অন্য একসটেনশান নম্বর দেয়— সেখানেই চাই। তারা আবার অন্য একটা নম্বর দেয়।

ন'টার সময় মঞ্জুর, মিকি বাসায় এলেন। বাঁকা ঢাকায় নেই, চাটগাঁয়। মঞ্জুর, মিকি সব শুনে বললেন, 'অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করি। দেখি কী করা যায়।'

সাড়ে ন'টার সময় দরজায় কলিং বেল বাজল। দৌড়ে গিয়ে খুলে দেখি, হাফিজ। একা।

হাফিজকে টেনে ঘরের ভেতর এনে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, 'হাফিজ! তুই এসেছিস বাবা'। তুই একা কেন? তোর খালু কই? রুমী, জামী, মাসুম?

হাফিজের পরনে লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি দলামোচড়া, ধুলোময়লা মাখা। চোখে-মুখে গভীর যন্ত্রণার ছাপ। সে এমনিতেই খুব আস্তে কথা বলে, এখন গলার স্বর প্রায় শোনাই গেল না, 'জানি না।'

ওর উদভ্রান্ত চেহারা দেখে ওকে আগে বসালাম। প্রথমে ও পানি খেল দুই গ্লাস। তারপর ওকে চা এনে দিলাম এককাপ। ও একটু সুস্থির হয়ে বলল— ওদেরকে প্রথমে মেইন রোডে নিয়ে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে সামনে একটা জিপের হেডলাইট জ্বালিয়ে সবাইকে শনাক্ত করে। তারপর রুমীকে আলাদা করে নিয়ে ওদের জিপে ওঠায়। হাফিজ, মাসুম, জামীকে শরীফের গাড়িতে উঠতে বলে। শরীফকে বলে তাদের জিপটাকে ফলো করতে। কয়েকজন পুলিশও রাইফেল হাতে শরীফের গাড়িতে ওঠে। মেইন রোডে ওই জিপটা ছাড়াও আরও কয়েকটা জিপ ও লরি দাঁড়িয়েছিল। ওরা জিপ ফলো করে এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে এম পি এ হোস্টেলে যায়। সেখানে ওদের সবাইকে নিয়ে একটা ঘরে রাখে। সেখানে সারারাত ধরে ওদের সবার ওপর খুব মারধর করা হয়েছে।

বলতে বলতে হাফিজের ঠোঁট কেঁপে গেল। আমি বললাম, ঠিক আছে, এখন আর বলতে হবে না। তুই হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেয়ে একটু বিশ্রাম কর। তোর চাচাকে ফোন করি।'

হাফিজের খুব ইচ্ছে নয় চাচাকে ফোন করার। এই চাচার সঙ্গে ওদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। ও বলল, জেবিসকে জানালেই হবে।

জুবলিকে ফোন করে বললাম, হাফিজকে ছেড়ে দিয়েছে। হাফিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার চাচা ফরিদকে ফোন করে জানালাম সমস্ত ব্যাপারটা। এই বিপদে আত্মীয়ের ওপর অভিমান রাখতে নেই।

মিকি, মঞ্জুরকেও ফোন করে হাফিজের কাছ থেকে পাওয়া খবরগুলো জানালাম।

হাফিজ ওপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে খানিক বিশ্রাম করে জুবলিদের বাসায় চলে গেল।

আমি খানিক পরপরই আর্মি এক্সচেঞ্জে ফোন করে চলেছি। সেই বিহারি সুবেদার তার নাম বলেছিল সফিন গুল। কাইয়ুম নেই বললে গুলকে দিতে বলি। তাকেও পাওয়া যায় না।

ওপরে বাবা খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন— শরীফরা এখনও ফিরছে না কেন?

আতাভাইকে ফোন করেছি, বাদশাদের এবং অন্য আত্মীয়দের খবর দিতে। ভাবছি আতাভাই বা ইলা-বাদশারা এলে তারপর বাবাকে আসল কথাটা বলতে হবে। সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে।

> সে কিছু বলার আগেই আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'শিগগির পালাও স্বপন। রুমী ধরা পড়েছে। কাল রাতে আর্মি এসে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে নিয়ে গিয়েছে। শিগগির চলে যাও এখান থেকে। এভাবে গাড়িতে একা ঘুরো না। কোথাও লুকিয়ে থাকো।'

এখনও পর্যন্ত শরীফদের কোনও খবর নেই। মঞ্জুর-মিকি সারাদিন এই ব্যাপার নিয়েই দৌড়োদৌড়ি করছে। কিন্তু এখনও কোন হদিশ লাগাতে পারেনি।

আমি সারাদিনে ক্যাপ্টেন কাইয়ুম বা সুবেদার সফিন গুল কাউকেই ফোনে ধরতে পারিনি। ভাবছি ব্যাপারটা কী? ওরা মিছে নাম বলে যায়নি তো?

সারাদিন ধরে বাসায় লোকজন আসছে— আতাভাইরা, ইলা-বাদশারা, কলিম, হুদা, নজলু, মা, লালু, আতিক, বুলু। পিছনের রাস্তার বজলুর রহমান সাহেবের স্ত্রী, কাসেম সাহেব, সাত্তার সাহেব। এ রাস্তার সব পড়শী, মাসুমা, জুবলি আবার বিকেলে মিনিভাই, রেবা, লুলু, চাম্মু। আমার হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা, এদের প্রাণে কি ভয়ডর নেই? এরা যে এত আসছে? মেইন রোডের মুখে নিশ্চয় সাদা পোশাকে আই বি'র লোক নজর রাখছে। এদের তো বিপদ হতে পারে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ কপাল খুলে গেল, ফোনে সুবেদার সফিন গুলকে পেয়ে গেলাম। সফিন গুল খুবই বিনয়ের সঙ্গে জানাল 'ইন্টারোগেশানে কুছু দেরি হোচ্ছে, আপুনি কুছু ফিকির কোরবেন না। উনারা ইন্টারোগেশান শেষ হলেই বাড়ি চলে যাবেন।'

আমি বললাম, 'ওরা কেমন আছে? কী এত ইন্টারোগেশান? আমি কি আমার স্বামী কিংবা ছেলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

সফিন গুল একটু দ্বিধা করে বলল, 'ঠিক আছে। ডাকছি কোথা বোলেন।'

একটু পরে জামীর গলা শুনতে পেলাম 'মা— আমি জামী—'

আমি একেবারে উচ্ছ্বসিত ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, 'জামী, কী ব্যাপার তোদের এখনও ছাড়েনি কেন? কেমন আছিস তোরা?'

জামী থেমে থেমে বলল, 'ছাড়বে। ভালো আছি।'

'রুমী কেমন আছে? তোর আব্বু? মাসুম?'

জামী সেইরকম ছাড়া ছাড়া ভাবে বলল, 'ভালো।— এখন ছাড়ি।'

'জামী— জামী, তোরা খেয়েছিস কিছু?'

'না'।

'বলিস কী? এখনও কিছু খেতে দেয়নি? দে তো সুবেদার সাহেবকে ফোনটা—'

ফোনে সুবেদারের সাড়া পেয়ে আমি বললাম, 'এখনও পর্যন্ত ওদের কিছু খেতে দেননি? কাল রাত বারোটায় নিয়ে গিয়েছেন এখন সন্ধে সাড়ে সাতটা— এতক্ষণ পর্যন্ত ওরা না খেয়ে রয়েছে? আপনার দোহাই সুবেদার সাহেব, ওদের কিছু খেতে দিন। না হয় ওদের কাছ থেকেই টাকা নিয়ে কিছু কিনে এনে দিন।'

সুবেদার 'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, আভি দেতা হ্যায়' বলে ফোন রেখে দিল। আমি খানিকক্ষণ থম ধরে বসে বসে ফুললাম। তারপর হঠাৎ কান্নায় মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়লাম।

৩১ আগস্ট মঙ্গলবার ১৯৭১

আরও একটা ঘুমহারা রাত পার হয়ে এলাম। কাল থেকে অবশ্য লালু আর মা এ বাড়িতে রয়েছেন। সাড়ে দশটায় মঞ্জুর আর মিকি আসবেন, আমাকে নিয়ে এম পি এ হোস্টেলে যাবেন। সকালে উঠেই মা আর লালুকে নিয়ে স্যান্ডউইচ বানাতে বসেছি। বেশকিছু স্যান্ডউইচ আর ওদের সবার জন্য একপ্রস্থ করে কাপড় নেব। পরশু রাত থেকে শোবার কাপড় পরে আছে। কী মনে করে শরীফের শেভিং সেটটা কাপড়ের প্যাকেটের মধ্যে ভরে নিলাম। কী জানি, যদি আরও কয়েকদিন না ছাড়ে।

বেলা এগারোটার দিকে এম পি এ হোস্টেলে পৌঁছলাম। মঞ্জুর গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর পাশে মিকি। আমি প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে পিছনের সিটে বসেছিলাম। ড্রাম ফ্যাক্টরির রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঢুকল ডানে— এম পি এ হোস্টেলের গেটে পুলিশ দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল। ঢুকেই সামনে চওড়া খোলা লন, বাঁয়ে বিরাট এম পি এ হোস্টেল, সার সার ঘর। সামনে চওড়া টানা বারান্দা। বিভিন্ন ঘরে ইউনিফর্ম পরা লোকজন ব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে— বিভিন্ন ধরণের ইউনিফর্ম। বোঝা যায় সাধারণ সেপাই থেকে বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের অফিসার— সবাই রয়েছে ওর মধ্যে।

মিকি বললেন, 'তুমি গাড়িতেই বসে থাক।

আমরা আগে খোঁজ নিয়ে আসি।' মিকি, মঞ্জুর সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় লোকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে বিভিন্ন ঘরে ঢুকতে লাগলেন। আমি বসে বসে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। এইখানেই ওদেরকে এনেছে। এই ঘরগুলোর কোনও একটাতে রেখেছে নাকি? ইয়া আল্লা, কোনগতিকে কারও মুখ যদি একঝলক দেখতে পেতাম! তাহলে এক্ষুনি গাড়ি থেকে দৌড়ে ওদের কাছে চলে যেতাম।

মিকি, মঞ্জুর ফিরে এসে বললেন, এখানে না। এর পিছনদিকের আরেকটা বাড়িতে যেতে বলল।

মঞ্জুর আবার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তায় নামলেন। এম পি এ হোস্টেল পেরিয়ে আরও খানিক গিয়ে আবার ডাইনে একটা গলিতে ঢুকলেন। একটুখানি গিয়ে বাঁয়ে একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামলেন। এবার গলিতেই গাড়ি রেখে আমরা তিনজনেই নামলাম। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে একে ওকে জিজ্ঞেস করতে করতে এঘর-ওঘর করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি একটু দূরে বারান্দা দিয়ে সফিন গুল যাচ্ছে। আমি 'সুবেদার সাহেব, সুবেদার সাহেব' বলতে বলতে দ্রুত পা চালিয়ে তাকে ধরলাম। গুল আমাকে দেখে চমকে গেল। আমি এক নিঃশ্বাসে বললাম, 'সুবেদার সাহেব, আমি ওদের খবর নিতে এসেছি। ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওদের জন্য কিছু খাবার আর কাপড় এনেছি। সুবেদার সাহেব, আমাকে ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।'

সুবেদার গুলের মুখ দেখে মনে হল সে ফাঁপরে পড়েছে। গম্ভীর মুখে বলল, 'ওরা তো এখানে নেই। অন্য জায়গায় আছে। আচ্ছা আপনি আসুন আমার সঙ্গে।' মিকি, মঞ্জুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওঁনারা এখানেই অপেক্ষা করুন।'

আমি সুবেদার সফিন গুলের পিছন পিছন একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে টেবিলের পিছনে চেয়ারে এক অফিসার বসে আছেন, ঘরের ভেতরে এবং দরজার কাছাকাছি তিন-চারজন সশস্ত্র মিলিটারি পুলিশ। সুবেদার গুল উর্দুতে অফিসারটিকে কী কী যেন বলল, আমি ঠিকমতো বুঝলাম না, যেন বোঝার চেষ্টাও করলাম না। আমার চোখ খালি জানালা দিয়ে, দরজা দিয়ে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল— যদি হঠাৎ শরীফকে দেখতে পাই। একটু পরে গুল আমাকে সম্বোধন করে বলল, 'মাইজী, ওনারা তো এখন এখানে নেই। ওনারা ক্যান্টনমেন্টে আছেন। এখন তো দেখা যাবে না। আপনি বাড়ি চলে যান।'

আমি মরিয়া হয়ে বললাম, 'আমি এখানে অপেক্ষা করি? ওরা এখানে ফিরবে তো?'

সুবেদার সফিন গুল গম্ভীর মুখে বলল, 'মাইজী, আপনি বাড়ি চলে যান। এখানে অপেক্ষা করার সুবিধা নেই। আপনি পরে খবর নেবেন। নিজে আসবেন না। অন্য লোক দিয়ে খবর নেবেন।'

হঠাৎ পোর্চে গাড়ির শব্দ। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুললাম। দেখি আমাদের সেই সাদা হিলম্যান মিংকস। গাড়ি থেকে নামছে শরীফ, জামী, মাসুম। শুধু রুমী নেই। আমার গলা চিরে একটা আর্তস্বর বেরোল, 'রুমীকে ছাড়েনি?' কেউ কোনও উত্তর দিল না। একে একে ঘরে এসে ঢুকল।

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম, 'তাহলে এই প্যাকেট দুটো রাখেন। ওদের কাপড় আর কিছু খাবার।'

সুবেদার গুলও যেন নিরুপায় হয়ে প্যাকেট দুটো নিল। বলল, 'আপনি আর আসবেন না, ওনারা ঠিক বাড়ি ফিরে যাবেন। চিন্তা করবেন না।'

মলিন মুখে মিকি-মঞ্জুরের সঙ্গে গাড়িতে উঠলাম। বাড়ি যখন পৌঁছলাম, বেলা পৌনে দুটো। মা, লালু অধীর আগ্রহে নীচের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। লালু বলল, 'খালুজান খুব বেশি অস্থির হয়ে গিয়েছেন।'

আমি ডাইনিং রুমে চৌকিটার ওপর শুয়ে পড়ে বললাম, 'মা, আপনি গিয়ে বাবাকে সামলান। আমি এখন ওঁর সামনে দাঁড়াতে পারব না।'

মা দোতলায় উঠে গেলেন। লালু আমার পাশে বসে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দ কান্নায় আকুল হল।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছিল কে জানে। হঠাৎ পোর্চে গাড়ির শব্দ। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুললাম। দেখি আমাদের সেই সাদা হিলম্যান মিংকস। গাড়ি থেকে নামছে শরীফ, জামী, মাসুম। শুধু রুমী নেই।

আমার গলা চিরে একটা আর্তস্বর বেরোল, 'রুমীকে ছাড়েনি?'

কেউ কোনও উত্তর দিল না। একে একে ঘরে এসে ঢুকল। আমি তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনজনকেই জড়িয়ে ধরলাম। তারপর হঠাৎ চেতনায় ধাক্কা লাগল। ওদের পরনের লুঙ্গি, পাঞ্জাবি দলা-মোচড়া ছেঁড়া, ধুলো-ময়লা লাগা, ওদের মুখে-চোখে গভীর যন্ত্রণা, দুঃখ আর অপমানের ছাপ, ওদের শরীর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ওরা যেন দাঁড়াতে পারছে না। তাড়াতাড়ি ওদের বসিয়ে ঠান্ডা পানির বোতল আর গেলাস নিয়ে এলাম। লালুকে বললাম চা বানাতে, মাকে বললাম বাবাকে গিয়ে খবর দিতে।

ওরা একেকজনে দু'তিন গেলাস করে পানি খেল, ওদের পিপাসা যেন মিটতেই চায় না। আমি বললাম, 'বেলা দেড়টা পর্যন্ত আমি মিকি আর মঞ্জুর এম পি এ হোস্টেলে ঘোরাফেরা করেছি। সুবেদার গুল বলল, 'তোমাদের নাকি ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়েছে।'

শরীফ বলল, 'না, আমাদের ক্যান্টনমেন্টে নেয়নি তো! আমরা ওই এম পি এ হোস্টেলেই ছিলাম।

বল কী! সুবেদার তাহলে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে? কখন ছেড়েছে তোমাদের?'

'আমাদের ওই দেড়টার দিকেই ছেড়েছে। গাড়ির চাবি ওরা নিয়ে নিয়েছিল। সেইটা খুঁজে পেতে খানিক দেরি হল।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম আড়াইটে বাজে।

আমি তাজ্জব হয়ে বললাম, 'কীরকম নিপাট মিথ্যে কথা বলে ওরা! আমি আবার তোমাদের জন্য এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ, সবার জন্য একসেট করে কাপড় গুলের কাছে দিয়ে এলাম। ওগুলো আবার রাখলও সে। তখনই তো বলে দিতে পারত, তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে একসঙ্গেই ফিরতে পারতাম।'

ওরা তিনজনেই কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে নীরবে চেয়ে রইল। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে বললাম, 'কী? তোমরা সব অমন করে তাকিয়ে আছো কেন?'

জামী বলল, 'মা, তুমি এখনও তোমার মান্ধাতার আমলের ধারণা নিয়ে বসে আছো। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশরা রাজবন্দিদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করত— আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে দিত, খাবার কাপড় পাঠাতে দিত, তারপর ফাঁসি দিয়ে লাশটা আত্মীয়দের ফিরিয়ে দিত। ভাবছ এখনও ব্যবস্থা ওইরকমই আছে? জেনে রাখো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর এই পাঁচ মাসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এ-বিষয়ে পাঁচশো বছর এগিয়ে গিয়েছে। ওদের কীর্তিকলাপ শুনলে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীও মাথা হেঁট করবে। তার প্রমাণ আমরা এই দু'দিন দু'রাতে দেখে এসেছি। ইনফ্যাক্ট, আমরা

সশরীরে, সজ্ঞানে হাবিয়া দোজখ ঘুরে এসেছি। সব বলব। শুনে শেষ করতে তোমার দু'দিন লাগবে।'

ওপর থেকে বাবার ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছে 'ও শরী! রুমী। জামী। মাসুম।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, 'বাবার কাছে যাও আগে। উনি একেবারে উতলা হয়ে রয়েছেন। আমি ততক্ষণে ফোন করে সবাইকে খবরটা দেই।'

১ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৯৭১

বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার এক অবিশ্বাস্য, অমানবিক কাহিনি গতকাল শুনলাম শরীফ, জামী ও মাসুমের মুখ থেকে। শরীফ বরাবরই কম কথা বলে, সে তাদের দু'দিন-দু'রাত বন্দিদশার একটা সংক্ষিপ্তসার দিল নিজের মতো করে। খুঁটিয়ে সমস্ত বিবরণ শুনলাম জামী আর মাসুমের মুখ থেকে।

সেদিন রাতে বাড়ির গেট থেকে রুমী-জামীদের হাঁটিয়ে নিয়ে খানসেনারা মেইন রোডে গিয়ে দাঁড়ায়। শরীফরা দেখে রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা জিপ আর লরি দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি ঘেরাও করে যেসব মিলিটারি পুলিশ ছড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের গলি আর কাসেম সাহেবদের গলি থেকে বেরিয়ে মেইন রোডে এসে জমা হয়। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম শরীফদের পাঁচজনকে রাস্তার পাশে লাইন ধরে দাঁড় করায়। তারপর উল্টোদিকের কম্পালা হোটেল বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে একটা জিপ এগিয়ে এসে ওদের সামনে থেমে হেডলাইট জ্বালে। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম জিপের কাছে গিয়ে জিপে বসা কারও সঙ্গে মৃদুস্বরে কী যেন কথা বলে। তারপর শরীফদের সামনে এসে রুমীর বাহু চেপে ধরে বলে, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো।' রুমীকে নিয়ে ওই জিপটাতে তোলে। জামী, মাসুম ও হাফিজকে শরীফের গাড়িতে উঠতে বলে তাদের জিপটাকে ফলো করতে বলে। কয়েকজন মিলিটারিও শরীফদের গাড়িতে গাদাগাদি করে ওঠে। রুমী ও ক্যাপ্টেন কাইয়ুমসহ জিপটা প্রথমে, তারপর শরীফদের গাড়ি, তার পিছনে পিছনে বাকি সব জিপ ও লরি। ক্রমে ওরা গিয়ে থামে এম পি এ হোস্টেলের সামনে। ওখানে যাওয়ার পর রুমীদের পাঁচজনকে নামিয়ে আবার লাইন বেধে দাঁড় করানো হয়, আবার তাদের মুখে গাড়ির হেডলাইট ফেলা হয়। বারান্দায় এসে দাঁড়ায় এক আর্মি অফিসার, বলে ওঠে 'হু ইজ রুমী?' রুমীকে সনাক্ত করার পর সবাইকে বারান্দায় উঠিয়ে দাঁড় করায় এক পাশে। মাত্র কয়েক মিনিট ওই একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানোর সময় রুমী ফিসফিস করে বলে, 'তোমরা কেউ কিছু স্বীকার করবে না। তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। আমি তোমাদের কিছু বলিনি।'

DAWN

KARACHI

SALIKA

CABIN

WAR TILL VICTORY

Yahya's pledge

Pays tributes to Forces, E. Wing people

Pakistan promised continued support by China

Fighting ends in East Wing

PAF HITS IN WEST

APPEAL TO EVERY PAKISTANI

JEHAD

MEANS TOTAL COMMITMENT

DONATE GENEROUSLY TO NATIONAL DEFENCE FUND

একটু পরেই কয়েকজন সেপাই এসে রুমীকে আলাদা করে ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর আরও কয়েকজন সেপাই এসে শরীফদেরকে একটা মাঝারি ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে সোফাসেট ছিল, তবু ওদেরকে মেঝেয় বসতে বলা হয়।

তারপরই শুরু হয়ে যায় নারকীয় কাণ্ডকারখানা। খানিক পরপর কয়েকজন করে খানসেনা আসে, শরীফ, জামী, মাসুম, হাফিজকে প্রশ্ন করে 'অস্ত্র কোথায় রেখেছ,' 'কোথায় ট্রেনিং নিয়েছ?' 'কয়টা আর্মি মেরেছ?'— এই উত্তরগুলো স্বভাবতই না-সূচক হয় আর অমনি শুরু হয় ওদের মার। সে কি মার! বুকে ঘুষি, পেটে লাথি, হঠাৎ করে আচমকা পিছন থেকে ঘাড়ে রদ্দা— সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় চোখগুলো

জেনে রাখো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর এই পাঁচ মাসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এ-বিষয়ে পাঁচশো বছর এগিয়ে গিয়েছে। ওদের কীর্তিকলাপ শুনলে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীও মাথা হেঁট করবে। তার প্রমাণ আমরা এই দু'দিন দু'রাতে দেখে এসেছি।

ঠিকরে বেরিয়ে গেল, রাইফেলের বাঁট দিয়ে বুকে-পিঠে গুঁতো, বেত, লাঠি বেল্ট দিয়ে মুখে, মাথায়, পিঠে, শরীরের সবখানে মার, উপুড় করে শুইয়ে বুটসুদ্ধ পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাড়ানো, বিশেষ করে কনুই, কবজি হাঁটুর গিঁটগুলো থেঁতলানো। আশপাশের ঘরগুলোতেও একই ব্যাপার চলছে, বন্দি বাঙালিদের চিৎকার, গোঙানি, খানসেনাদের উল্লাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কানে আসছে। বন্দিরা যেন ওদের খেলার সামগ্রী, এতগুলো খেলার জিনিস পেয়ে ওদের মধ্যে মহোৎসব পড়ে গিয়েছে। একদল আসছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মারধর করে চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের বিরতি। এর মধ্যে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আবার সেই সর্বনেশে খেলা শুরু করছে।

একটা ব্যাপারে খানসেনারা বেশ হুঁশিয়ার। ওরা কেউ এমনভাবে মারে না যাতে বন্দি হঠাৎ মরে যায়। এমনভাবে মারে যাতে বন্দি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। নাকমুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোয়, হাত-পা, আঙুলের হাড় ভাঙে অথচ মরে না। অজ্ঞান হলে পানি ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে, একটু বিশ্রাম করতে দেয় যাতে খানিক পরে আবার নতুন করে মার সহ্য করার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

এরই মাঝে একজন করে ডেকে নিয়ে যায় অন্য একটা ঘরে— সেখানে এক কর্নেল বসে আছে— কর্নেল হেজাজী। সে এদেরকে এক এক করে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। শরীফকে নিয়ে যাওয়ার পর প্রথমে তাকে চেয়ারে বসতে বলে, জিজ্ঞেস করে শরীফ কী করে, কয়টা ছেলেমেয়ে, বাড়িতে কে কে আছে, রুমীর বয়স কত, কী পড়ে— এসব। শরীফ সব কথার উত্তর দেয়, হাফিজ সম্বন্ধে বলে, সে আজকেই মাত্র চাটগাঁ থেকে ঢাকা এসেছে, সে বেচারি ঢাকার কোনও হালহকিকতই জানে না। তাছাড়া ওর চাচা ঢাকার ডি সি।

তারপর কর্নেল হেজাজী জিজ্ঞেস করে রুমী কবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে, কোথায় ট্রেনিং নিয়েছে। শরীফ বলে সে এ সম্বন্ধে কিছু জানে না। এতক্ষণ বেশ ভদ্রভাবেই কথাবার্তা চলছিল, এবার হেজাজী একটু গরম হয়ে বলে, 'তুমি জান না তোমার ছেলে কী ধরনের বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে, বাজে কাজ করে?' শরীফ বলে 'আমার ছেলে বড় হয়েছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সে কাদের সঙ্গে মেশে, কী করে— তার খবর রাখা আমার পক্ষে কি সম্ভব?' হেজাজী বিদ্রূপ করে বলে, 'তাহলে তো দেখছি তুমি একজন আনফিট ফাদার। ছেলেকে সৎ পথে গাইড করার কর্তব্য করতে পারনি।' শরীফ রেগে গিয়ে বলে, 'তুমিই কি ঠিক করে বলতে পার তোমার ছেলে কাদের সঙ্গে মেশে, কোথায় কোথায় ঘোরে?'

বন্দিরা যেন ওদের খেলার সামগ্রী, এতগুলো খেলার জিনিস পেয়ে ওদের মধ্যে মহোৎসব পড়ে গিয়েছে। একদল আসছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, মারধর করে চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের বিরতি। এর মধ্যে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে তার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আরেক দল এসে আবার সেই সর্বনেশে খেলা শুরু করছে।

শরীফকে ফেরত আনার পর হাফিজকে নিয়ে যায়। হাফিজের পাঞ্জাবির পকেটে ওর চাটগাঁ থেকে ঢাকা আসার প্লেন-টিকিটের মুড়িটা রয়ে গিয়েছিল; ও সেইটা দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে সে সত্যিই ওই দিনই ঢাকা এসেছে। তারপর একে একে জামী, মাসুম। এরা একেকজন করে যাচ্ছে। বাকিরা মার খাচ্ছে। যারা যাচ্ছে, তারা ফিরে এসে আবার মার খাচ্ছে। এমনি করে করে ভোর হল।

এরপর কয়েকজন সেপাই শরীফদেরকে নিয়ে যায় আরেকটা ঘরে, সেখানে শরীফদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিরাট চমক! ছোট্ট একটা ঘর, ছ-ফুট বাই আট ফুট হবে। ঢুকে দেখে চারপাশের দেওয়াল ঘেঁষে, সারা মেঝে জুড়ে এক দঙ্গল লোক বসে আছে— তার মধ্যে বদি আর চুল্লুকে দেখে শরীফরা চমকে যায়। শরীফরা বাকিদের না চিনলেও খানিকক্ষণের মধ্যে সবার পরিচয় পেয়ে যায়। খানসেনারা একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেয়। অমনি সবাই ফিসফিস করে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়-বিনিময় করতে শুরু করে। আলতাফ মাহমুদ, তার চার শালা নুহেল, খনু, দীনু ও লীনু বিল্লাহ, আর্টিস্ট আলভী, শরীফের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের, আজাদ, জুয়েল, ঢাকা টি ভি'র মিউজিশিয়ান হাফিজ, মর্নিং নিউজের রিপোর্টার বাশার, নিয়ন সাইনের মালিক সামাদ এবং আরও অনেকে। আলতাফ মাহমুদের গেঞ্জি বুকের কাছে রক্তে ভেজা, তার নাকমুখে তখনও রক্ত লেগে রয়েছে, চোখ, ঠোঁট সব ফুলে গেছে। বাশারের বাঁ-হাতের কবজি ও কনুইয়ের মাঝামাঝি দুটো হাড়ই ভেঙেছে। ভেঙে নড়বড় করছে, একটা রুমাল দিয়ে কোনওমতে পেঁচিয়ে রেখেছে, সেই অবস্থাতে হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। হাফিজের নাকে-মুখে রক্ত, মারের চোটে একটা চোখ গলে বেরিয়ে এসে গালের ওপর ঝুলছে। জুয়েলের একমাস আগের জখম হওয়া আঙুল দুটো মিলিটারিরা ধরে পাটকাঠির মতো মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে সবাই চুপ করে যায় কারণ কথা বলা নিষেধ। কথা বলতে শুনলেই খানসেনারা মারবে। দরজা খুলে খানসেনারা রুমী এবং আরও কয়েকটা ছেলেকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়। একজন কেউ বলে 'সেপাইজী, বহোত পিয়াস লাগা। যারা পানি পিলাইয়ে।' সেপাইরা জবাবে হাতের বেল্ট ও তাদের পাকানো দড়ি দিয়ে খানিক এলোপাথাড়ি মেরে আবার বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। একজন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'জল্লাদ। পানি পর্যন্ত দেবে না? পানি চাইলে আরও মার?'

খানিক পরে দেয়াল ঘেঁষে বসা একজন নড়েচড়ে বসতেই সামনে থেকে আরেকজন বলে ওঠে, 'আরে! ওই তো একটা পানির কল দেখা যাচ্ছে।' সবাই চমকে দেখে দেয়ালের গায়ে একটা পানির ট্যাপ। এত লোক ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে বসার দরুন ট্যাপটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তখন সবাই ট্যাপের কাছে গিয়ে হাত পেতে পানি খায়। বাশারকে অন্য একটি ছেলে হাতের তালুতে পানি নিয়ে খাওয়ায়।

আবার ফিসফিস করে কথাবার্তা শুরু হয়। জানা যায় কারা কখন কীভাবে ধরা পড়েছে। বদি ধরা পড়ে ২৯ আগস্ট দুপুর বারোটার সময়। ওইদিন সকালে সে রুমীদের সঙ্গে ২৮ নম্বর রোডের বাড়িতে মিটিং করে। তারপর রুমী যায় চুল্লুর বাসায় গান শুনতে। বদি যায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফরিদের বাসায় গল্প করতে। সেই বাসা থেকে মিলিটারি তাকে ধরে। সামাদকে ধরে বিকেল চারটেয়। আজাদের বাসায় মিলিটারি যায় রাত বারোটায়। ও বাসায় সেদিন ছিল জুয়েল, কাজী, বাশার, আজাদের খালাতো ভাই, দুলাভাই, আরও কয়েকজন। জুয়েল, বাশার, আজাদসহ খালাতো বোনের স্বামী এবং অন্য দু'জন অতিথিকেও মিলিটারিরা ধরে এনেছে, কেবল কাজী হঠাৎ আচমকা ক্যাপ্টেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতের স্টেন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক আর অচিন্ত্যনীয়

ছিল যে, মিলিটারিরা হকচকিয়ে ঘরের মধ্যেই এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। সেই ফাঁকে কাজী পালিয়ে যায়।

আজাদদের বড় মগবাজারের বাসা থেকে আলমদের বাসা কাছেই। দিলু রোডে আলমদের বাসা, আর্মি যায় রাত দুটোর দিকে। ও বাসা থেকে ধরেছে আলমের ফুপা আবদুর রাজ্জাক আর তার ছেলে মিজানুর রহমানকে। রাত দেড়টার সময় ও বাসায় কাজী যায় একেবারে দিগম্বর অবস্থায়। বলে, 'একটু আগে আজাদদের বাড়িতে আর্মি গিয়ে রেইড করেছে। আমি ওরই মধ্যে ধস্তাধস্তি করে কোনওমতে পালিয়ে এসেছি। আমাকে একটা লুঙ্গি দিন, আর একটা স্টেন দিন। আমি নিশ্চয় একটু পরে এ বাড়িতেও আসবে। আমি ওদের ঠেকাব।' আলমের মা তাকে লুঙ্গি দিয়ে বলেন, 'বাবা, তুমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও। আমাদের ব্যবস্থা আমরা দেখব।' কাজী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমের মা এবং চার বোন আলমের বাবাকে পিছনদিকের নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর দিয়ে ওপাশে পার করে দেয়। এবং তার পরপরই আর্মি এসে বাসা ঘেরাও করে ফেলে। আলমদের রান্নাঘরের মেঝের নীচে পাকা হাউজের মতো বানিয়ে সেখানে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। আর্মি এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে রান্নাঘর কোনদিকে? তখন বাড়ির সবাই বুঝে যায় যে ওরা আর্মস অ্যামিউনিশান ডাম্পয়ের কথা আগেই জেনে গিয়েছে। খানসেনারা রান্নাঘরে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝে থেকে লাকড়ি সরিয়ে শাবল দিয়ে ভেঙে কংক্রিটের স্ল্যাব তুলে সব অস্ত্র, গোলাবারুদ তুলে নিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে যেহেতু পুরুষ মানুষ ছিল আলমের ফুপা আর ফুপাত ভাই, আর্মি ওই দু'জনকেই ধরে নিয়ে এসেছে। বেচারিরা কয়েকদিন আগেই খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছে। কিছু না জেনে এবং কিছু না করেই ওরা বাপ বেটা মার খেয়ে মরছে। ওরা বুঝেও পাচ্ছে না কেন ওদের এরকম এলোপাথাড়ি মারধর করছে।

হাটখোলায় শাহাদতদের বাসায় রাত তিনটের দিকে মিলিটারি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কাউকে না পেয়ে শাহাদতের সেজো দুলাইভাই বেলায়েত চৌধুরীকেই ধরে এনেছে। সে বেচারা পি আই এ তে চাকরি করে, দু'মাসের ছুটিতে করাচি থেকে দেশে বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি। গ্রামের বাড়িতেই ছিল, কপালে দুর্দৈব— মাত্র দশ-বারোদিন আগে ঢাকায় এসেছিল। বেচারা সাতেও ছিল না, পাঁচে ছিল না, মুক্তিযোদ্ধা শ্যালকদের বদৌলতে এখন খানসেনার হাতে পিটুনি খাচ্ছে।

চুল্লুদের বাড়িতে মিলিটারি যায় রাত বারোটা-সাড়ে বারোটার সময়। চুল্লুর ভাই এম

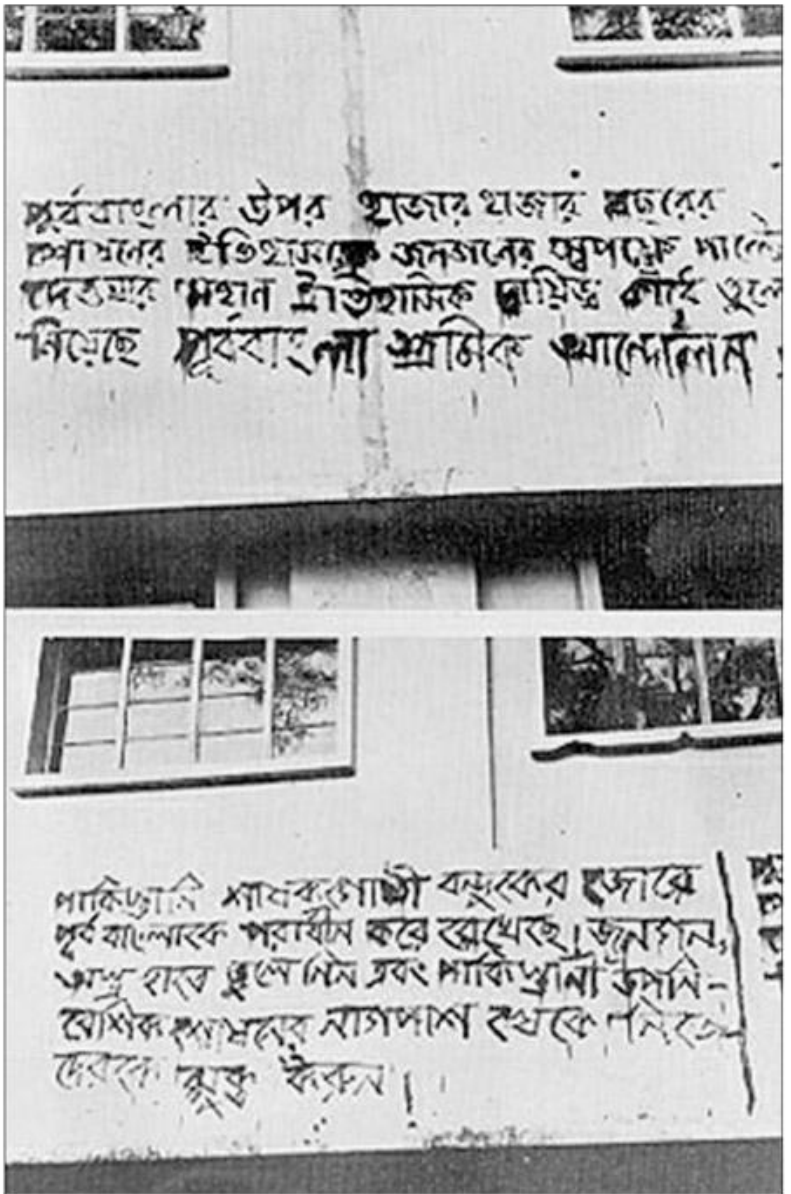

সরকারি ভবনে পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী দেয়াল লিখন

হাটখোলায় শাহাদতদের বাসায় রাত তিনটের দিকে মিলিটারি গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা কাউকে না পেয়ে শাহাদতের সেজো দুলাইভাই বেলায়েত চৌধুরীকেই ধরে এনেছে। সে বেচারা পি আই এ তে চাকরি করে, দু'মাসের ছুটিতে করাচি থেকে দেশে বেড়াতে এসে আর ফিরে যায়নি। গ্রামের বাড়িতেই ছিল, কপালে দুর্দৈব— মাত্র দশ-বারোদিন আগে ঢাকায় এসেছিল। বেচারা সাতেও ছিল না, পাঁচে ছিল না...

সাদেক সি এস পি এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তার সরকারি বাসভবন এলিফ্যান্ট রোডের এক নম্বর টেনামেন্ট হাউস থেকে চুল্লুকে ধরেছে।

স্বপনদের বাসায় আর্মি যায় রাত দেড়টা-দুটোর দিকে। এলিফ্যান্ট রোড থেকে চুল্লুকে চোখ বাঁধা অবস্থায় নিয়ে সেই জিপ স্বপনদের বাড়িতে যায়। চোখ বাঁধা বলে চুল্লু প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় এসেছে, কিন্তু কানে আসে এক খানসেনার কথা 'স্বপন ভাগ গিয়া।' স্বপনের বাবার গলা শুনতে পায় চুল্লু। মেয়েদের কান্না শোনে। অনুমান করে স্বপনের বোন মহুয়া, কেয়া, সঙ্গীতার কান্না। স্বপনের বাবা শামসুল হক সাহেবকেও ধরে এনেছে খানসেনারা।

আলতাফ মাহমুদের বাসায় আর্মি যায় পাঁচটার দিকে। ওদের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টোদিকে আউটার সার্কুলার রোডে। শরীফের বন্ধু মান্নানের পাশের বাসাটা ভাড়া নিয়ে থাকত ওরা। ওটা মান্নানের বড় ভাই বাকি সাহেবের বাড়ি। কয়েকদিন আগে নিয়ন সাইনের সামাদ গুলি ও বিস্ফোরক ভর্তি একটা বিরাট ট্রাঙ্ক আলতাফ মাহমুদের কাছে রাখতে আনে। মান্নানদের বাড়ির পিছনের উঠোনে ওটা পুঁতে রাখা হয়। আর্মি এসেই প্রথমে আলতাফ মাহমুদের বুকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ভীষণ জোরে মারে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে। তারপর তাকে আর সামাদকে নিয়ে উঠোন খুঁড়িয়ে সেই ট্রাঙ্ক তোলায়। আর্মি সামাদকে সঙ্গে নিয়েই ওদের বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর আলফাতের শালাদের দিয়ে সেই ট্রাঙ্ক গাড়িতে তোলায়। আলভী ওই সময় ওদের বাড়িতে ছিল। খানসেনারা 'আলভী কৌন হ্যায়' বলে খোঁজ করছিল। কিন্তু আলভীর কপাল জোর, ওই সময়ের মধ্যেই আলতাফ একফাঁকে আলভীকে বলে 'তোমার নাম আবুল বারাক। তুমি আমার ভাগনে। দেশের বাড়ি থেকে এসেছ।' তাই আবুল বারাক নাম বলে আলভী বেঁচে যায়। অবশ্য দলের অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে যায় খানসেনারা।

মান্নানের দুই শালা রসুল ও নাসের তাদের মা'র সঙ্গে বোনের বাড়ির দোতলাটা ভাড়া নিয়ে থাকত। যেহেতু দুটো বাড়িই গায়ে গায়ে লাগানো, ট্রাঙ্কটাও বেরিয়েছে মান্নানদের পিছনের উঠোন থেকে, অতএব রসুল, নাসেরকেও ধরে নিয়ে যায় খানসেনারা। ভাগ্য ভালো, মান্নান এ সময় চাটগাঁয়ে, তাই সে বেঁচে গিয়েছে। আলতাফদের দোতলায় ভাড়া থাকেন এক ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, তাঁকে, তাঁর ছেলেকে, তঁর এক ভাগ্নেকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে খানসেনারা।

মেঝেয় মরার মতো ঘুমোনো লোকগুলো হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে বসে, হইহই করে নতুন বন্দিদের নাম, কুশল জিজ্ঞাসা করে সেবা-যত্ন করা শুরু করে দেয়। কার কোথায় ভেঙেছে, কোথায় রক্ত পড়ছে, কোথায় ব্যথা— খোঁজ নিয়ে কাউকে ব্যান্ডেজ করে, কাউকে ম্যাসাজ করে, কাউকে নোভালজিন খাওয়ায়।

রুমীকে ওই ছোট ঘরটায় আনার পর রুমী শরীফকে বলে, 'আব্বু এরা আমাকে ধরবার আগেই জেনে গিয়েছে ২৫ তারিখে আমরা ১৮ আর ৫ নম্বর রোডে কী অ্যাকশান করেছি, কে কে গাড়িতে ছিলাম, কে কখন কোথায় গুলি চালিয়েছি, কতজন মেরেছি, সব, স-ব আগে থেকেই জেনে গিয়েছে। সুতরাং আমার স্বীকার করা না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তোমরা চারজনে কিছুতেই কিছু স্বীকার করবে না। তোমরা কিচ্ছু জান না, এই কথাটাই সবসময় বলবে। তোমাদের প্রত্যেককে হয়তো আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমরা কিন্তু সবাই সবসময় এককথাই বলবে। আমি কী করে বেড়াই, তোমরা কোনওদিন কিছু টের পাওনি। দেখো, একটুও যেন হেরফের না হয়।'

আলতাফ মাহমুদও তার চার শালাকে, আলভীকে, রসুল, নাসেরকে একই কথা বলে, 'তোমরা সবাই একই কথা বলবে, তোমরা কেউ কিচ্ছু জান না। যা কিছু করেছি, সব আমি। যা স্বীকার করার আমি করব।'

এমনিভাবে সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। একবার করে খানসেনারা ঘরে ঢোকে এলোপাথাড়ি খানিক পেটায়, গালিগালাজ করে, আবার বেরিয়ে যায়। তখন এরা ফিসফিস করে কথা বলে। খানিকক্ষণ পর কয়েকজন খানসেনা রুমী, বদি আর চুল্লুকে বের করে নিয়ে যায়। পরে একসময় আলতাফ মাহমুদ আর তার সঙ্গের সবাইকে নিয়ে যায়। আরেক সময় শরীফ-জামীদের নিয়ে যায়। এরই মধ্যে সকাল ন'টার দিকে হাফিজকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাও ওরা জানে না। স্থান-কালের কোনও হুঁশ কারও ছিল না। কাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কখন নিয়ে যাচ্ছে— সে সম্বন্ধে কেউ কিছু এখন আর সঠিক করে বলতে পারছে না। ওদের শুধু তীক্ষ্ণভাবে মতে গেঁথে আছে খানিক পরপর ওদের ওপর কীরকম টর্চার করা হয়েছে। ওরা দেখেছে স্বপনের বাবা শামসুল হককে দুই হাত বেঁধে ফ্যানের হুকে ঝুলিয়ে তারপর মোটা লাঠি দিয়ে, পাকানো তারের দড়ি দিয়ে পিটিয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে পানির ছিটে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েছে। তাঁর ওপর খানসেনাদের বেশি রাগ— তাঁর এক ছেলে স্বপন ওদের হাতের মুঠো ফসকে পালিয়ে গিয়েছে। আরেক ছেলে ডালিম আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে।

মেলাঘরের আরেক গেরিলা উলফাতের খোঁজে তাদের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে ধরে এনেছে তার বাবা আজিজুস সামাদকেও। এঁকে আমি নামে চিনি। এঁর স্ত্রী সাদেকা সামাদ আনন্দময়ী গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। সাদেকা আপার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই আমার পরিচয়। ঢাকার কয়েকটা দুঃসাহসিক অ্যাকশানে উলফাতের অবদান আছে। ছেলেকে পায়নি, বাপকে ধরে এনে অমানুষিক নির্যাতন করছে।

এদিন সন্ধ্যার পর আমি ফোনে সুবেদার গুল আর জামীর সঙ্গে কথা বলি। জামী এখন বলল, 'মা, তোমার ফোন পাওয়ার পর গুল আমাদেরই কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু রুটি কাবাব কিনে এনে আমাদের খেতে দেয়।'

রাত এগারোটার দিকে এদের সবাইকে অর্থাৎ ২৯ মধ্যরাত থেকে ৩০ সকাল পর্যন্ত যতজনকে ধরেছিল, তাদের সবাইকে— কেবল রুমী বাদ— জিপে উঠিয়ে রমনা থানায় নিয়ে যায়। সেখানে সবার নাম এন্ট্রি করিয়ে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। এরা যখন রমনা থানায় আসে, তখন চারদিকটা একদম চুপচাপ ছিল। ঘরে ঢোকানোর পর দেখে মেঝেয় অনেক বন্দি শুয়ে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। এদে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা তালাবদ্ধ করে খানসেনারা যখন জিপে করে চলে গেল, তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা হয়। মেঝেয় মরার মতো ঘুমোনো লোকগুলো হঠাৎ সবাই একসঙ্গে উঠে বসে, হইহই করে নতুন বন্দিদের নাম, কুশল জিজ্ঞাসা করে সেবা-যত্ন করা শুরু করে দেয়। কার কোথায় ভেঙেছে, কোথায় রক্ত পড়ছে, কোথায় ব্যথা— খোঁজ নিয়ে কাউকে ব্যান্ডেজ করে, কাউকে ম্যাসাজ করে, কাউকে নোভালজিন খাওয়ায়। প্রথম চোটে সবাইকে পানি খাওয়ায়। যারা সিগারেট খায় তাদের সিগারেট দেয়। তারপর কিছু ভাত-তরকারি আসে, দু'চামচ করে ভাত আর একটুখানি নিরামিষ

তরকারি। যারা পান খায়, তাদের জন্য পানও জোগাড় হয়ে যায়। এই বন্দিগুলোও দেশপ্রেমিক বাঙালি, এরাও কিছুদিন আগে মিলিটারির হাতে ধরা পড়েছে। এদেরও এম পি এ হোস্টেল পর্ব শেষ করে আসতে হয়েছে। এরা নবাগত বন্দিদের বলে, 'কাল ভোরে আবার আপনাদের এম পি এ হোস্টেলে নিয়ে যাবে। আরও টর্চার করবে। একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দিই। প্রথমে দু'এক ঘা মারার পরেই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করবেন, চোখ মটকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকবেন। তখন ওরা পানি ঢেলে খানিকক্ষণ ফেলে রেখে যাবে। এতে পিটুনিটা কম খাবেন।'

পরদিন সকালে আবার গাড়ির শব্দ পাওয়া যায় সাতটায়। এবার একটা বিরাট বাস। সবাইকে উঠিয়ে বাসের সবগুলো জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার এম পি এ হোস্টেল। হোস্টেলে খানিকক্ষণ রাখার পর এদেরকে পিছনের আরেকটা বাড়িতে নিয়ে যায়। গেট দিয়ে বেরিয়ে গলি রাস্তা দিয়ে খানিক গিয়ে এম পি এ হোস্টেলের পিছনের দিকে এই বাড়িটা। শোনা গেল এখানে সবাইকে স্টেটমেন্ট দিতে হবে। এ বাড়িতে যাওয়ার পর আরেক নারকীয় ঘটনার অবতারণা হয়।

স্টেটমেন্ট দেওয়া মানে এক-এক করে একজন আর্মি অফিসার বন্দির বক্তব্য শুনবে, তাকে প্রশ্ন করবে, তার জবাব শুনবে— এবং সেগুলো কাগজে লিখে নেবে। এই 'স্টেটমেন্ট' দেওয়া ও নেওয়ার সময় বন্দিদের ওপর যে পরিমাণ নির্যাতন করা হয়, তা গত দু'দিনের নির্যাতনকে ছাড়িয়ে যায়। অফিসার বন্দিকে প্রশ্ন করে, উত্তর যদি হয় না-সূচক, অমনি শুরু হয় তার ওপর দমাদম লাঠির বাড়ি, লাথি, রাইফেলের বাঁটের গুঁতো। পরপর ক্রমাগত না-সূচক উত্তর হতে থাকলে স্টেটমেন্ট গ্রহণকারী অফিসারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সে খানিকক্ষণের জন্য বিরতি দেয়, তখন খানসেনারা ওই বন্দিকে সিলিংয়ের হুকে ঝুলিয়ে পাকানো দড়ি দিয়ে সপাসপ পেটায়। কাউকে উপুড় করে শুইয়ে দুই হাত পিছনে টেনে পা উল্টোদিকে মুড়ে তার সঙ্গে বেঁধে দেয়— দেহটা হয়ে যায় নৌকোর মতো। লোকটার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, চিৎকারও দিতে পারে না। বেশি ত্যাড়া কোনও বন্দির পা দুটো সিলিংয়ের ফ্যানে ঝুলিয়ে জোরে পাখা ছেড়ে দেয়। নীচের দিকে মাথা ঝোলানো লোকটা ফ্যানের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নাকে-মুখে-চোখে রক্ত তুলে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এরকম নারকীয় কাণ্ডকারখানার ভেতর দিয়ে স্টেটমেন্ট নিতে নিতে বারোটা-একটা বেজে যায়। দেড়টার দিকে শরীফদের তিনজনকে আবার এম পি এ হোস্টেলে কর্নেলের রুমে আনা হয়। কর্নেল বলে তোমরা এখন বাড়ি

স্টেটমেন্ট গ্রহণকারী অফিসারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, সে খানিকক্ষণের জন্য বিরতি দেয়, তখন খানসেনারা ওই বন্দিকে সিলিংয়ের হুকে ঝুলিয়ে পাকানো দড়ি দিয়ে সপাসপ পেটায়। কাউকে উপুড় করে শুইয়ে দুই হাত পিছনে টেনে পা উল্টোদিকে মুড়ে তার সঙ্গে বেঁধে দেয়— দেহটা হয়ে যায় নৌকোর মতো।

যেতে পার। শরীফ জিজ্ঞেস করে রুমীর কথা। কর্নেল বলে 'রুমীকে একদিন পরে ছাড়া হবে। ওর স্টেটমেন্ট নেওয়া এখনও শেষ হয়নি।'

২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

শরীফকে কর্নেল বলেছিল রুমী একদিন পরে ফিরবে। কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আমি কি বিশ্বাস করেছিলাম? শরীফের ফিরে আসার খবর পেয়ে পরশু বিকেল থেকে বাসায় আত্মীয়বন্ধুর ঢল নেমেছে। সবাই রুমীর জন্য হায় হায় করছে। হায় হায় করছে কেন? তবে কি রুমীর ছাড়া পাওয়ার কোনও আশা নেই? গতকাল এগারোটায় আমি মঞ্জুরের সঙ্গে আবার এম পি এ হোস্টেলে গিয়েছিলাম। রুমীর কিছু কাপড়-চোপড়ের একটা প্যাকেট করে সেটা তাকে দেবার এবং তার সঙ্গে দেখা করার প্রার্থনা জানিয়ে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়াই সার। কোনওখানে কোনও সুরাহা করতে পারলাম না। কেউ রুমীর সম্বন্ধে কোনও হদিসই দিতে পারল না। কর্নেল হেজাজীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি নাকি নেই। ক্যাপ্টেন কাইয়ুম, সুবেদার গুল তারাও যেন বাতাসে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। এম পি এ হোস্টেলটা দেখে বোঝাই যাচ্ছে না যে এরই অভ্যন্তরে দিবারাত্রি ওইসব নারকীয় অত্যাচার হয়ে চলেছে। এখানে কি সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে? নইলে ৩১ তারিখে যখন এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এখানে দুটো বাড়িতে যাওয়া-আসা করছি, কোথাও কোনও চিৎকার, গোঙানি শুনিনি কেন? অথচ শরীফ, জামী, মাসুমের কাছে যা শুনেছি, তাতে তো ওই সময়টাতে পিছনের দোতলা বাড়িটার ভেতর বন্দিদের 'স্টেটমেন্ট নেওয়া' চলছিল। নিশ্চয় সাউন্ড প্রুফ ঘর আছে, নইলে একটুও চিৎকার শুনিনি কেন?

বাড়ি ফিরে এসে এই কথাটাই জামী আর মাসুমকে জিজ্ঞেস করলাম। জামী বলল, সাউন্ডপ্রুফ ঘর নেই। তবে এম পি এ হোস্টেলে আর পরের বাড়িটায় পিছন দিক দিয়ে অনেক ঘর আছে। নির্যাতন ওই পিছনে হয়। সামনের দিকে কিছু অফিসরুম সাজানো আছে। রাতের গভীরে অবশ্য এই অফিসরুমগুলোতেও মারধর করার কাজ চালানো হয়।

বিকেলে মান্নান আর নূরজাহান এসেছে। মান্নান চাটগাঁ থেকে ফিরেছে কাল। নূরজাহানের দু'ভাই রসুল ও নাসের মঙ্গলবারেই ছাড়া পেয়েছে। ভীষণ মারের চোটে ওদের অবস্থা কাহিল। রসুলের বাঁহাতের তর্জনী ভেঙে গিয়েছে, পিঠে কোমরে ব্যথা। নাসেরেরও তাই।

আলতাফ মাহমুদের চার শালা আর 'ভাগনে আবুল বারাক' গতকাল ছাড়া পেয়েছে। ওদের অবস্থাও খুব খারাপ। সবাইকে যথেষ্ট রকম পিটিয়েছে, ওর মধ্যে বড় ভাই নুহেলের ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে বেশি চোট লেগেছে, মেজ দীনুর দুই হাত-পায়ের আঙুলের গিঁট, হাতের কবজি ভেঙেছে, প্রচণ্ড চড়ে বাঁ কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে। আলভীর বেঁচে যাওয়াটা প্রায় অলৌকিক মনে হয়। বাসায় আলতাফ একবার তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল সে আলভী নয়, আবুল বারাক, আলতাফের বোনের ছেলে। এম পি এ হোস্টেলের সেই ছোট্ট ঘরটাতে খানসেনারা আবার জিজ্ঞেস করছিল, 'আলভী কৌন হ্যায়'। আলভী একবার বেখেয়ালে প্রায় 'হাম হ্যায়' বলে দাঁড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস পাশেই লীনু দীনুরা আলভীকে মুখস্থ করিয়েছিল 'আমার নাম আবুল বারাক। বাবার নাম অমুক, মার নাম অমুক' অর্থাৎ আলতাফের বোন আর দুলাভাইয়ের নাম।

ওরা পাঁচজন বেঁচে ফিরেছে, আলতাফ মাহমুদ ফেরেনি।

নূরজাহান, মান্নান থাকতে থাকতেই দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই এলেন। শরীফের ফেরার খবর পেয়ে এঁরা রোজ দু'বেলা করে আসছেন। রুমীর জন্য আপশোসের শেষ নেই। মোর্তুজা ভাই বারবার দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, 'রুমীই ২৫ তারিখের অ্যাকশান করেছিল? যদি একটু জানতাম ভাবী! রুমীকে কিছুতেই ঢাকায় রাখতে দিতাম না। আপনারা তো আমাদের একদম জানতে দেননি। আমরা যখনই ১৮ নম্বর, ৫ নম্বর রোডের অ্যাকশানের কথা বলেছি, আপনারা শুধু চুপ করে শুনেছেন। এমন ভান করেছেন যেন কিচ্ছু জানেন না,

আমাদের মুখ থেকেই প্রথম শুনছেন।' দাদাভাই একরকম তিরস্কার করেই বললেন, 'রুমী মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিল, আমাদের একটু বললে কী হত? আর না হয় নাই বলতেন, রাতের বেলা তো আমাদের বাড়িতে শুতে পাঠাতে পারতেন।'

কী জবাব দেব এ কথার? দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই নিজের নিজের বাড়ির ছেলেদের সামলে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছেন, দেখতাম। তার ওপর রুমীকে ওদের ঘাড়ে চাপাবার কথা চিন্তাই করতে পারতাম না।

বাঁকা ফিরেছে চাটগাঁ থেকে। বাঁকা, মঞ্জুর, মিকি, মোর্তুজা, দাদাভাই, ফকির, মিনিভাই— সবাই মিলে নানারকম চিন্তাভাবনা করছেন রুমীকে ছাড়ানোর ব্যাপারে কী উপায় করা যেতে পারে। সবারই কোন না কোনও সামরিক অফিসারের সঙ্গে পরিচয় বা খাতির আছে। সবাই নিজের নিজের মতো করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টায় আছেন।

লালু আর মা ৩০ তারিখে এ বাসায় এসেছিলেন, আর যেতে দিইনি। এখানেই রয়ে গিয়েছেন। মাও তার নিজের মতো করে জায়নামাজের পাটিতে বসে আল্লাহর কাছে দেন-দরবার করছেন রুমীর জন্য।

এইসব ডামাডোলের মধ্যে জামীর জন্মদিন কখন এসে চলে গিয়েছে, কারও খেয়ালই নেই। জামীর নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই। আমার হঠাৎ মনে পড়ল সন্ধ্যার মুখে। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এসেছিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একসময় উঠলেন। উনি এমনিতেই কথা খুব কম বলেন। আর এখন তো বলার কিছুই নেই। ওকে বিদায় দিতে বাইরের গেট পর্যন্ত গেলাম! বাগানে চার পাঁচটা গোলাপ গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে বোরহান বললেন, 'ভারি চমৎকার ফুল তো। বাগান একেবারে আলো করে ফুটে রয়েছে।'

আমি বললাম, 'ফুলগুলোর এতটুকু লজ্জা বা হৃদয় বলে কিছুই নেই। সারাবছর এত খাটি, এত যত্ন করি ওদের জন্য। অথচ আমার এত বড় সর্বনাশেও ওদের কিছু যায় আসে না। কেমন নির্লজ্জের মতো ফুটে রয়েছে।'

কেমন এক আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইলাম বনি প্রিন্স, এনা হার্কনেস, সিমোন আর পিসয়ের উজ্জ্বল, সুখী চেহারাগুলোর দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মনে পড়ল রুমী বনি প্রিন্সের একটা আধ-ফোটা কলি উপহার দিয়েছিল আমার জন্মদিনে। আহা, আমার বনি প্রিন্স আজ কোথায়? কোন জালেমের হাতে শুকিয়ে ঝরছে?

এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল আজ জামীর জন্মদিন। আমার আরেকটা বনি প্রিন্স তো রয়েছে। রুমীর

'ফুলগুলোর এতটুকু লজ্জা বা হৃদয় বলে কিছুই নেই। সারাবছর এত খাটি, এত যত্ন করি ওদের জন্য। অথচ আমার এত বড় সর্বনাশেও ওদের কিছু যায় আসে না। কেমন নির্লজ্জের মতো ফুটে রয়েছে।' কেমন এক আক্রোশভরা চোখে চেয়ে রইলাম বনি প্রিন্স, এনা হার্কনেস, সিমোন আর পিসয়ের উজ্জ্বল, সুখী চেহারাগুলোর দিকে।

শোকে জামীকে ভুলতে বসেছি!

আমি বনি প্রিন্সের ফুলটা ছিঁড়ে নিয়ে জামীর খোঁজে বাড়ির ভেতর গেলাম। একতলায় নেই, দোতলায় নেই। ছাদে গিয়ে দেখি জামী খোলা ছাদের মেঝেতে বসে মাথা নিচু করে সেতার বাজাচ্ছে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জামী টের পেল না। একটু নিচু হয়ে দেখলাম ও চোখ বুজে বাজাচ্ছে, চোখের পাতা ভেজা। বুকে ধাক্কা লাগল, জামী প্র্যাক্টিস করার সময় রুমী তবলা বাজাত। সেই কথা মনে হয়ে কি জামীর চোখে পানি? নাকি ওর জন্মদিনে ওর ভাইয়ার কথা মনে করে চোখে পানি? বাড়ির সবাই ওর জন্মদিনের কথা ভুলে গিয়েছে বলে অভিমানে ওর চোখে পানি?

আমারও চোখ ভরে পানি এল, ফুলটা আলতো করে জামীর গালে ছুঁইয়ে অস্ফুটে বললাম, 'মেনি মোর রিটার্নস।'

৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? কদিন থেকে স্রোতের মতো আত্মীয়, বন্ধু আসছে, রুমীর জন্য মাতম করছে, তা দেখে আমার মনে তো শান্তি হওয়া উচিত। কতজনের বেলায় শুনি— মিলিটারি এসে স্বামী বা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর সে বাড়িতে আত্মীয়বন্ধু ভয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমার বেলায় উল্টো। তবু হঠাৎ আজ বিকেলে আমি খেপে গেলাম কেন? তখন বসার ঘর, খাওয়ার ঘর ভর্তি করে বসেছিলেন, বাঁকা, মঞ্জুর, ফকির, মোস্তাহেদ, মিনিভাই, নূরুজ্জামান, দাদাভাই, মর্তুজা ভাই এবং এঁদের মিসেসরা। আমি খাওয়ার ঘরের চৌকিটায় শুয়েছিলাম, মিসেসরা এদিকে আমার কাছে বসেছিলেন। মিস্টাররা ওদিকে বসার ঘরে।

দুপুরে একটু কেমন যেন হয়েছিল। খুব কান্না পেয়েছিল, কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম ব্যাপারটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, কিন্তু থামাতে পারছিলাম না। শেষে হিঙ্কার মতো উঠে চোখে অন্ধকার হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ি। মনে হচ্ছিল গলার কাছে দমটা আটকে গিয়েছে। শরীফ অফিসে ছিল। মা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন। সানু, খুকু, মঞ্জু এবং আরেক পড়শি আকবরের মা এসে শুশ্রূষা করেছিলেন। আকবরের মা মাথায় তেলপানি থাবড়ে দিতে দিতে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন মগবাজারে পাগলাপির খুব তেজি পির, ওর পায়ের ওপর গিয়ে পড়তে পারলে রুমীর একটা উপায় হবেই হবে। পিরফকিরে জীবনে কখনও বিশ্বাস ছিল না। এখন রুমীর জন্য পাগলাপীরের কাছে যাব বলে স্থির করেছি। আগামীকাল আকবরের মা আমাকে নিয়ে যাবেন ওর কাছে।

আমার অসুস্থতার কথা শুনেও আরও আত্মীয়বন্ধু দেখতে আসছেন। ডাঃ এ কে খান আগেই এসে ব্লাডপ্রেসার চেক করে দেখে এখন ওপাশে শরীফদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল আতিক, বুলু, চাম্মু, হাফিজ, জুবলী। আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'আচ্ছা, তোমরা সবাই এত এ বাড়িতে আস কেন? জান না, মেইন রোডে ছদ্মবেশে আই বি'র লোক সর্বক্ষণ নজর রেখেছে এ বাড়ির ওপর? তোমাদের সব্বার বিপদ হবে, দেখো।'

আমার মন বিকল হওয়ার আরও কারণ ছিল। কাল রাতে মাসুম একসময় আমাকে একা পেয়ে চুপিচুপি বলে, 'চাচি, চাচা আমাকে বারণ করেছেন আপনাকে বলতে। কিন্তু না বলে পারছি না। চাচাকেও বেত দিয়ে খুব মেরেছে। পিঠে দাগ পড়ে গিয়েছে। আপনি চালাকি করে একসময় পিঠটা দেখে নেবেন, তারপর উনাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি বলেছি তা বলবেন না যেন।'

আমি মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম। শরীফকে বেত মেরেছে, সেটা সে আমার কাছে লুকিয়েছে! উঃ! কী মানুষ! কোথায় সব খুলে বলবে, পিঠে তেল বা মলম লাগিয়ে দেব। তা না। তাই দেখি ফিরে আসার পর থেকে একদম জামা খোলে না। গোসলের আগে জামা পরেই বাথরুমে ঢুকে যায়।

আজ সকাল থেকে তক্কে তক্কে ছিলাম।

বাথরুমের সঙ্গে লাগানো ড্রেসিংরুম। ড্রেসিংরুমে ঢুকে জামা খুলে বাথরুমে ঢুকতে যাবে, অমনি আমি দরজার কাছে এসে হাজির। 'একি তোমার পিঠে দাগ কিসের? দেখি দেখি।' বলে ড্রেসিংরুমে ঢুকে গিয়েছি। শরীফের তখন স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। সে আরও স্বীকার করল, খানসেনারা বুট-পরা পা দিয়ে তার মাথাতেও মেরেছে। ফলে তার মনে হয় সবসময় মাথায় যেন একটা লোহার টুপি এঁটে বসানো আছে।

এইসব বলতে বলতে শরীফ হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ও আমাকে ধরেই ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বসতে হল। আমরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে 'রুমী, রুমী' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম। আমি জীবনে কখনও শরীফকে কাঁদতে দেখিনি। এই প্রথম ও রুমীর নাম করে কাঁদল।

শরীফ শেভ, গোসল করে নাশতা খেয়ে অফিসে চলে যাওয়ার পরও আমি সুস্থির হতে পারছিলাম না। শরীফের মানসিক অবস্থার কথাই ভাবছিলাম। ও চিরকাল ধীর, স্থির, দায়িত্বসচেতন। ওর মানঅপমান-জ্ঞান অন্য অনেকের চেয়ে বহুগুণে তীক্ষ্ণ। খানসেনাদের বর্বর নির্যাতনে ও শরীরে যত না যন্ত্রণা পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অপমান বোধ করেছে মনে। এ কয়দিন আমি শুধু দুঃখবোধেই যেন আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন শরীফের মনের ক্রোধ আর অপমানবোধটা আমার মনেও ছড়াতে শুরু করল।

খুব অস্থির হয়ে এঘর-ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জামী ডেকে বলল, 'মা, দেখে যাও।' ওর ঘরে গিয়ে দেখি ও গত কয়েকদিনের খবর কাগজ সামনে নিয়ে দেখছে। একটা কাগজ তুলে বলল, 'এই দেখো।'

এই কদিনে আমি খবর কাগজের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন বসে কাগজটা মেলে দেখলাম অনেকরকম অস্ত্রশস্ত্রের একটা বড় ছবির নীচে লেখা

শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার কয়েকজন গ্রেপ্তার।

জামী বলল, 'মা, মনে হচ্ছে এগুলোই আলম ভাইদের বাড়ির রান্নাঘরের নীচে থেকে বের করেছে।'

খবর কাগজের ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্টেনগান, রাইফেল, স্টেনের ম্যাগাজিন, পিস্তল, গ্রেনেড, মাইন, তারের বাণ্ডিল আরও কী কী যেন।

৩১ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার, পাকিস্তান টাইমস— সব কাগজেই অস্ত্রশস্ত্রের ছবি বেরিয়েছে। সব কাগজে একই খবর ছাপা হয়েছে, 'গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে একাদিক্রমে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযানগুলো চালানো হয়।'

দেশপ্রেমিক নাগরিক! আল্লাহ, এই দেশপ্রেমিক নাগরিকদের জন্য তোমার নিকৃষ্টতম, ভয়াবহতম হাবিয়া দোজখও যথেষ্ট হবে না।

আমার মনের মধ্যে মাথার মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণা দপদপ করে জ্বলতে লাগল।

আমি জামীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা কথার জবাব দে দেখি। স্ট্রেইট উত্তর দিবি। রুমীকে কীরকম টর্চার করেছে?'

জামী হঠাৎ চমকে যেন বোবা হয়ে গেল। আমার মনের মধ্যে রাগ, ঘৃণা, ক্ষোভ, দুঃখ সব যেন একসঙ্গে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল। আবার বললাম, 'তোরা তো এসে সবার কথাই বলেছিস, বদিকে কীরকম টর্চার করেছে, আলতাফ মাহমুদের রক্ত বের করে দিয়েছে, হাফিজের চোখ গেলে দিয়েছে, বাশারের হাত ভেঙেছে, স্বপনের বাবা, উলফাতের বাবা, শাহাদতের দুলাভাই, আলমের ফুপা সবাইকে হুকে ঝুলিয়ে পিটিয়েছে, পিঠের ওপর চড়ে পায়ে মাড়িয়েছে, জুয়েলের আঙুল ভেঙে দিয়েছে, চুল্লুকে আধমরা করে ফেলেছে। রুমীকে কতখানি টর্চার করেছে, তোরা কেউ বলিসনি কিন্তু। এখন বল আমাকে—'

এইসব বলতে বলতে শরীফ হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। ও আমাকে ধরেই ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বসতে হল। আমরা দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে 'রুমী, রুমী' বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদলাম। আমি জীবনে কখনও শরীফকে কাঁদতে দেখিনি।

জামী বলতে গেল, 'মা, মা শোনো'—

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কোনও কথা শুনব না। আমি জানতে চাই রুমীকে কতখানি টর্চার করেছে। বল তুই। দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাছ থেকে খবর পেয়ে মিলিটারি আমার রুমীকে ধরে কতখানি টর্চার করেছে, আমি জানতে চাই।'

জামী মাথা তুলে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়াকে আমরা শেষ দেখি ৩০ তারিখের দুপুরে। তারপর সেই ছোট ঘরটা থেকে ভাইয়া, বদি ভাই আর চুল্লু ভাইকে নিয়ে যায়। তারপর আর ভাইয়াকে দেখিনি। সকালে ভাইয়াকে যখন ছোট ঘরে আনে, তখন ভাইয়া প্রথমে আমাদের চারজনকে একসঙ্গে বলে, আমরা যেন সবাই আর্মির কাছে একরকম কথা বলি। একটু পরে ভাইয়া আব্বুর কাছ থেকে একটু সরে বসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাদা কথা বলে। ওই সময় বলেছিল, 'আমি শুধু নিজে পঁচিশের রাতের ঘটনা স্বীকার করেছি। ওরা আমাকে খুব মেরেছে, আরও অনেকের নাম বলার জন্য। আমি শুধু বদি ছাড়া আর কারও নাম জড়াইনি। সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব বদি আর আমি নিয়েছি। 'আমি বলেছিলাম, 'ভাইয়া, যদি খুব বেশি টর্চার করে?' ভাইয়া বলেছিল, 'তুইতো জানিস আমি কত টাফ। ওরাও সেটা বুঝে গিয়েছে। ওরা আমাকে ব্রেক করার জন্য এমনভাবে টর্চার করেছে বাইরে কোথাও কাটেনি, ভাঙেনি। কিন্তু ভেতরটা মনে হচ্ছে চুরচুর হয়ে গিয়েছে! দেখিস, আম্মাকে যেন বলিস না এসব কথা।' মা, তুমি জোর করলে, তাই বলে দিলাম। ভাইয়া কিন্তু বারণ করেছিল।

আমি প্রাণপণে নিজেকে শক্ত রেখে বললাম, 'আমার জানার দরকার ছিল। ভয় নেই, আমার কিছু হবে না।' উঠে রুমীর ঘরে গেলাম। বইয়ের আলমারি খুলে বের করলাম একটা বই হেনরি এলেগের 'জিজ্ঞাসা'। রুমী এটা আমাকে পড়তে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। বলেছিল, 'আম্মা, যার ওপর টর্চার করা হয়, খানিকক্ষণ পর সে কিন্তু আর কিছু ফিল করে না। পরে যারা শোনে বা পড়ে তারাই বেশি শিউরায়, ভয় পায়।' রুমী আরও অনেক কিছু আমাকে বলেছিল শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পর কী কী উপায়ে তাদের টর্চার সহ্য করে নেওয়া যায়। কী কী পন্থায় টর্চার সহনীয় করে মুখ বন্ধ রাখা যায়। এ সম্বন্ধে সে ইপক্রেস ফাইল এবং আরও কয়েকটা বই আমাকে পড়তে দিয়েছিল।

রুমী। রুমী। তুই কি সত্যিই ওই সব পন্থাতে ওদের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারছিস? তুই কি সত্যিই খানিক পরে আর কিছু টের পাস না? আমি কেমন করে কার কাছে তোর খবর পাব?

ক্রমশ

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

আরও অনেক বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 Fax: 2287-6448 E-mail: books@swarnakshar.in

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভ্রমণ কথা

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

পথের সাথী

বার্লিন থেকে শ-খানেক কিলোমিটার ছাড়িয়ে বনজঙ্গলে ঢাকা স্প্রীনদীর শাখা-প্রশাখায় ঘুরতে ঘুরতে বন্ধু পেয়েছিলাম মিউনিখের আন্দ্রে-রেজিনাকে। মিউনিখে ফিরে গিয়েও তাঁরা আমাকে ভোলেননি, কদিন পর আমি সেখানে পৌঁছে তাঁদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছি।

এই সাক্ষাতের এক বছর পর এক রবিবার মিউনিখ থেকে আন্দ্রের ফোন পেলাম কলকাতায়— তাঁদের বিয়েতে আমাকে আসতে হবে। বিয়ে হবে মিউনিখ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে। তাঁদের সঙ্গে যাওয়া, তাঁদের গ্রামের বাড়িতে থাকা। সেই পথ, ওই গ্রাম, গ্রামের গির্জায় তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠান আমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

আন্দ্রে-রেজিনার ছেলের বয়স যতদূর মনে পড়ে তেরো, সে তখন লন্ডনে ইংরিজির কোর্স করছে, মেয়ের বয়স দশ বা এগারো, এদের মা-বাবার যে তখনও বিয়েটাই বাকি, বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে জানলাম।

যাওয়া হয়নি, কিন্তু মন ভরে গেছে।

লিথুয়ানিয়ার বন্ধু বিতাস সেখানকার একটি খবরের কাগজের প্রধান সম্পাদক। কতবার তার দেশ দেখে যাবার নিমন্ত্রণ করেছে। আজও আমার যাওয়া হয়নি। এবার তারই সস্ত্রীক আসার কথা 'ভ্রমণ'-এর মহাশ্বেতার বিয়ের অনুষ্ঠানে। আসতে পারলে ফেরার পথে আমাকেও নাকি ধরে নিয়ে যাবে তার দেশে।

জানি যাওয়া হবে না, কিন্তু মন তো ভরে যায়।

ভ্রমণপথের বন্ধু ক্রিস্টিনে-প্রিকিতে এবছর জুন মাসে একদিন বিকেলে এসে আমাকে মিউনিখ থেকে নিয়ে গেল তাদের গ্রামের পাহাড়ে অগ্নি-উৎসব দেখতে। শীতের শেষে এই উৎসব গ্রামবাসীদের গ্রীষ্মবন্দনা। আশপাশের সব গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা আকাশচুম্বী বিপুলাকার আগুনের চারপাশে জড়ো হয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত হাওয়ায়-তোলপাড় আগুননৃত্য দেখে। সেই সঙ্গে পানাহার। আগুনের ফুলকিতে আকাশ ভরে যায়। বাচ্চারা সেই ফুলকির ছাই কুড়োতে চারদিকে শুধু দৌড়ে বেড়ায়।

আইফেল টাওয়ার, প্যারিস

সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে দু-আড়াইশো বছরের পুরনো মস্ত একটা কাঠের দোতলা বাড়িতে আমার রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। উৎসব প্রাঙ্গণে উৎসবের অঙ্গ বিয়ার ও বৃহদাকার মাংসখণ্ড খাইনি বলে এই বাড়িতে আমাকে দেওয়া হল স্পেনের চিজ ও ইটালির ওয়াইন। মধ্যরাত পেরিয়ে তারই দুয়েকটি টুকরোতে, দুয়েক চুমুকেই আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হল। ক্রিস্টিনেরা আমাকে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর হেপাজতে রেখে বাড়িতে ফিরে গেলে সেই রোমাঞ্চকর পরিবেশ আর রহস্যময় কাষ্ঠপ্রাসাদ আমাকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মনে আছে। বনের মধ্যে কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীন প্রাসাদে বাসিন্দা বলতে দোতলায় আমি

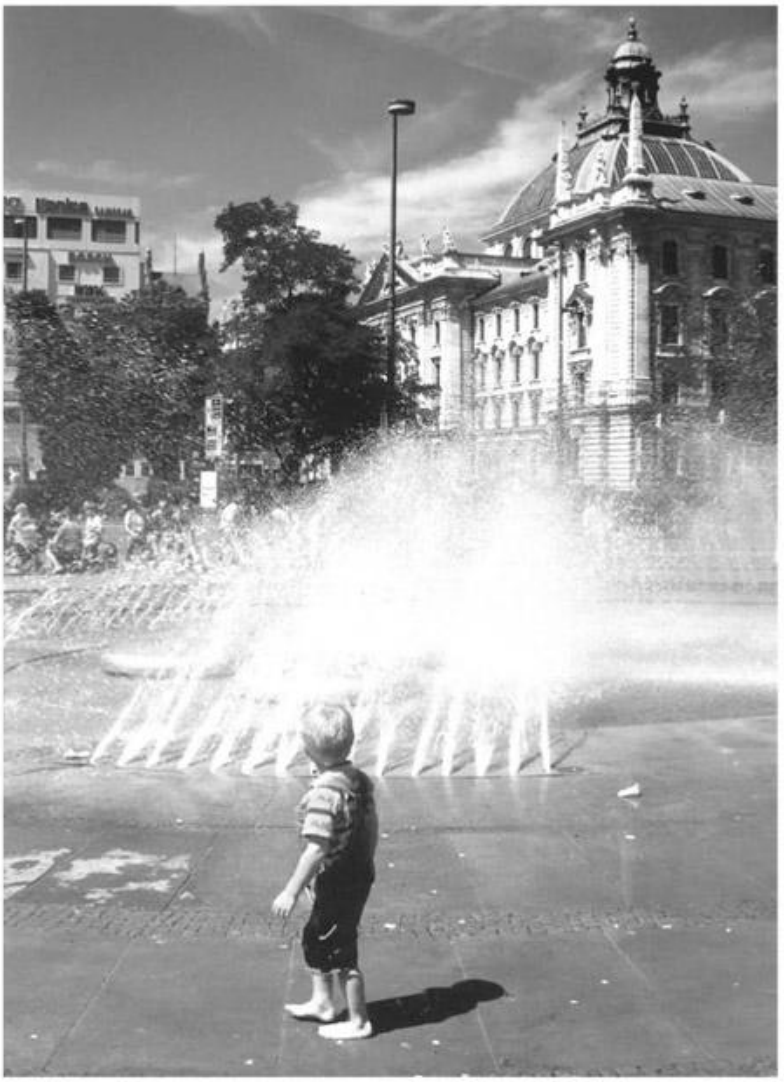

কার্ল প্লাৎস, মিউনিখ

টেনেরিফ থেকে ইসাবেলার চিঠি এল: আজ সকালে একটা ছবি আঁকলাম, সেটা শাদাপাল (আমার 'শাদা ঘোড়া' গল্পের ঘোড়াটার নাম), না ক্লোশে ডেবোরাহ্ (ইসাবেলার শৈশবের ঘোড়ার নাম) আমি জানি না।

আর একতলায় সেই থুত্থুরে বুড়ি। রূপকথা এতাবৎ বইয়েই পড়েছি, সেই রাতে বাস্তবে দেখলাম।

বাভারিয়ান আল্পস পাহাড়ে ওবেরআমেরগাওয়ে আমার একবার যাবার ইচ্ছা আছে শুনে সেই রূপকথার বুড়ি বললেন, সেখানে তাঁর বাপের বাড়ি, আমি চাইলে তিনি আমাকে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে যত দিন খুশি তাঁর বাপের বাড়িতে আমি থাকতে পারি।

যাওয়া হয়নি, কিন্তু তাঁর মুখের কথায় আমার মন ভরে গেছে।

পরদিন সকালে ক্রিস্টিনে-প্রিকিতেদের বাড়িতে ব্রেকফাস্ট। নিষ্কলঙ্ক কদলী, নিখুঁত টোস্ট আর কফি সবই আমার পছন্দ মতো।

চিনের প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে ক্রিস্টিনে অনেকদিন গবেষণা করছিল, গতকাল দেশ-বিদেশের চিনাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের সামনে তারই শেষ মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে আমাকে অগ্নি-উৎসব দেখানোর জন্য আনতে গিয়েছিল। তারপর আজই চলল ইন্সবুর্গ দেখাতে। ইন্সবুর্গ যেতে যেতে হঠাৎ আমার সালসবুর্গ যাবার ইচ্ছে হল। পরদিন সাতসকালেই দিল্লির বিমান ধরতে হবে, ফলে সেই সন্ধ্যায়ই মিউনিখে ফিরে এলাম। হাতে সময় থাকলে দূরের পথে যাওয়া যেত। ছিল অনেক দূরের নিমন্ত্রণ।

যাওয়া হল না, কিন্তু মন ভরে গেল।

মিউনিখ যাবার বিমানে আলাপ হয়েছিল আলেকজান্ডার বার্ত-এর সঙ্গে। আদিবাড়ি হল্যান্ডে, কর্মসূত্রে থাকেন ইতালি, ভারত দেখবার জন্য ব্যাকুল। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, সেই শিশুর তিন মাস বয়স হলে তাকে তার দিদিমার কাছে রেখে আলেকজান্ডার বউ নিয়ে ভারতভ্রমণে আসবেন। তার আগে আমি যেন অবশ্যই তাঁদের বাড়িতে যাই।

কোথায় তাঁদের বাড়ি? ক্যাস্টেলবেত্রোয়। ক্যাস্টেলাবেত্রো কোথায়? মদেনায়। মদেনা কোথায়? বোলোনিয়া থেকে ৩০ কিলোমিটার।

এইসব যাদু-জায়গার নাম আর তাঁর বাড়ির ফোন-ফ্যাক্স নম্বর লিখে দিয়ে আকাশপথের বন্ধু বললেন, অতি অবশ্য চলে আসুন, মদেনার নিসর্গসৌন্দর্য আর সেখানকার মানুষের দিলখোলা জীবনযাত্রা আপনাকে মুগ্ধ করবেই। মদেনা ইটালির মধ্যে, কিন্তু মদেনার অধিবাসীরা আলাদা।

মাস-দেড়েক আগেই একবার ইটালির বিখ্যাত রোম-ভেনিস-ফ্লোরেন্স গিয়েছিলাম, তখন কারও মুখে, কই, মদেনার কথা শুনিনি তো!

মদেনা আমার এখনও যাওয়া হয়নি, কিন্তু শুনে থেকেই যাবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছি।

মাদ্রিদে বন্ধু পেয়েছিলাম ম্যাগদেলোনা ও এদোয়ার্দোকে। ম্যাগদেলোনা সমাজতত্ত্বের শিক্ষিকা ও কবি। তাঁর বন্ধু এদোয়ার্দো ইলেক্ট্রনিক পাবলিশিং সংস্থায় কাজ করেন। এঁরা আমাকে মাদ্রিদ শহর ঘুরিয়েছেন, সমকালীন শিল্প মিউজিয়ামে পিকাসোর চিত্র ও ভাস্কর্য দেখিয়েছেন, মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজের নিমন্ত্রণে শহরের দুই প্রান্তের দুরকম রন্ধনশৈলীর রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেছেন। তাঁদেরই ব্যবস্থাপনায় সারাদিন কাটিয়েছি মাদ্রিদের রানি সোফিয়ার নামাঙ্কিত মিউজিয়ামে শুধু পিকাসো দেখে।

চলে আসার দিন এদোয়ার্দো পিকাসোর গোয়েরনিকার বৃহদায়তন মুদ্রণ ও তাঁরই ছবির তাস আর স্পেনের বিখ্যাত ওয়াইন উপহার দিয়েছেন। স্পেনের বেশ পুরনো ও বিশিষ্ট ওয়াইন আমি বয়ে আনতে রাজি নই দেখে আমার স্যুটকেস খুলে, নিপুণ হাতে বোতলটি

জায়গামতো গুঁজে দিয়েছেন। তাছাড়া মাদ্রিদ ছাড়িয়ে স্পেনের নানা অঞ্চলে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ তো ছিলই।

পরে আর যাওয়া হয়নি কিন্তু মনের মধ্যে যাত্রার সুফল যেন পেয়ে গেছি।

টেনেরিফ থেকে ইসাবেলার চিঠি এল: আজ সকালে একটা ছবি আঁকলাম, সেটা শাদাপাল (আমার 'শাদা ঘোড়া' গল্পের ঘোড়াটার নাম), না ক্লোশে ডেবোরাহ্ (ইসাবেলার শৈশবের ঘোড়ার নাম) আমি জানি না। আমি প্রায়ই খুব গভীরভাবে তোমার কথা ভাবি। এখানে টেনেরিফে তোমাকে দেখে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি।

এই সেপ্টেম্বরে চিঠি পেলাম— তোমার জন্য ওরোতাভার উৎসবের অনেকগুলো ছবি পাঠালাম। সত্যি, দারুণ উৎসব!

আবার টেনেরিফে যাবার নিমন্ত্রণ তো আছেই।

হয়তো আর যাওয়া হবে না, কিন্তু এই নিমন্ত্রণই যেন এক মহা তীর্থযাত্রার আনন্দ।

আমার মন চায়, দেশে-দেশে মানুষে-মানুষে চলতে থাকুক এমনই নিমন্ত্রণবিনিময়। নতুন শতাব্দীতে সারা পৃথিবী যেন রাঙা হয়ে ওঠে মানুষের প্রতি মানুষের নিমন্ত্রণে।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' ডিসেম্বর ১৯৯৯

বিশ্বজগৎ দেখা না দেখা

আমাদের এই পৃথিবীকে যখন যতটুকু দেখছি, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য আর অমৃত রহস্যে।

দেশ-দেশান্তরের মানুষজনের যখন যেটুকু পরিচয় পাচ্ছি, তাতেই মন ভরে উঠছে মানুষের আশ্চর্য হৃদয় আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়।

যত দূরে যাই, যত মানুষের পরিচয় পাই ততই যেন আমাদের কাছের মানুষের অসহনশীলতা, অক্ষমাশীলতা, হৃদয়হীনতা, আত্মক্ষয়কারী সব রকমের ক্ষুদ্রতা আরও বেশি করে মনে পড়ে, আমি অবাক হয়ে ভাবি কেন আমরা এইসব অমানবিক অন্ধকার থেকে সহৃদয় মানুষের বিশাল পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাব না! ঘৃণা নয়, ভালোবাসার জন্য তো উষায়-গোধূলিতে পৃথিবী এমন রাঙা হয়েই ওঠে। পৃথিবীর পরিবেশ আর হৃদয়ের প্রীতি সযত্নে রক্ষা করতে না পারলে আমরা বাঁচব না। এ দুই সম্পদ সামান্য নষ্ট হলেই মানুষের জন্য কোথাও আর কোনও আনন্দ থাকবে না, সুন্দর থাকবে না, ভবিষ্যৎ বলেও কিছু থাকবে না!

ভাগ্যের কথা, আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য পৃথিবী আর তার আশ্চর্য মানুষজন দেখে বেড়াবার ডাক পাই।

রেগিনা যখন বড় প্লেটে করে প্রধান পদটি টেবিলের মাঝখানে রেখে প্রথম টুকরোটি কেটে আমার প্লেটে দিচ্ছে আন্দ্রে ততক্ষণে আমাকে ঘরে তৈরি এক গ্লাস ওয়াইন দিয়ে মস্ত একটা ম্যাপের বই এনে তার একটা পাতায় জার্মানি আর ফ্রান্সের বর্ডারে ছোট একটা গ্রাম দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল এই পদটি ওই গ্রামের বহু প্রাচীন ও বিশিষ্ট একটি পদ।

এবার রিও ডি জেনেরোয় দেখা হওয়া মাত্র লিথুয়ানিয়ার বন্ধু বিতাস আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, মার্চে বার্লিনে এসেছিলে, আমাদের ভিলনিয়াস বার্লিন থেকে বিমানে ঠিক দুঘণ্টার পথ। এত কাছে এসেও এলে না! দেশ ছাড়বার ক'দিন আগে একটা ফোন করলেই তো ভিসার কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া যেত।

বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম এক্সচেঞ্জ শেষ করে ঠিক দুদিনের জন্য গিয়েছিলাম মিউনিখে। খবর পেয়েই আন্দ্রে ব্লিৎস সোজা অফিস থেকে আমার হোটেলে এসে শহরের বাইরে তাদের নতুন বাড়িতে নিয়ে গেল ডিনার খাওয়াতে। আন্দ্রে-রেগিনার বিয়ের পর এই বাড়িতেই তাদের নতুন সংসার।

রেগিনা যখন বড় প্লেটে করে প্রধান পদটি টেবিলের মাঝখানে রেখে প্রথম টুকরোটি কেটে আমার প্লেটে দিচ্ছে আন্দ্রে ততক্ষণে আমাকে ঘরে তৈরি এক গ্লাস ওয়াইন দিয়ে মস্ত একটা ম্যাপের বই এনে তার একটা পাতায় জার্মানি আর ফ্রান্সের বর্ডারে ছোট একটা গ্রাম দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল এই পদটি ওই গ্রামের বহু প্রাচীন ও বিশিষ্ট একটি পদ। পদের নাম, গ্রামের নাম দুইই ভুলে গেছি ভেবে একটু খারাপই লাগে। আন্দ্রে কিন্তু অত রাতে নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে বলে একফোঁটা ওয়াইন ছুঁল না।

আমার চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স্ক বন্ধু মার্টিন ১৯৯৮-এ প্রথম পরিচয়ের সময় ছিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, এ বছর সে পাশটাশ করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে চাকরি করছে, ২০০০ সালে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে বলে এখন সে মিলেনিয়াম ইঞ্জিনিয়ার, এইরকমই তার চিঠির ভাষা। তার অফিস মিউনিখ শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে, আমি যেদিন মিউনিখ ছেড়ে আসব, তার অফিসে ছুটি নেই, তবু সে আমার সঙ্গে দেখা করবেই। ভোরে বেরিয়ে একটু পর পর রাস্তা থেকে আমাকে মোবাইল ফোনে জানায় আর কতটুকু পথ বাকি। আমার বেরবার মুখে তার শেষ ফোন, তারপরই দরজায় ঘণ্টি। দরজা খুলে দেখি সামান্য হাঁফ ধরা তার মুখ হাসিতে ভেসে যাচ্ছে। সোনিয়ার ই-মেল দেখাল, তোমার কত আনন্দ— অমরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হবে। আমার ভাগ্যটাই খারাপ, এই সময়ই ট্রেনিংয়ে আটকে রইলাম!

এবছরের কনকনে জানুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশে আন্তর্জাতিক ভ্রমণলেখক সম্মেলনে বন্ধু পেয়েছিলাম রোমের বারবারা আলোইসিয়ো আর দোনাতা পিৎজিকে। এক মাস পরেই বার্লিনে আন্তর্জাতিক পর্যটনমেলায় যাচ্ছি শুনে দুজনে ফ্যাক্সে নিমন্ত্রণ পাঠালেন— 'রোমে তোমার জন্য আমরা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করব। এ হল আমাদের ভেরি স্পেশ্যাল বন্ধুর জন্য বিশেষ অভ্যর্থনা।' সেবার ওদের জন্যই আমার ইতালিতে খ্রিস্টজন্মের একশো বছর আগেকার বন্দরনগরী ওস্টিয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখা হয়েছিল। দোনাতা কাজাখস্তানের ওপর তার একটি মস্ত মোটা ফটোর বইও আমাকে উপহার দিয়েছিল। এত ভারি যে আমি বয়ে আনতে পারিনি।

এইসব সামান্য ছোট ছোট ঘটনা আমার কাছে অসামান্য হয়ে ওঠে। বিস্ময় এই সখ্য এই সহৃদয়তার বার্তা শুনতে আমি কান পেতে রই।

আমাজন থেকে ফিরে এসে জর্জিয়া ভ্রমণের নিমন্ত্রণ পেলাম। যেতে হবে অক্টোবরে। দীর্ঘ ই-মেল পাঠিয়েছেন আমার জর্জিয়ার বন্ধু মানানা দুমবাদজে অর্থাৎ 'দিলিস গাজেতি'-এর উপপ্রধান সম্পাদক। সঙ্গে প্রধান সম্পাদকেরও চিঠি, তাঁর কাগজে নাকি আমার সংবাদ, সাক্ষাৎকার ও জর্জিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

এমাসের শেষে প্যারিসের কাছেই WAN ও IFRAর একটি FORUM-এ আমার নিমন্ত্রণ, সেখানে যেতেই হবে। সেখান থেকে যাব জর্জিয়ায়। সেখানে তাঁরা প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাবেন জর্জিয়ান কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী গ্রাম গ্রিগোলেতিতে, সেখান থেকে পশ্চিম জর্জিয়ার একটা দারুণ সুন্দর জায়গা গুরিয়ায়। তারপর পূর্ব জর্জিয়ার গ্রামে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে, বিখ্যাত দ্রাক্ষাকুঞ্জে, সুরা উৎসবে,

লোকনৃত্যগীত সম্মিলনে। পরিচয় করাবেন বিভিন্ন কবি লেখক শিল্পী, জর্জিয়ার পর্যটন বিস্তারের প্রধান স্থপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে হবে ভ্রমণসাংবাদিকতা বিষয়ে। আমার বন্ধুর বিশেষ ইচ্ছা, অক্টোবরের শেষে রাজধানী তিবিলিসে 'তিবিলিসোবা' উৎসবেও যেন অবশ্যই যোগ দিই।

পৃথিবী ছেড়ে যেদিনই চলে যাই, পৃথিবীটা যেন দেখে যেতে পারি। কেননা পৃথিবী ছেড়ে যাওয়া কোনও ঘটনা নয়, আসল কথা, পৃথিবীটা দেখে যাওয়া।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০০

ঘুরতে ঘুরতে চলে আসা

সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম লাঁও। লাঁও পাথরে তৈরি এক প্রাচীন ও মায়াবী শহর, ফ্রান্সের ইতিহাসের গন্ধে-স্পর্শে ভরা। প্যারিসে এসেছি সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখে। ২৬ তারিখ সন্ধে প্রায় সাতটা পর্যন্ত ছিলাম কলকাতায়, অফিসে। অফিস থেকেই সোজা এয়ারপোর্ট। দিল্লি হয়ে সেই রাতেই প্যারিসের পথে। ভোরে ভিয়েনায় বিমান বদলিয়ে প্যারিস। প্যারিসের কাছেই গ্রিজি-অঁ-ফ্রাঁস-এ মানোয়া দ্য গ্রিজি হোটেলে একটি আলোচনাচক্রে আমার নিমন্ত্রণ।

দুদিন সারাদিনই দফায় দফায় আলোচনা। একেকটি টেবিলে পাঁচ দেশের পত্রিকা পরিচালক। ভারতের তিনজনকে তিন টেবিলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারত থেকে এসেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চিত্রভানু সেন, দ্য হিন্দু পত্রিকার জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর নরসিংহম মুরলী আর ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্র পত্রিকার আমি। প্রত্যেক টেবিলেই আরও চারটি দেশের আলোচক। আমার টেবিলে আছেন অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি ও দক্ষিণ কোরিয়ার চারজন।

দেশবৈচিত্র্যের দিক থেকে আমার কাছে আরও আনন্দের হয়েছিল আলাদা ওয়ার্কশপগুলো। বিশাল হল-এ সকাল ও বিকেলের দুটি করে দীর্ঘ অধিবেশনের মাঝে আলাদা পাঁচটি ঘরে এই ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা। একেকটি ঘরে নানা দেশের বারোজন পত্রিকা পরিচালকের একান্ত আলোচনা ও মতবিনিময়। আমাদের ঘরে আমার সঙ্গে ছিলেন নটি দেশের মোট এগারোজন। হন্ডুরাস, আয়ারল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ইতালি, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ছাড়া জার্মানি ও ইংল্যান্ডের দুজন করে। ডোমিনিক্যান রিপাবলিকের Editorial AA পত্রিকার প্রেসিডেন্ট আনিবালডি কাস্ত্রো আমাকে তাঁদের

কলকাতায় ওই তারিখেই বিকেলে রবীন্দ্রসদনে একটি সরকারি সাহিত্যপুরস্কার গ্রহণ করে আমার কিছু বলবার কথা। সেটি লিখে, ফ্যাক্স করে শুতে গিয়েই আনন্দে চমকে উঠলাম— কাচের জানলা ছাপিয়ে গিজগিজে তারা ভরা আকাশ! অনেকদিন আগে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে স্নান সেরে পরদিন উত্তরকাশীতে এই তারাভরা আকাশ দেখেছিলাম।

দেশে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। মূল অধিবেশনে ও ওয়ার্কশপে আমার সহ আলোচকদের গণ্ডির বাইরে পেরুর Expreso কাগজের প্রকাশক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক এদুয়ার্দো কালমেল তো আমার বন্ধুই হয়ে গেলেন। তাঁর বিজনেস কার্ডের পিছনে 'যত শীঘ্র সম্ভব পেরুতে আসতে আমি তোমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি'— লিখে কার্ডটি আমাকে দিলেন।

২৮ তারিখ দুটি দীর্ঘ অধিবেশন, দু-দফা ওয়ার্কশপ, নৈশভোজ শেষ হল রাত এগারোটায়। তখন, এখন আর মনে নেই তিনি কোন দেশের কোন পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর সঙ্গে গ্রিজির প্রায় জনহীন পথে ঘুরে বেড়ালাম, সঙ্গে গ্রিজির মানচিত্র। দূরে দূরে নিরহঙ্কার ছোট ছোট বাড়ি, সব বাড়িতেই ছোট বড় বাগান, এমন পরিপাটি মফস্বল শহর, ঠিক যেন পটে আঁকা, কয়েকটা দিন থেকে যেতে ইচ্ছে হয়।

হোটেলে ফিরে এলাম রাত একটায়। ঘড়িতে তখন ২৯ তারিখ। কলকাতায় ওই তারিখেই বিকেলে রবীন্দ্রসদনে একটি সরকারি সাহিত্যপুরস্কার গ্রহণ করে আমার কিছু বলবার কথা। সেটি লিখে, ফ্যাক্স করে শুতে গিয়েই আনন্দে চমকে উঠলাম— কাচের জানলা ছাপিয়ে গিজগিজে তারা ভরা আকাশ! অনেকদিন আগে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে স্নান সেরে পরদিন উত্তরকাশীতে এই তারাভরা আকাশ দেখেছিলাম।

দুদিনের আলোচনাচক্রের শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ট্যুরিস্ট কোচে প্যারিস পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা, অথবা যাঁরা দেশে ফিরবেন, তাঁদের, বিমানবন্দরে। আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম লাঁও। জায়গাটার কথা হোটেলের একটি ছেলের কাছেই শুনেছিলাম। তার ছেলেবেলা কেটেছে তার প্রিয় ওই দুর্গনগরীতে। সে-ই আমাকে সঙ্গে করে প্রথমে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে ও সেখান থেকে গার দু নর-এ পৌঁছে দিয়ে যায়। গার দু নর বা উত্তরের স্টেশন থেকে লাঁও (Laon) ১৪০ কিলোমিটার। দুঘণ্টার রাস্তা, ভাড়া ১৪০ ফ্রাঁ, আমাদের হাজার টাকার মতো।

ছোট্ট ছিমছাম স্টেশন, ছোট্ট শহর, যেন একটা দোতলা শহর, রাস্তা ছেড়ে দেড়শো-দুশো সিঁড়ি ভেঙে দোতলার সেই পাহাড়ি এলাকায় পৌঁছতে হয়। এই অংশটাই প্রাচীন দুর্গশহর। ইতিহাস-উৎকীর্ণ পাথরের শহর। শহরটির নামের বুৎপত্তিগত অর্থে লাঁওকে আলোর শহরও বলা হয়। দুর্গ গির্জা প্রাচীন অট্টালিকার গায়ে বিকেলের অদ্ভুত আলোর জন্যই এ শহরকে আলোর শহর বলতে ইচ্ছে করে।

এখানেই দু-সারি প্রাচীন বাড়িঘরে ঘেরা একটা গলির মধ্যে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে এসে আলাপ হল এক বৃদ্ধ দম্পতির সঙ্গে। কথায় কথায় বললেন, কাল এঁরা যাচ্ছেন সোয়াশোঁ (Soisson), সোয়াশোঁ ছিল ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী, কাল সেখানে মধ্যযুগোৎসব, সোওয়াশোঁর রাস্তা জুড়ে বসবে মধ্যযুগীয় বাজার।

সোয়াশোঁ কোথায়, কোন দিকে, কত দূর?

দুজনেই সমান উৎসাহে আমাকে সোয়াশোঁর হদিশ দিলেন। লাঁও থেকে প্যারিসের দিকে মাত্রই ৩৫ কিলোমিটার। সোয়াশোঁতে এন (AISNE) নদীর ধারে একটা হোটেলের খবরও দিলেন এঁরা।

পরদিন সকালের ট্রেনে সেখানে পৌঁছে শুনলাম হোটেলটা বেশ দূরে। দূরত্বের কথা বলে এক ভদ্রলোক অদূরের একটা গাড়ির ডিকি খুলে আমাকে বললেন— রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে নদীর ধারে শুয়ে থাকতে বোধহয় তোমার বেশি ভালো লাগবে। তোমার হোটেলটা একেবারে নদীর ওপরেই। এখন ভাবো। আমার ট্যাক্সিতে উঠে পড়বে, নাকি ভাবতেই থাকবে?

ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি খুবই ছোট্ট হোটেল, বোধহয় চার-পাঁচটা ঘর, ঘরের দেওয়াল জোড়া জানলা আর সেই জানলা জোড়া নদী। ভাড়া? স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত ট্যাক্সির যা ভাড়া হোটেলেরও তাই ভাড়া। ৮০ ফ্রাঁ।

আমি নাম না জানলে কী হবে, সোয়াশোঁ বহুকাল ধরেই ফ্রান্সের একটি বিখ্যাত শহর। এ শহর শিল্প আর ইতিহাসের শহর। ৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে গল-এ ক্লোভির কাছে শেষ রোমান

আর্ক দ্য ত্রোয়াম্ফ, প্যারিস

জেনারেল সিয়াগ্রিয়াসের পরাজয়ের পর সোয়াশোঁ হয়ে গেল মেরোভিনজিয়ান বংশের রাজাদের অধীনে ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী। এই ক্লোভিকে আবার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেন্ট রেমি, পঞ্চম শতকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের লাঁও সাধু রেমির শাসনাধীনে ধর্মশাসিত শহর হয়ে ওঠে। এই যে আমি লোকের মুখে শুনে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম লাঁও আর সোয়াশোঁ, এই পুরো এলাকাটার নাম পিকার্ডি অঞ্চল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সোয়াশোঁর অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এখনও যেখানে যেটুকু আছে, যাঁরা প্যারিসে আসেন তাঁরা অন্তত একবেলার জন্যও এসে দেখে যেতে পারেন। আমার মতো ঘুরতে ঘুরতে যদি চলে আসেন তো আরও ভালো, তাহলে হয়তো আরও কোনও না জানা জায়গার সন্ধান পেয়ে যাবেন। তবে লাঁও-সোয়াশোঁ এলে প্রথমে আসবেন সোয়াশোঁ তারপর লাঁও। প্যারিসের 'গার দু নর' বা 'উত্তরের রেলস্টেশন' থেকে সোয়াশোঁই আগে পড়বে।

সোয়াশোঁর বিধ্বস্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কোথাও কোথাও মূলের মতোই পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকেও আদি সৌন্দর্য খানিকটা হয়তো আঁচ করা যায়। পুরো শহরটা হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম, ভারি ভালো লাগল।

মধ্যযুগের বাজার বলতে পশুপাখি টুপি-দস্তানা হাতা খুন্তি ছুরি তলোয়ার পাথর বা ধাতুর বাহারি পানপাত্র— প্রাগাধুনিক যুগের যাবতীয় জিনিসের পসরা। পশুপাখির মধ্যে ঘোড়া কুকুর বিচিত্র পাখি ইত্যাদি বিধাতার হরেক সৃষ্টি।

এবার গ্রিজি-অঁ-ফ্রান্সে এসে প্যারিসের পরিচিত কাউকে সে-খবর জানাইনি। প্রথমত সংবাদপত্র প্রকাশনার নতুন সৃষ্ট সমস্যাবলির ওপর নিশ্ছিদ্র আলোচনাচক্র ও দীর্ঘ ওয়ার্কশপ, তারপর ৮ অক্টোবর এখান থেকেই যাব দূর দেশের নিমন্ত্রণে, মাঝের ক'টা দিন দেশে ফেরার পক্ষে ব্যয়বহুল, প্যারিসের প্রিয়জনসঙ্গের পক্ষে অপ্রতুল। প্রথম ফোন করলাম সোয়াশোঁ থেকে, মালাকফের মাদাম

> শুনলাম আজ নাকি অষ্টমী। সিতে য়্যুনিভারসিতে বা ইউনিভার্সিটি সিটিতে পৃথিবীর নানা দেশের নিজস্ব মেজোঁ বা ভবন, সাত নম্বর প্রবেশপথ দিয়ে সোজা মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ, ভারতভবন। ঢাকের আওয়াজেই চেনা যায়। সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা। নিমেষে মন নেচে ওঠে।

ঘোষকে। তিনি টেলিফোনেই হইহই করে উঠলেন— প্যারিসে পুজো হচ্ছে আর আপনি এখানে এসেও কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এক্ষুনি চলে আসুন, মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ-এ বাঙালিদের এই দুর্গাপুজো দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ মনে আছে? সেই যে সিতে য়্যুনিভারসিতেতে।

শুনলাম আজ নাকি অষ্টমী।

সিতে য়্যুনিভারসিতে বা ইউনিভার্সিটি সিটিতে পৃথিবীর নানা দেশের নিজস্ব মেজোঁ বা ভবন, সাত নম্বর প্রবেশপথ দিয়ে সোজা মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ, ভারতভবন। ঢাকের আওয়াজেই চেনা যায়। সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা। নিমেষে মন নেচে ওঠে। দোতলায় উঠেই পুজোর প্রসাদ, দুপুরে ভোগ— তপ্ত ভাত আর পাঁচরকম সবজির গরমাগরম ঘণ্ট, প্লাস্টিকের গ্লাসে পায়েস। কোথায় কী খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম, প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে গেল।

এমন নিষ্ঠাভরে এমন সমবেত আনন্দে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুজো বহুকাল আমার দেখা হয়নি। সেইসঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোনওদিন ওড়িশি নৃত্য, কোনওদিন কত্থক, সঙ্গে প্রতিদিন কাকলী সেনগুপ্তের গান। প্যারিসের বাঙালিদের এই পুজোয় শুধু বাঙালি নয়, অনেক বিদেশিও আসেন। ফরাসিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। সকলেই শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে একইসঙ্গে আমাদের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি আস্বাদ করেন। এই ভারতোৎসবে যেন সারা বিশ্বেরই অবারিত দ্বার। যে কেউ এখানে প্রসাদ পাবেন, যে কোনও অঙ্কের চাঁদা দিতে পারেন, চাঁদা নিয়েই রসিদ কেটে দিচ্ছেন সৌম্যদর্শন গবেষক শিবজ্যোতি গুহ। বাঙালি শিল্পী ও সফল ডিজাইন-ব্যবসায়ী সস্মিত সেনগুপ্ত দিলেন পাঁচ হাজার ফ্রাঁ। চোদ্দ বছর পর প্রবাসে পুজোর আড্ডায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ হল। গল্প হল বাঘাযতীনের নাতি পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সেই যে এক ফরাসি মেয়ে গাছ নামে ফিল্ম করেছিলেন, তাঁকে দেখলাম যজ্ঞের নিয়মকানুন আচার-অনুষ্ঠান দেখে দেখে ডায়েরিতে নোট করছেন। ছোট্ট একটি ফরাসি মেয়ে গাঁথছে মালা। মেজোঁ দ্য ল্যাঁদ-এর ডিরেক্টর বিকাশ সান্যাল ও তাঁর লেখিকা স্ত্রী প্রীতি বহু বিশিষ্ট জনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন, সব নাম এখন আর মনে নেই। কিন্তু খুব বেশি মনে আছে ১৮-২০ বছরে একটি ছেলেকে, তার নাম আলেকজান্ডার রাম চ্যাটার্জি। বাবা বারীন চ্যাটার্জি, তাঁর বাড়ি প্যারিসে, শ্বশুরবাড়ি স্লোভেনিয়ায়। ছেলেটি মায়ের রং ও চেহারা পেয়েছে, এদিকে পৈতেও হয়েছে, পরিচয় করানো মাত্র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার জন্য তার সে কী ঝুলোঝুলি। প্রায় কুস্তি করে তাকে ঠেকাতে হল। সে ইংরিজি অনুবাদে আমার শাদা ঘোড়ার গল্প পড়ে নাকি মুগ্ধ, সামনের গ্রীষ্মে আমাকে তার মায়ের দেশে নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরাবে।

খুব বেশি মনে আছে ১৮-২০ বছরে একটি ছেলেকে, তার নাম আলেকজান্ডার রাম চ্যাটার্জি। বাবা বারীন চ্যাটার্জি, তাঁর বাড়ি প্যারিসে, শ্বশুরবাড়ি স্লোভেনিয়ায়। ছেলেটি মায়ের রং ও চেহারা পেয়েছে, এদিকে পৈতেও হয়েছে, পরিচয় করানো মাত্র পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার জন্য তার সে কী ঝুলোঝুলি।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' ডিসেম্বর ২০০০

পৃথিবীর পাঠশালায়

কত দেশ আমাদের দেখা হয়নি, কত জাতি-উপজাতি জানা হয়নি, কত কথা-উপকথা শোনা হয়নি— দেখা শোনা জানার এই প্রবল তৃষ্ণাই মানুষকে করে পথিক, করে পর্যটক। মানুষের জন্যই তো এই পরমাশ্চর্য পৃথিবীর পাঠশালা, এই অজানা জগতের আনন্দযজ্ঞ। যতই আমরা গৃহবদ্ধ হই, ভ্রমণ ছাড়া কি আমাদের মন ভরে?

আমার মন তো না-দেখা পৃথিবী দেখার তৃষ্ণায় সদা ব্যাকুল। তার ওপর স্লোভেনিয়ার নিমন্ত্রণে বেরিয়ে পড়তে পারলাম না, সে দুঃখ ভুলি কী করে! ভুলতে পারি না বন্ধুভরা বসুন্ধরার নিত্য নিমন্ত্রণ।

আমার তরুণ বন্ধু মার্টিন-সোনিয়ার চিঠি পাই— পর্তুগাল কবে যাব, তারাও সেইমতো পর্তুগাল যাবার সময় ঠিক করবে, সেখানে সোনিয়ার বাবার বাড়ি।

মধ্যযুগের গ্রামের গির্জায় মিউনিখের আন্দ্রে-রেজিনার বিয়েতে যেতে পারিনি, তারা বিয়ের ফটো পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভিয়েনার মালদোভিয়ান শিল্পী ওলগা বোলগারিও তার স্বামীর জন্মশহর মিউনিখের বিখ্যাত জোড়া গির্জায় সদ্য অনুষ্ঠিত তাদের বিয়ের ছবি আর কায়রোয় তার সঙ্গীত-অনুষ্ঠানের ভিডিও ক্যাসেট তার স্বামীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে লিখেছে, মেক্সিকোয় যাচ্ছি গান গাইতে, তোমার জন্য কী আনব জানিও।

কেরালায় খাড়ির ধারে গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ— জানুয়ারিতে বোটরেসের উৎসবে এলে তাদের বাড়িতে যেন অবশ্যই যাই।

আমার 'শাদা ঘোড়া' বইয়ের তামিল অনুবাদক শ্যামলা স্বামীনাথনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল গত বছর উত্তরপ্রদেশে ভ্রমণলেখকদের বিশ্ব সম্মেলনে, তিনি আমাকে তামিলনাড়ুর নিজস্ব রূপ ঘুরিয়ে দেখাবার নিমন্ত্রণের সঙ্গে প্রতিবারই লেখেন, আপনার বিশ্বভরা বন্ধুদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধুও একজন আছেন, তাকে ভুলে যাবেন না।

ওই বইয়ের ফরাসি অনুবাদক আলদিন দুব্রোই লেখেন, আপনার চোখ নিয়ে পৃথিবীটা দেখে বেড়াতে ইচ্ছে করে। ফ্রান্সের গ্রামে কিংবা অন্য কোনও দেশে আপনার সঙ্গে একবার বেড়াবার সুযোগ হবে কিনা জানি না।

শাদা ঘোড়া অনুবাদের পর তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

জর্জিয়ার বন্ধু মানানা দুমবাদজে জানতে চায়, আমার জর্জিয়ার ভ্রমণকাহিনী কত দূর এগিয়েছে? আমি গত মাসেই ই-মেল পাঠাই: খুব সম্ভব সিডনিতে বিশ্ব কবি সম্মেলনের আমন্ত্রণে রওনা হবার আগে লেখাটা শেষ করব।

সেদিনই মানানার ই-মেল: *তার মানে, তুমি তোমার স্বাভাবিক ছন্দে আছো। আমি আরও আনন্দিত তোমার লেখালেখির সৃষ্টিশীল জীবনের জন্যও কিছুটা সময় বের করতে পারছ জেনে।*

আমার জানতে ইচ্ছে হয়, সিডনির বিশ্ব কবি সম্মেলন সম্পর্কে জর্জিয়ান কবিরা কিছুই জানে না কেন। তুমি জানো, জর্জিয়া মহান কবিতার দেশ এবং একথা বাইরের পৃথিবীর কাছে সগৌরবে পরিচিত হবার দাবি রাখে। জর্জিয়ার একজন বন্ধু ও অনুরাগী হিসাবে আমাদের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে পড়বে এবং একজন ভালো রাষ্ট্রদূতের মতো তুমি জর্জিয়ায় তোমার দেখা মানুষজন আর এই দেশটার বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ায় দুয়েকটা কথা বলবে। ব্যাপারটা তাহলে খুব ভালো হয়, জর্জিয়ানরাও এর প্রশংসা করবে।

যত ঘুরছি, যত দেখছি, ততই মনে হয় সাধারণ মানুষ সর্বত্রই মানুষের বন্ধু। আজকের এই ধ্বংস ঘৃণা হত্যা হিংস্রতার যুগে কথাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০১

ছবি: লেখক

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি

সূত্র-সংযোজন: দময়ন্তী বসু সিং

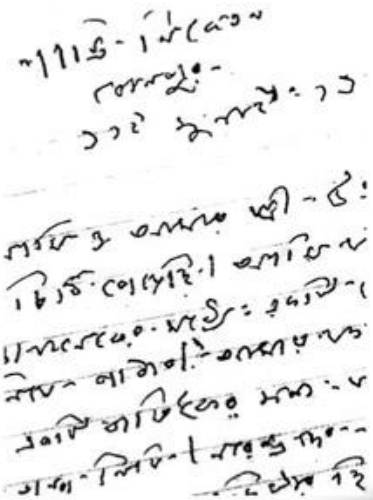

প্রমথ চৌধুরীর চিঠি /১

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
১১ জুলাই ১৯৪২

কল্যাণীয়েষু

আমি ও আমার স্ত্রী— উভয়েই তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি যদি পারি ত— হপ্তাখানেকের মধ্যে একটি ছোটগল্প লিখে পাঠাব।[১] আমার যতদূর মনে পড়ে একটি বার্ষিকের জন্য ফর্স্ট ক্লাস ভূতের গল্প লিখি। নরেন্দ্র দেব তখনও বার্ষিকের এডিটার ছিলেন। ও লেখার জন্য— আমাকে ৩০ টাকার কম দেয়নি। এখন যে পত্রের জন্য যা লিখি ত্রিশ টাকা পাই। এই আমার লেখার বাজার দর।

আমার স্ত্রীও একটি প্রবন্ধ পাঠাবেন[২] যা দক্ষিণা দেওয়া তোমরা ভালো মনে করো তাই তাঁকে পাঠিয়ে দিও। ইতি

শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী

সূত্র

[১] বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বার্ষিকী 'বৈশাখী'র জন্য গল্পটি পাঠিয়েছিলেন।

[২] প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী ইন্দিরা দেবীর প্রবন্ধও ওই একই বার্ষিকীর জন্য পাঠানোর কথা বলা হচ্ছে।

প্রমথ চৌধুরীর চিঠি /২

শান্তিনিকেতন
১৫/৮/৪২

কল্যাণীয়েষু

তোমার প্রবন্ধ আর টাকা পেয়েছি। প্রবন্ধটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে তোমার কাছে সেটির প্রুফ পাঠিয়ে দিতে বলব। তবে কাল কি করতে পারব তা আজ বলা যায় না। এক্ষণে শান্তিতে আছি, দুদিন পরে কি অবস্থা হবে, বলা অসম্ভব।[১] ইতি—

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

সূত্র

[১] এই সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। আর কতদিন আয়ু

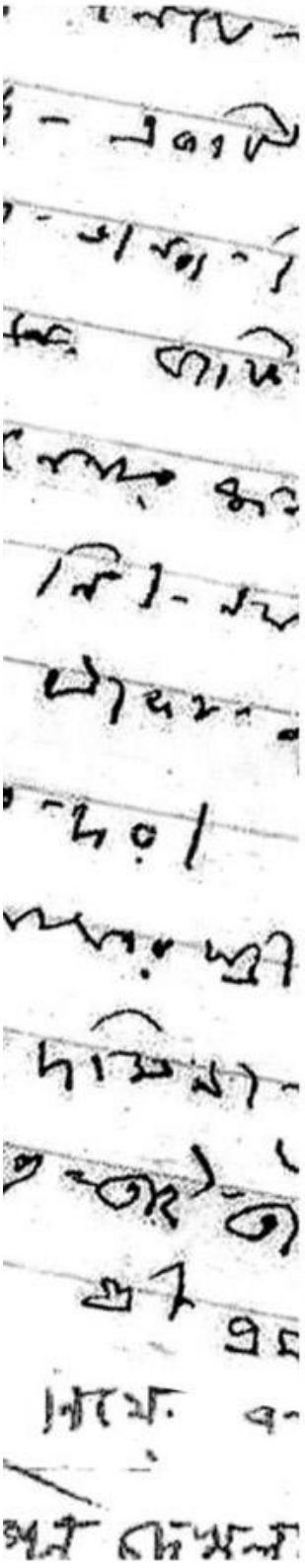

আছে এ ভয় তাঁকে আঁকড়ে থাকলেও, এরপরেও আরো প্রায় চার বছর বেঁচে ছিলেন এই ক্ষুরধার সাহিত্যিক। তাঁর পত্রিকার জন্য বাবার প্রবন্ধ চেয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গেই এই পত্র।

ইন্দিরা দেবীর চিঠি /১

ওঁ
লালবাঙ্গলা, ১নং পামপ্লেস
বালিগঞ্জ, ১১.১২.৪১

কল্যাণীয়েষু

কাল শুক্রবার বেলা ১০।১০।।-টার মধ্যে তুমি সস্ত্রীক দেখা করতে এলে সুখী হব। ঐ সময়েই আমার সুবিধে।

আজ প্রায় ৪ মাস হল তোমার একটি চিঠির উত্তর না দেওয়ার অসৌজন্য দোষে আমি দোষী হয়ে আছি। সেই ত্রুটি স্বীকার করায় অর্দ্ধেক এবং উত্তর দেওয়ায় বিলম্বের বাকি অর্দ্ধেক দোষ খণ্ডে যাবে আশা করি।

চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের নামে বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য একটি পুরস্কারের আবেদন সংক্রান্ত।[১] এবং আমাকে না জানিয়ে তাতে আমাকে স্বাক্ষরকারী করা হয়েছে বলে ক্ষমা চেয়েছ।

অবশ্য না জানিয়ে কারো নাম ব্যবহার করবার পক্ষপাতী আমি নই। তবে এতদিনে সে দোষও তামাদি হয়ে গেছে। আর দুঃখের বিষয় সে আবেদনে সম্ভবতঃ কর্তৃপক্ষ কেউ কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাতও করেন নি; তাই বিশেষ আসে যায় না। কবে যে এ বিষয়ে এক ঐক্য হয়ে কর্ত্তাব্যক্তিরা কোন সমীচীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, তা' বলা শক্ত।

সাক্ষাতে অন্যান্য আলোচনা হবে। ইতি

শ্রী ইন্দিরা দেবী

সূত্র

[১] রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পুরস্কার স্থাপনের প্রস্তাব বুদ্ধদেব বসু কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই করেন। সেই আবেদনে বিবিধ বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন তখন।

ইন্দিরা দেবীর চিঠি /২

কল্যাণীয়াসু

তোমার কথামত এই সঙ্গে ওঁর পুরাকালের গল্পানুবাদ পাঠাই। কাগজের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারবে কত পুরনো।

উনি বলছেন "পাইকা"তে ছাপালে আর একটু বড় হবে। তবে ছাপাবার সব ব্যবস্থা, মায় প্রুফ দেখা পর্য্যন্তও তোমাদেরই হাতে; যা'ভাল বুঝবে তাই কর'। পরে কিরকম কি হয় দেখি।

তোমরা এখন নাটক নিয়ে নিশ্চয় খুব ব্যস্ত।[১] আমাদেরও ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে;— এই নিয়ে কত আমোদ করা গেছে। কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, যদিও সকলকে চিনতে পারলুম না।

কলকাতায় থাকলে নিশ্চয় তোমাদের অভিনয় দেখতে যেতুম। কিন্তু এত শীঘ্র যাবার সম্ভাবনা নেই। গরম অসহ্য হলে তবেই পালাই। এখন সবে কলির পাক ধরেছে।

এখানে দোলে কিছু একটা উৎসব হয়। এবার কি হবে এখনো ঠিক হয়নি। বাল্মীকি প্রতিভার দল ত বম্বের অভিনয় সেরে শীঘ্রই ফিরবে।

আশির্ব্বাদ জেনো

শ্রী ইন্দিরা দেবী

সূত্র

[১] এই পত্রে কোনও তারিখ নেই। কিন্তু নাটকের উল্লেখ দেখে মনে হয় চিঠিটি ১৯৪২-৪৩-র কোনো সময়ে লেখা। ঐ সময়ে বুদ্ধদেব বসুর "মায়া মালঞ্চ" নাটকের মহড়া চলছিল।

কালিদাস নাগের চিঠি

২৫.১০.১৯৪৩
প্রিয় বরেষু,

আপনার চিঠি ও কার্ত্তিক সংখ্যা 'কবিতা' খানি পেয়ে খুব সুখী হয়েছি। যে মানুষটির সম্বন্ধে লিখতে বলেছেন তিনি শুধু লেখক রম্যা রলাঁ নন আমার কাছে; তা আপনাদের জানা কাছে। তাই সর্বদা ক্ষোভ ও সঙ্কোচ হয় যে তাঁকে ভাল করে চিনিয়ে দিতে পারিনি বাঙালীর কাছে, শুধু কিছু ২ অনুবাদ করেছি তাঁর বর্ণনা থেকে। আমার ব্যক্তিগত জীবনের কত বড় ক্ষতি হল তা শুধু আমিই জানি: ১৯৪১ এ রবীন্দ্রনাথ ও ১৯৪৩ এ রলাঁকে হারিয়ে বুঝেছি- আশা করবার বিশেষ কিছু রইল না। যাহোক, আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম; নভেম্বরের মধ্যে একটি ছোট প্রবন্ধ আপনার 'কবিতার' জন্য পাঠাব। পত্রিকার কয় পাতার মত লিখতে হবে একটু আভাষ দেবেন।[১]

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন আমার প্রীতি নমস্কার নেবেন ইতি

ভবদীয়
শ্রীকালিদাস নাগ

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু-
বন্ধুবরেষু-

সূত্র

[১] আজ কত বাঙালি রম্যা রলাঁ পড়েন বা তাঁর নাম পর্যন্ত জানেন আমার ধারণা নেই। তবে সেই সময়ের বিদগ্ধ সমাজে রম্যা রলাঁ বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সংযোগে ছিলেন। পরে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় গভীর হয়। কৌতূহলী পাঠক "বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত গদ্য: 'কবিতা' থেকে" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে লেখা রলাঁর চিঠি বু.ব:- কৃত অনুবাদে পড়তে পারেন। কালিদাস নাগের সঙ্গে রলাঁর বিশেষ সম্প্রীতি ছিল।

শিবরাম চক্রবর্তীর চিঠি

১৩৪ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট
কলকাতা-৭
৫ সেপ্টেম্বর ৪৯

ভাই বুদ্ধদেব,

'যখন তারা কথা বলবে' আমার সর্বপ্রথম, এবং বোধ করি সর্বশ্রেষ্ঠ লেখা। আমার আন্তরীক প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ওটা আমি তোমার নামেই উৎসর্গ করছি।[1] বইটার এই সপ্তাহেই বেরুবার কথা, বেরুলেই তোমার কাছে যাবে। তোমার বাড়ি গিয়ে নিজের হাতে তোমাকে দিতে পারলেই সুখী হতাম, কিন্তু কয়েক মাস থেকে শরীরটা বড়ই খারাপ যাচ্ছে। বাসার থেকে বড় আর বেরুইনা— দীর্ঘকাল তোমাদের ওদিকে যাওয়া হয়নি— কারো কাছেই যেতে পারিনি। সত্যি বলতে, পীড়িত হৃদয় নিয়ে ওষুধ বগলে করে কোথাও যাওয়ার উৎসাহ হয় না।

আশাকরি তোমরা সকলে ভালো আছো। প্রতিভা দেবীকে আমার নমস্কার। মিমি রুমিকে স্নেহাশীর্বাদ। তুমি আমার ভালোবাসা জেনো। ইতি

তোমাদের
শিবরাম

সূত্র

[1] বুদ্ধদেব বসু ও শিবরাম চক্রবর্তী দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর প্রথম বই বাবাকে উৎসর্গ করেছিলেন তা-ই শুধু নয়, পরবর্তী সময়ে তাঁর একটি 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলন-ও আমাকে ও দিদিকে (পত্রে উল্লিখিত রুমি ও মিমি) উৎসর্গ করেন। উনি বলতেন যে সব বাড়িতে কিশোরীরা রয়েছে সে সব বাড়িতে যেতেই ওঁর ভালো লাগে। উদাহরণ স্বরূপ বুদ্ধদেবের বাড়ি আর গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর বাড়ির কথা বলতেন- যাঁর এক বোন ছিলেন কাবেরী বসু। একদিন তাঁকে আমাদের ২০২-এর বাড়ির পাশে এক ধোপার মস্ত কাপড়ের বস্তার ওপর বসে থাকতে দেখে বাবা আমার ভাই পাপ্পাকে পাঠিয়ে শিবরাম কাকাকে ডেকে পাঠান।
"ওপরে না এসে ওখানে বসে ছিলে কেন?" বাবার এই বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আসলে তোমার কাছে এলে টুনুর কাছেও যেতে হয়, কিন্তু টিনুর [illegible]

হুমায়ুন কবিরের চিঠি

৪ঠা নভেম্বর ১৯৬১
প্রিয়বরেষু,

আপনার ২রা নভেম্বরের চিঠি পেয়ে খুসী হলাম। চিঠি লিখেছেন বলে এবং তার চেয়েও বেশী যা লিখেছেন তার জন্য। বাঙলাদেশে শিক্ষিত এবং সুস্থমনা লোকের অভাব নাই, জানি। তা মনে না করলে বাঙলাদেশের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতনা। কিন্তু একথা বহুবার অনুভব করেছি ও বলেছি যে যখন কদর্য্যতার প্রকাশ পায়, তখন আমরা অনেকক্ষেত্রে দুঃখ অনুভব করেই ক্ষান্ত থাকি, প্রতিবাদ করতে চাই না।

মতামতের স্বাধীনতায় আমি চিরদিনই বিশ্বাসী। আপনার উপর যখন আক্রমণ হচ্ছিল, তখন বহু জায়গায় বলেছি যে আপনার মতকে না মেনেও আপনাকে শ্রদ্ধা করা যায়। মতান্তর যে প্রতিক্ষেত্রে মনান্তরে পরিণত হয় এটা দুঃখ ও আশঙ্কার কথা।

আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ— প্রধানত দেশে এবং আনন্দবাজারে— কয়েকমাস থেকেই হয়ে আসছে। আপনি রাজনীতির আসরে থাকেন না বলে সেটা হয়তো আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি যে আক্রমণ, রাজনৈতিক কারণেই, আরো তীব্র হয়ে উঠেছে।

আমার বিরুদ্ধে আক্রমণ— প্রধানত দেশে এবং আনন্দবাজারে— কয়েকমাস থেকেই হয়ে আসছে। আপনি রাজনীতির আসরে থাকেন না বলে সেটা হয়তো আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সম্প্রতি যে আক্রমণ, রাজনৈতিক কারণেই, আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। বাঙলাদেশের একটী গোষ্ঠির— আমার বিশ্বাস যে সংখ্যায় তারা নগণ্য— আজ প্রধান লক্ষ্য তা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে আমার যেন স্থান না থাকে। তাতে তাঁদের কি লাভ হবে, তারাই জানেন। সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার বিধান রায় আমাকে বলেছিলেন যে বাঙলাদেশে কি তোমার কোন বন্ধুই নাই? এবং সেই কথারই পুনরুক্তি আমি প্রফেসর পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তীর কাছে করি।

আশাকরি সত্বর কোন সূত্রে দেখা হবে— তখন আলাপ করবার সুযোগ মিলবে। ত্রিগুণা সেন, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, সুধীর বাবু, আতোয়ার এরা সব ব্যাপার জানেন। তাদের সঙ্গে যদি কথা হয় তবে আপনিও জানতে পারবেন।[1]
প্রীতিপূর্ণ নমস্কারান্তে
হুমায়ুন কবির

সূত্র

[1] কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী এবং 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার স্থাপক-সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘকালীন সখ্যে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু দুঃসময়ের বন্ধুরাই 'সত্য বন্ধু' বলে যেহেতু আমরা জানি ও

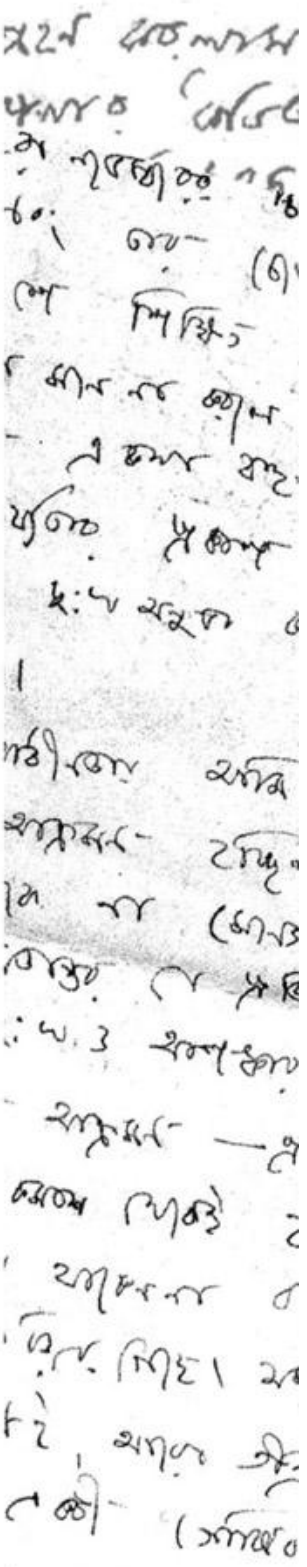

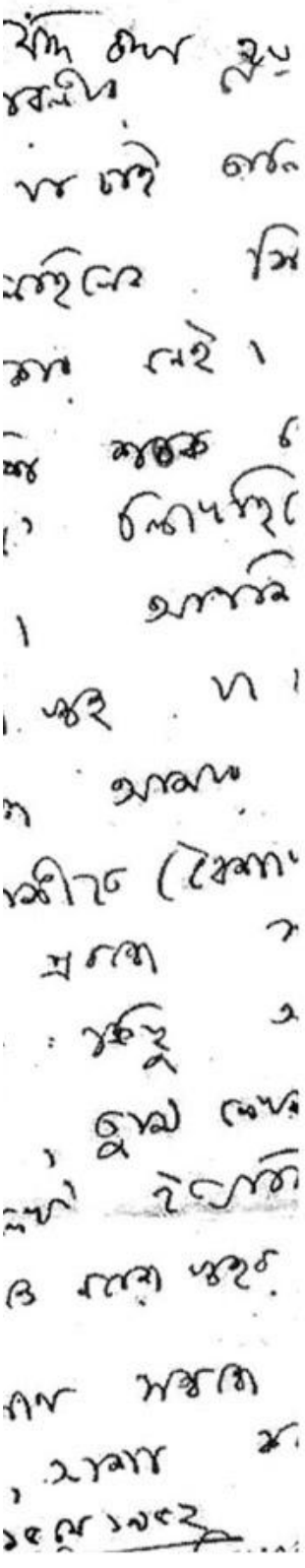

মানি, আমি মনে করি হুমায়ুন কবিরের মতো নিঃস্বার্থ বন্ধুতা অন্য কেউ দেননি বাবাকে। বাঙালির ঈর্ষাকাতরতা ও কৃতঘ্নতার অন্যায় আঘাতে জর্জরিত হতে হয়েছিল এই দুই স্বধর্মে নিয়োজিত সৎ পুরুষকে। এই চিঠি পড়লে বোঝা যায় এ ধরণের ক্ষুদ্রতায় বড় বড় খবরের কাগজও কেমনভাবে জড়িয়ে পড়তো। পরবর্তী সময়ে 'যুগান্তর' কাগজ বুদ্ধদেব বসু-পেষণে সর্বশক্তি ক্ষয় করেছিল।

লীলা মজুমদারের চিঠি

৫৪/১ হাজরা রোড
কলিকাতা
২২ শে এপ্রিল

প্রীতিভাজণেষু

বুদ্ধদেব বাবু— আপনার বৈশাখীর জন্য আমার অভিনন্দন জানবেন। বাঙালী সাহিত্যজগতের বিরুদ্ধে আমার একটা পুরোন নালিশ বহুদিন থেকে মনের মধ্যে জমছিলো, সে তার রুচিহীনতা। আপনার বইখানা দেখে সে মেঘের মতন কেটে গেলো। আপনার রেডিও সম্বন্ধে প্রবন্ধটি অপূর্ব্ব হয়েছে, ঐ— শাড়ীপড়া ভ্রাতৃকুল কৈশোর থেকে আমাকে জ্বালিয়েছে, কী যে আনন্দ পেলাম তাদের সম্বন্ধে একটু ন্যায়কথা শুনে! অন্যান্য প্রবন্ধও ভালো হয়েছে; দেবীপ্রসাদ বাবুকে[১] বলবেন তারিফ করবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু দীলিপের [২] নামটা একবার করা উচিত ছিলো; হিমাংশুবাবুও[৩] স্বরলিপির কথা ব'লে আক্ষেপ করছেন দেখলাম। জ্যোতির্ময় রায়ের চিত্রকলার সমালোচনাও ভালো হয়েছে, যদিও (আপনার কাণে কাণে বলি,) আমার ব্যক্তিগত মতের সঙ্গে মিলছে না। তবে ছবির সম্বন্ধে বোধ করি কোন কথাই ধরাবাঁধা হয় না ব্যক্তিগত অভিরুচির এত বেশী প্রভাব বলে। সব ক'টি গল্পই ভালো হয়েছে। কবিতার সম্বন্ধে আর কি বলব? আপনাদের সমালোচকরা তো [অনেক] কিছুই বলেছেন, তবে অনুরোধ করি যে কোন উপায়ে পারেন গদ্য ছন্দর জন্য আমার জন্মগত distasteটা কোন রকমে দূর করে দিন [তো]। জানেন, রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' খুলে সূচীপত্রের ১০ লাইনকে কবিতা মনে করে পড়ছিলাম। পরে পাশে পাশে ১, ২ সংখ্যা দেখে তাকিয়ে দেখি-কিনা সূচীপত্র! লজ্জায় মরে গেলুম! আমার appreciation টার চোখ ফুটিয়ে দিন তো। তাই বলে যেন রেফরিজারেটারের দই কি মাছটাছ পড়তে বলবেন না।

মোট কথা বৈশাখী পড়ে ভালো লাগল।

আমার একটা কাজ করে দেবেন কি? আমার সখ হয়েছে আমার বাড়িতে একটা সাহিত্যিকদের জলসা করবার, চারু দত্ত মহাশয়কে সভাপতি ক'রে। আধুনিকদের মধ্যে যারা intersted হবেন এমন একটি নামঠিকানার তালিকা তৈরি করে দিতে পারবেন? আপনি কাজের মানুষ, বেশী বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না।

আপনারা আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি।

লীলা মজুমদার

পুঃ

কামাক্ষীবাবুর[৪] বাড়ি যেতে পারিনি। সেই রবিবার আমার স্বামী আরেকটা ব্যবস্থা
করেছিলেন। আগে যেমন কথা ছিলো, শনিবার হলে অবশ্য যেতাম।

রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' খুলে সূচীপত্রের ১০ লাইনকে কবিতা মনে করে পড়ছিলাম। পরে পাশে পাশে ১, ২ সংখ্যা দেখে তাকিয়ে দেখি-কিনা সূচীপত্র! লজ্জায় মরে গেলুম! আমার appreciation টার চোখ ফুটিয়ে দিন তো।

সূত্র

লীলা মজুমদার ও বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলেন। চিঠির সুরে সেই বন্ধুতার পরিচয় আছে।

[১]দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বামপন্থী চিন্তক ও দার্শনিক- সেই সময়ে বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর কর্মকাণ্ডের
সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

[২]দিলীপ রায়ের (পাণ্ডেচেরি) কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩]গায়ক-সুরকার হিমাংশু দত্ত। আমাদের ২০২ রাসবিহারী এ্যাভিনিউর বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই থাকতেন।

[৪]দেবীপ্রসাদের ছোট ভাই কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এই দুইভ্রাতাকেই বাবা অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পরবর্তী সময়ে দেবীকাকা দূরে সরে গেলেও কামাক্ষীকাকা কখনো আমাদের পরিবার থেকে দূরে সরে যাননি।

পুলিনবিহারী সেনের চিঠি

সবিনয় নিবেদন,[১]

আপনার অনেকগুলি চিঠির জবাব দিচ্ছি— দেবার চেষ্টা করছি বললে ভাল হয়।

১। ১৯/৩/৫২

অবনীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর যে-যে বই আপনার কাছে আছে তা বাদে যা চাই তালিকা দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে— সেটি হারিয়েছে। পরে বলেছিলেন সিগনেট থেকে বই পেয়েছেন আর দরকার নেই। বাগীশ্বরী বক্তৃতাবলী আপনাকে দিয়েছিলাম কি?

'উনিশ শতক শেষ হবার আগে একটি গ্রন্থাবলী বেরিয়েছিল' লিখেছিলেন। আমি তো এর কথা জানি না। আপনি কোনো সন্ধান পেয়েছিলেন কি?

নরেশ গুহ যা লিখেছিলেন তা অত্যুক্তি। এবিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।

প্রবাসীতে (বৈশাখ ১৩৪৮) 'আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা' প্রবন্ধে সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে সাহায্য কিছু আছে। "একদিন আমায় উনি (রবিকাকা) বললেন, তুমি দেখছ না, যেমন করে তুমি খুলে গল্প কর তেমনি করেই লেখা ইত্যাদি।

(ওতে নরেশ গুহর কথা সমর্থিত হয় না)

অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধটি আপনি বিশ্বভারতী পত্রিকাকেই দেবেন, আশা করব।

২। ১০ এপ্রিল ১৯৫২/১৫ মে ১৯৫২ প্রমথ চৌধুরীর তিনখানি বই আপনার আছে, দুখানি আমি পাঠিয়েছিলাম। অন্যসবগুলিই চাই তো? -পরে কেবল সনেট-পঞ্চাশৎ চেয়েছিলেন। নানা কথা নানা চর্চাও চাই বলেছিলেন।

(প্রবন্ধসংগ্রহে ৫০টি প্রবন্ধ থাকবে, এবং তারও অর্ধাংশ এখন বেরচ্ছে)

৩। ২২/৬/৫২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটির সন্ধান ও বই পেয়েছেন তাহলে আমার বইগুলি কি এখন পেতে পারি?

৪। ২৮/৭/৫২

অনুমতিপত্রের নকল পেয়েছেন আশাকরি।

৫। ১/৭/৫২

পথে-বিপথে 'খুব আগেকার লেখা' নয় কিন্তু।

অবনীন্দ্রর বহু লেখা অপ্রকাশিত আছে তাতে সাধু চলতি দুইই আছে: একই সঙ্গে। - ১৩৫৫ এর একটি গল্প পাঠিয়েছিলাম।

৬। ২৮ জুলাই ১৯৫২

অবনীন্দ্রনাথ। জন্ম, বিশ্বভারতী কোয়াটার্লিকে মুকুল দেব প্রবন্ধানুযায়ী- ৭ অগস্ট ১৮৭১। ঐদিন বোধহয় জন্মাষ্টমী ছিল। সেই থেকে তিথি অনুযায়ী তাঁর জন্মদিন পালন চলে এসেছে।

মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১।

প্রমথ চৌধুরী জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৬৮
মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

এই তারিখ বিশ্বভারতী পত্রিকায় বেরিয়েছিল আশা করি ঠিকই আছে।

বিদায়ে অনেক কথার জবাব দেওয়া হল না।

পুলিন

সূত্র

[১] লাজুক মানুষ পুলিনবিহারী সেন বিষয়ে বুদ্ধদেব বসু যা লিখে গেছেন তাঁর "আমাদের কবিতাভবন" গ্রন্থে এখানে সেটাই উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি।

"পুলিন সেন (থাকেন) আমার হাঁটা রাস্তায় পাঁচ মিনিট দূরে। কিন্তু দেখাশোনার সম্পর্ক নয় তাঁর সঙ্গে আমার; হঠাৎ কখনো রাস্তায় দেখা হলেও জীবনানন্দের ধরণেই এড়িয়ে যান তিনি; আমাদের বিনিময় চলে চিঠিতে এবং প্রায় শুধুই চিঠিতে। ...তাঁর পত্ররচনার শৈলীতে আমি একটি কমনিবিষ্ট রঞ্জনরিক্ত জীবনের আভাস পাই। 'সবিনয় নিবেদন'-এ আরম্ভ, তারপর এক-দুই-তিন নম্বরে চিহ্নিত কয়েকটি তথ্যজ্ঞাপক অনুচ্ছেদ, সেই তালিকা ফুরোলে চিঠিও শেষ- ভাবটা যাকে বলে পুরোপুরি 'সরকারি', শুধু মাঝে-মাঝে 'পুনশ্চ' যোগে ঈষৎ ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়।—
সঙ্গের চিঠিটা এই বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন পাঠক।

শান্তিদেব ঘোষের চিঠি

শান্তিনিকেতন
১৭/১/৪৬

শ্রদ্ধাভাজনেষু:-

আপনার মনে আমার বইটি যে আনন্দ দিতে পেরেছে তার জন্য আমি বিশেষ গৌরব বোধ করি।

অভিনয় বিষয়ের প্রস্তাবে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের মত, নিজে নাটক লিখেছেন, তার গানও রচনা করেছেন নিজে, অভিনয় শিখিয়েছেন নিজে প্রত্যেককে, এবং নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন, গান গেয়েছেন। তাছাড়া "চণ্ডালিকা"র মত গীতনাট্যও রচনা করেছেন,+ একাধারে এই সব গুণ আর কারু মধ্যে আছে বলে আমি জানতাম না। আপনি যাঁদের নাম করেছেন তাঁরা কি সকলেই একাধারে এতগুলি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? হয়তো আমার লেখার ভিতর কোন অস্পষ্টতা আছে যার জন্যে আমার উপরের বক্তব্যটি সেখানে পরিষ্কার হয়নি। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরো পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো। আপনার প্রস্তাবটি আমার উপকারে লাগলো।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের ধারা নিয়ে আপনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা খুবই সত্য। তবুও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শের সঙ্গে হয়তো তার কোথাও বাঁধে। শান্তিনিকেতনের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু বিষয়টি আমার আয়ত্বের বাইরে। এ সব ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষই সব চালনা করেন তাঁদের বিচার অনুসারে, আমরা চলি মাত্র।

পরে যখনই কলকাতায় যাবো, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে এবং আপনাদের কাছে গান গেয়ে যদি আপনাদের আনন্দ দিতে পারি সে আমারও আনন্দ। নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি

বিনীত
শান্তিদেব ঘোষ[১]

সূত্র

[১] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যোগাযোগ হবার পরে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন উচ্চমার্গের ব্যক্তিরা মা-বাবার বন্ধু হয়ে ওঠেন। মা গানের জগতেরও মানুষ ছিলেন বলে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিলো তাঁর।

(আগামী সংখ্যায় আরও চিঠি)

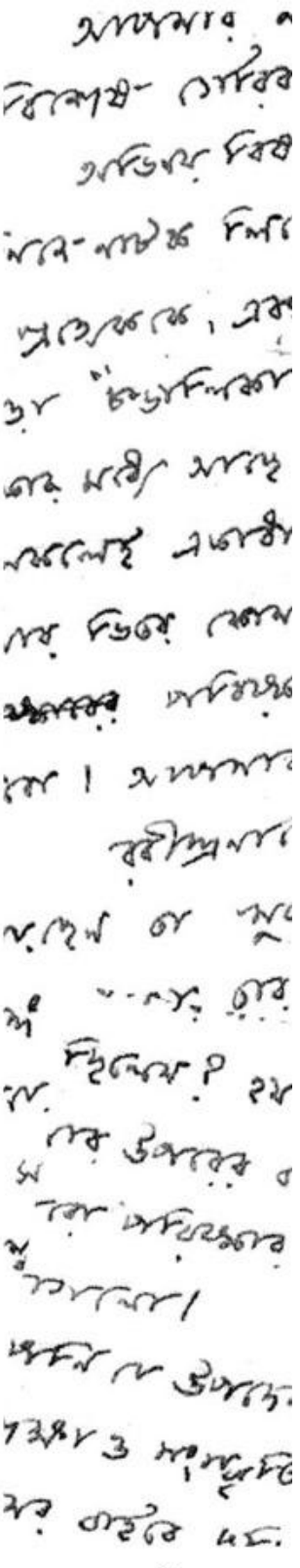

১০

“ক্যালকাটা পেইন্টার্সের সঙ্গে গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়েছিলাম। প্রতিদিনের স্বপ্নে, উচ্চাশায়, উগ্রতায়, ক্যালকাটা পেইন্টার্স ছিল আমার। যখন আমার কিছুই ছিল না, সামান্য সঞ্চিত টাকাও তুলে নিয়ে দলের প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতাম। খুবই অনটনের সময় অনেক প্রবীণ সদস্য তাঁদের ধার্য টাকা হয়তো-বা দুশো, কী দুশো পঞ্চাশ, সেটুকুও দিতেন না। এমনকি যেদিন ছবি প্যাক হবে, সেদিন হাতে হাত লাগিয়ে এতজন সদস্যের ছবি সঙ্গে নিয়ে যাব, সেদিনও তাঁরা কথা দিয়ে আসতেন না। কিছু সদস্য যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। যেমন বিমল দাশগুপ্ত আর অন্যান্য দিল্লির সদস্যরা, যোগেন চৌধুরি মাদ্রাজে কিংবা দিল্লি। মূল দায়িত্বে ছিলেন রবীন মণ্ডল, প্রধান সহযোগী আমি। হয় রবীনদার হাওড়ার বেলিলিয়াস লেনের বাড়ি, নতুবা আমাদের বাড়ির সামনে দু-নম্বর কলেজ রো-র উঠোনে।”

ক্যালকাটা পেইন্টার্সের সূত্র ধরেই মুম্বই, দিল্লি প্রতি বছর পাড়ি দিই। ভারতবর্ষের শিল্পকলাজগতে এভাবে ধীরে ধীরে পরিচিত হতে থাকি। ইতিমধ্যে ছাপাই ছবি করার ইচ্ছে চাপল। প্রতিদ্বন্দ্বী দল সোসাইটি অব কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস। তাঁর সব সদস্য-শিল্পীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-সম্পর্ক থাকলেও দুটি দল যে ছিল একেবারেই আলাদা। একদল কুলীন আর অন্যদল নমঃশূদ্র। এমন একটা মত-ই ঘোরাফেরা করত শিল্পীরসিক আর বন্ধুস্বজন মহলে। সোসাইটির স্টুডিও ধর্মতলায়। প্রস্তাব দিই, ছাপাই ছবি করতে চাই, সেজন্য যদি তাঁরা স্টুডিওর মেশিনটি ব্যবহারের অনুমতি দেন, সেইমতো ঠিক হয়, ভোরবেলা চলে যাব ধর্মতলা স্টুডিওতে। ভোর পৌনে পাঁচটার ট্রাম ধরে ধর্মতলার নির্দিষ্ট স্টপেজে নামতাম। রাস্তা দিয়ে ঢুকে গিয়েছে একটা গলির মতো বাড়ির প্যাসেজ। নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে ছাদ। সামনে একটি চায়ের স্টল আর তার ঠিক উল্টোদিকে কোণায় নয় বাই চোদ্দো একটি ফালি। ধারে পড়ে আছে কয়েকটি ভাস্কর্যের টুকরো। সেটাই একমাত্র চিহ্ন প্রমাণ করে যে, এ বন্ধ ঘরটি চাঁদনির কোনও দোকান নয়। একটু অন্য কাজের, একটু অন্য বিষয়ের।

চাবিটি গচ্ছিত থাকত চা-ওয়ালার কাছে। সেখান থেকে চাবি নিয়ে ঘর খুলতাম। তারপর জিঙ্কপ্লেটে মোম মাখানো, এচিং করা, অ্যাসিডে ফেলা। তারপর যথাযথভাবে রং ঢুকিয়ে প্লেট পরিষ্কার করে ভেজানো কাগজে সঠিক চিহ্ন রেখে মেশিনে রোলারের ঘোরানো চাপে তলার রং উঠে আসত ভেজা কাগজের গায়ে। এটাকে বলা হয় ইন্টাগ্লিয়ো প্রথা। সোসাইটির এই ঘরটি সম্ভবত ভাস্কর অজিত চক্রবর্তীর ভাড়া নেওয়া ঘর।

তিনি সোসাইটির অন্যতম সদস্যও ছিলেন। তারপর অরুণ বোস প্রমুখ শিল্পীর হাতবদল হয়ে এটাই হয়ে ওঠে সোসাইটির স্টুডিও, কার্যালয় আর কলকাতার অন্যতম আড্ডাস্থল। ক্রমশ এই ঘরটি শিল্পী, কবি সাহিত্যিকদের প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। ক্যালকাটা পেইন্টার্স সেদিক থেকে বিষয়ী হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের একজনের পরিশ্রমে আর উদ্যমে আয়োজিত হতে থাকত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। অনেকক্ষেত্রে দুটি দলের পারস্পরিক রেষারেষিও কাজে লেগেছিল।

চালতাবাগান কিংবা কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের কালোয়ার পট্টির পুরনো লোহার কারবারিদের থেকে খুঁজে খুঁজে সংগ্রহ করে নিতাম ব্যবহৃত পুরনো ব্লকের জিঙ্কপ্লেট। ওজনদরে কিনে সেই প্লেটের পিছনদিক ঘষামাজা করে তার ওপর এচিং করে ছাপাই ছবির জন্য প্রস্তুত করতাম। বাজারে নতুন প্লেটের দাম তখন আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরকম করে একের পর এক প্লেট করেছি সোসাইটির ওই ঘরে। বেশ মজা পেয়েছি। তবে একলা কোনও সাহায্য ছাড়া একটা ছাপাই ছবি প্রস্তুত করা সহজ কাজ ছিল না। তারপরে সতর্ক থাকতে হত প্রতিটি যন্ত্রপাতি, ছাপাই মেশিন, রং লেপনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি, টেবিল কাচ ইত্যাদির ব্যাপার। সবকিছু পরিষ্কার করে রেখে দিয়ে আসতাম। এদিকে ছাপাই কালি, কেরোসিন তেল, অ্যাসিড এসবই ছিল বড়ই চিটচিটে, ঝামেলার ব্যাপার, এই পদ্ধতি থেকেই ঝকঝকে একাধিক ছবি একই প্লেট থেকেই সমান আলোছায়ায় গজিয়ে তোলা এক জটিল সতর্ক শৃঙ্খলার কাজ ছিল।

একদিন জানতে পারলাম, সোসাইটি নতুন একটা ঘরের সন্ধান পেয়েছে। ধর্মতলার এলআইসি বিল্ডিংয়ে। আমেরিকান লাইব্রেরির ওপরে। সেখানে তাঁরা গ্রাফিক্সচর্চার একটি আলাদা স্টুডিও করতে চান। আমরা ওখানে কাজ শুরু করে দিলাম। করুণা সাহা যোগ দিলেন আমার সঙ্গে। তখন আমি আর একা নই। অনেকেই চলে আসতে লাগল। আমার সুবিধে হল। অভিজ্ঞ কুশলীর কাছ থেকে বিভিন্ন মুনশিয়ানা রপ্ত করা। এভাবেই একদিন অমিতাভ ব্যানার্জি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কত সহজে রোলারে সঠিক রং করা যায়। একটা রঙের ওপর আরেকটা রং কীভাবে চাপালে রঙের স্বচ্ছতাকে কাজে লাগানো যায়। আমি পুলকিত হই, ঋদ্ধ হই, মজা পাই, ডুবে যাই। অসময়ের দিনগুলি চিহ্নিত হয় জীবনের সময়ের জন্য।

ডেকে নিয়ে আসতাম পোদ্দার কোর্টের পিছনের গলি থেকে আলি বা আবদুলকে।
তাঁরা মূলত যন্ত্রপাতি প্যাক করতেন। আমাদের পাল্লায় পড়ে ছবি প্যাকিংয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। স্কোয়্যার ফুটে চার আনা কমাবার জন্য যে পরিমাণ অনুরোধ ভিক্ষা করেছি সেই অনুরোধে ফাঁসির আসামি বিচার-করুণা পেতে পারত। কিন্তু ওঁরা ভালো লোক ছিলেন। কথার দাম রাখতেন। আমাদের চেয়েও ছবিকে ভালোবেসেছিলেন। তাই প্যাকিংয়ে যত্নের ত্রুটি ছিল না।

এক উন্মাদনা অনুভব করি। মাখামাখি হয় সোসাইটির দাদাদের সঙ্গে। গোড়া থেকেই এঁরা আমাকে ভালোবাসলেও কোথাও যেন একটু আড়াল করতেন। গোড়ায় মনোকষ্ট হত। ভাবতাম, এ হয়তো আমার অযোগ্যতার কারণ। নাকি এমন কোনও ফাঁক, যে ফাঁক আমি ভরাতে পারি না! এই সময়টা আমি খুব ব্যস্ত যুবক। একদিকে অলংকরণ করছি চুটিয়ে, অন্যদিকে বিভিন্ন এগজিবিশনে অংশগ্রহণের জন্য ছবি এঁকে চলেছি। ললিতকলায় প্রতিবছর ছবি দেওয়া, সর্বভারতীয় প্রদর্শনীগুলোয় ডাক পাওয়ার প্রত্যাশা আর নিয়মিত বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতিতে আমার কোনও ফুরসত ছিল না। এর মধ্যেও নানাবিধ কাজ জুটিয়ে নিতাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সভাসমিতিতে বিতর্কে যোগ দেওয়া ছিল আমার নিত্যদিনের কাজ। কলকাতার একজন বিতর্কিত যুবক হিসেবে কোনও-কোনও সমালোচক চিহ্নিত করতেন। ভেতরে-ভেতরে পুলক জাগত। যে আমি কখনও খেলাধুলো করিনি, মারামারি করিনি, কটু শব্দ ব্যবহার করিনি, বেতাল হওয়ার কোনও মাধ্যমে নেই, সেই আমার বিষয়ে দাপুটে বিতর্কিত এই বিশেষণ যুক্ত করে কেন? হ্যাঁ, আমি অন্যায় মনে করলে স্পষ্ট কথা বলি। কারও অনুপস্থিতিতে মন্তব্য করার চেয়ে সামনাসামনি করে ফেলি। এটাই বোধহয় সভ্যতার সংকট।

একদিন সত্যি একটু গোল বাঁধল। সোসাইটির সঙ্গে এত যাতায়াত ক্যালকাটা পেইন্টার্সের দাদারা খুব ভালো চোখে দেখেননি। অথচ তাঁরা যে যাঁর নিজস্ব সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। পরিণত রবীন মণ্ডলেরা, পরিণত বিজন চৌধুরিরা এব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। ওপরে লড়াই দেখালেও ভেতরে-ভেতরে সমঝোতার আদানপ্রদান ছিল। আমরা এক্ষেত্রে নেহাতই বালকমাত্র। ক্যালকাটা পেইন্টার্সের সঙ্গে গভীরভাবে নিজেকে জড়িয়েছিলাম। প্রতিদিনের স্বপ্নে, উচ্চাশায়, উগ্রতায়, ক্যালকাটা পেইন্টার্স ছিল আমার। যখন আমার কিছুই ছিল না, সামান্য সঞ্চিত টাকাও তুলে নিয়ে দলের প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্বিধায় দিয়ে দিতাম। খুবই অনটনের সময় অনেক প্রবীণ সদস্য তাঁদের ধার্য টাকা হয়তো-বা দুশো, কী দুশো পঞ্চাশ, সেটুকুও দিতেন না। এমনকি যেদিন ছবি প্যাক হবে, সেদিন হাতে হাত লাগিয়ে এতজন সদস্যের ছবি সঙ্গে নিয়ে যাব, সেদিনও তাঁরা কথা দিয়ে আসতেন না। কিছু সদস্য যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁদের কথা আলাদা। যেমন বিমল দাশগুপ্ত আর অন্যান্য দিল্লির সদস্যরা, যোগেন চৌধুরি মাদ্রাজে কিংবা দিল্লি। মূল দায়িত্বে ছিলেন রবীন মণ্ডল, প্রধান সহযোগী আমি। হয় রবীনদার হাওড়ার বেলিলিয়াস লেনের বাড়ি, নতুবা আমাদের বাড়ির সামনে দু-নম্বর কলেজ রো-র উঠোনে। সেখানে ডেকে নিয়ে আসতাম পোদ্দার কোর্টের পিছনের গলি থেকে আলি বা আবদুলকে।

তাঁরা মূলত যন্ত্রপাতি প্যাক করতেন। আমাদের পাল্লায় পড়ে ছবি প্যাকিংয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। স্কোয়্যার ফুটে চার আনা কমাবার জন্য যে পরিমাণ অনুরোধ ভিক্ষা করেছি সেই অনুরোধে ফাঁসির আসামি বিচার-করুণা পেতে পারত। কিন্তু ওঁরা ভালো লোক ছিলেন। কথার দাম রাখতেন। আমাদের চেয়েও ছবিকে ভালোবেসেছিলেন। তাই প্যাকিংয়ে যত্নের ত্রুটি ছিল না।

বছরের পর বছর মূলত মুম্বই-দিল্লিতে

সেসময় অলংকার করছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জলরং দিয়ে খেয়ালখুশি মতো। কখনও শিবরাম, কখনও শরদিন্দু, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে বিমল কর তাঁদের গল্প রং ছেড়ে, জল ঢেলে, পাতা ভরে, কখনও ঘনাদাকে কখনও ব্যোমকেশকে আঁকছি। এরকম কত বিচিত্র কাহিনিকে যে এঁকেছি তার ইয়ত্তা নেই। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বিমল করের ধারাবাহিক উপন্যাস ছোটদের জন্য 'কাপালিকরা এখনও আছে'।

ললিতকলা আর জাহাঙ্গির গ্যালারি আমাদের অস্থায়ী মক্কা হয়ে গিয়েছিল। ললিতকলায় প্রদর্শনী হলেও কয়েকবার থেকেছি আইফ্যাক্সের ওপরে। চেয়ারম্যান রাঙ্কোয়া (যিনি প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এবং শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ) তাঁর ঘরে বাঙালি সচিব গুপ্ত মহাশয়ের বদান্যতায় রবীনদার সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। আমার তো তখন দিল্লিতে কোনও পরিচয় ছিল না। রবীনদা এইসব যোগাযোগ করতেন। একসময় গোটা দিল্লি বাঙালি-প্রাধান্যে ভরে গিয়েছিল। শিল্পকলা, সাহিত্যকলা, নাট্যমঞ্চ, সিনেমা, রাজনীতি সবেতেই ছিল বাঙালির অবদান। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন কালীবাড়ি। তেমনই দেবীপ্রসাদ থেকে প্রদোষ দাশগুপ্ত, উদয়শঙ্কর থেকে সুনীতিকুমার, শম্ভু মিত্র থেকে অন্যান্য বহু ব্যক্তিত্বই রাজধানীতে এ জাতির পরিচিতি রেখে গিয়েছেন। আমি তার কম্পন অনুভব করেছি।

আজ শীতল আমরা, গৌন জাতি। যাক সে কথা। এরপরের আশ্রয় দিল্লিতে ললিতকলার অতিথিশালা। একসময় মান্ডি হাউসের পাশে ভাওয়ালপুর হাউস ছিল। এসবই পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজের কাছে দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব একেকটি হর্ম্য, যেমন মান্ডিরাজ তেমনই ভাওয়ালপুর। স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারত সরকার এগুলি ভিন্নভাবে ব্যবহার শুরু করেছিল। ভাওয়ালপুর হাউসের ফাঁকা জমিতে ছিল আমেরিকান লাইব্রেরি। তখনও কস্তুরবা গান্ধি রোডে বিশাল আমেরিকান সেন্টার গড়ে ওঠেনি। সেই লাইব্রেরির পুরো কক্ষটাই ঘুরিয়ে ফেলা যেত। অর্থাৎ চলমান ছিল। ভিতরে প্রাসাদের বিশাল ঘরগুলোয় আমেরিকান কর্তাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। বিশাল ঘর, বিশাল শৌচালয় পুরোটাই ললিতকলা অ্যাকাডেমির অধীন। অন্যদিকে জাতীয় নাট্য অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত। সবটাই সংস্কৃতির বিশাল অঙ্গনে পরিণত। প্রথমে দু-চার-পাঁচ টাকার বিনিময়ে শিল্পীদের ছাড়পত্র নিয়ে রাত্রিবাস করা যেত। জায়গাটা বড় আপন হয়ে গিয়েছিল। এত সুবিধা, এত স্বচ্ছন্দ। ফলে আমাদের দিল্লির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছিল। কখনও প্রদর্শনীর জন্য, কখনও অন্য অছিলায় দিল্লি গেলে ওখানেই উঠতাম। ওখান থেকে পায়ে হেঁটে কনট মার্কেট। ঠিক উল্টোদিকে ভগবান দাস রোড ধরে আসফ আলি রোড, আর্ট কলেজ, সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে সামনাসামনি ত্রিবেণি কলা কেন্দ্র, বেঙ্গলি মার্কেট। বেঙ্গলি মার্কেটের পাশ দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা প্রশস্ত রাস্তা। পাশে খাবারের দোকান। হরিয়ানি ধাবা, সকাল-সন্ধে বিশাল উনুন। এক ভদ্রলোক অসংখ্য তন্দুর বানাতে ব্যস্ত। দিনের শেষে গা-শিরশির শীতে ত্রিবেণির রাস্তা ধরে, ছাতিম ফুলের তীব্র গন্ধ নিয়ে, বেঙ্গলি সুইটসের দোকান পেরিয়ে সেই হরিয়ানি রেস্তোরাঁতে বসতাম আমরা। চার-আনার দুটি কী তিনটি তন্দুর আর ছ-আনার ডাল ফ্রাই। ক্ষুধার্ত মনে, পেটে, অফুরান স্বাধীনতা নিয়ে খাদ্যকে যে কীভাবে ভোগ করেছি আজও তার সুদ খুঁজে পাই। পরবর্তীকালে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সেই ললিতকলা, সেই ত্রিবেণি, সেই হরিয়ানি রেস্তোরাঁতে একসঙ্গে কুড়িজন কী বাইশজন রাতের খাবার সেরেছি। বাকি জীবনটা যদি এভাবেই কেটে যায়! স্বর্গের অন্য স্বাদ তখন ছিল অজানা।

তখন সেন্ট পলস স্কুল চলছে একদিকে। অন্যদিকে প্রতিকৃতি আঁকবার ডাক। হ্যাঁ আরেকটা হল আনন্দবাজার গোষ্ঠী। ওঁরা ঠিক করেছেন আনন্দমেলা নামে ছোটদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। পূর্ণেন্দু পত্রী এ-ব্যাপারে সর্বেসর্বা। উনি একাধারে ডিজাইনার আর সম্পাদক। তাঁর ওপর কর্তৃপক্ষ খুব নির্ভরশীল। তখন সবে যোগ দিয়েছেন অশোককুমার সরকারের দুই আত্মজ। তবে আনন্দমেলা দেখাশোনার ব্যাপারে অরূপ সরকারের তদারকি সবচেয়ে বেশি, বেনিয়াটোলার মোড়ে পুরনো বিখ্যাত যে বাড়িটিতে একসময় কাননদেবী যাতায়াত করতেন, (কাননদেবীর স্বামী অশোক গুপ্তের বাড়ি) সেই বাড়ির দোতলায় আনন্দ পাবলিশার্সের অফিস। সেখানেই পূর্ণেন্দু পত্রী বসতেন। ডিজাইন হত। লেখক-লেখিকারা যাতায়াত করতেন। মাঝে-মাঝে এসে হাজির হতেন অরূপ সরকার নিজেই। ঠাট্টা, টিটকিরি সর্বোপরি খুব সহজ প্রাণবন্ত পরিবেশ। সেখানে আমি প্রায়ই যাই— গল্প বা প্রবন্ধের অলংকরণের কাজে। একটা সময় নিয়মিত যেতাম আনন্দবাজারের অফিসে। এবং আনন্দ পাবলিশার্সের কার্যালয়ে।

সেই পরিবেশটি খুব টানত। কত মজার টীকাটিপ্পনী হত। যেসব কাজ ওখানে বসে করা যায় সেগুলি সেরে ফেলতাম ওখানে। বাকিগুলো বাড়িতে এনে পরে জমা দিতাম। তারই সঙ্গে চলত অন্যান্য প্রকাশনার কাজ। তখন অফসেট এসে গিয়েছে। আর্টপুল ইলেকট্রনিক্স কলম অনুযায়ী কম্পোজ হয়ে চলে আসত অফিসে। সেগুলো রবার সলুউশনে সাদা সাইজ করা কাগজে সাঁটা হত। ইলাসট্রেশনের জায়গা ছেড়ে রাখা হত। কখনও-কখনও তার ওপরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অলংকরণ করা যেত। ছেলেবয়স থেকে বইপাড়ায় ছাপাই কারখানার আশপাশে ঘুরে বয়স্ক হয়েছি। ক্রমশ সে মুদ্রণের এই বিবর্তনে আমার বিস্ময় লাগত। আগে সাহস পেতাম না ছবিতে টোন দেওয়ার। কারণ ব্লক প্রিন্টিংয়ে টোনের জন্য যে স্ক্রিনের ব্যবহার করতে হত, তা অনেক সময় যথাযথ রূপ হয়ে ফুটত না। বিশেষ করে নিউজপ্রিন্টে। তাই অলংকরণ বেশিরভাগই সীমাবদ্ধ ছিল লাইনে কিংবা টোন-ছাড়া আকারে। তখনও কম্পিউটারের প্রচলন অন্তত আনন্দবাজারে হয়নি। বিডন স্ট্রিটে আমার বন্ধু সমীর আর মানব খুলেছিল ফটো প্রযুক্তিতে কম্পোজ করার সংস্থা। ওরাই প্রথম কলকাতায় এই মেশিন নিয়ে আসে। পড়তে গিয়েছিল বিলেতে। ছাপা প্রযুক্তি শিখতে। এদের একজন প্রখ্যাত ও কাগজ ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্তের বংশধর, আর অন্যজন কলকাতার অন্যতম পুস্তক প্রকাশক পরিবারের। একদিন ওরাও প্রাচীন হয়ে গেল। প্রযুক্তি এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ যেন তার জীবনদৌড়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। আর আমরা যারা বিশেষ করে একটু প্রাচীন, একটু ধরে রাখতে চাই সময়কে, তার তাল ও লয়কে, তাদের এই গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আবার আধুনিক হওয়ার

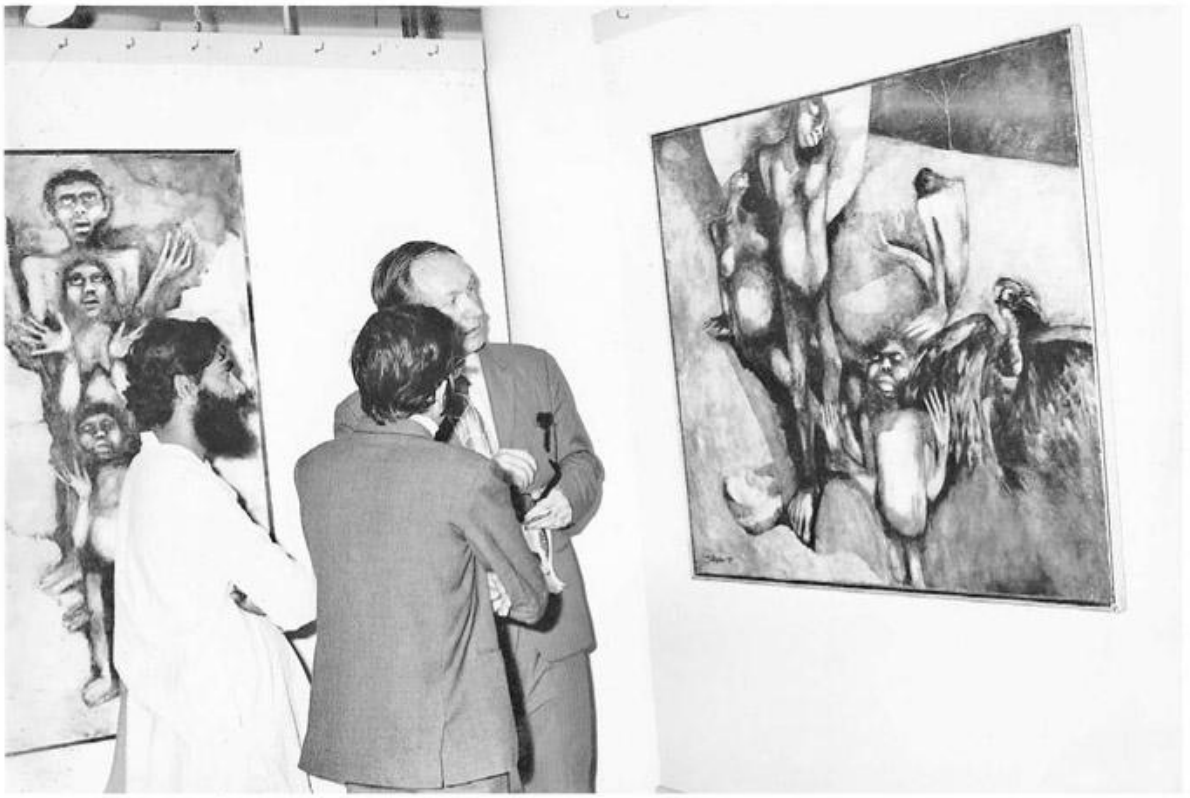

১৯৭১ সালে ক্যালকাটা পেইন্টার্স শো-এ ডেসমন ডোয়েগের সঙ্গে লেখক

এক চিরবাসনা আমাদেরও জীবন সময়কে ওইভাবে আর ভাবতে দেয় না। এখন মাঝে মাঝে কম্পিউটার নামক যন্ত্রটির সামনে বসে যখন যা চাই তা পেয়ে যাই তখন আমার বহু পরিশ্রম, বহু স্বেদ ঝরিয়ে যে আরব্ধ কারুকৌশল, অভিজ্ঞতা তা ম্লান হয়ে যায়, এই অনায়াসলব্ধ বাক্সটির ক্ষমতা দেখে।

সেসময় অলংকার করছি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জলরং দিয়ে খেয়ালখুশি মতো। কখনও শিবরাম, কখনও শরদিন্দু, প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে বিমল কর তাঁদের গল্প রং ছেড়ে, জল ঢেলে, পাতা ভরে, কখনও ঘনাদাকে কখনও ব্যোমকেশকে আঁকছি। এরকম কত বিচিত্র কাহিনিকে যে এঁকেছি তার ইয়ত্তা নেই। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বিমল করের ধারাবাহিক উপন্যাস ছোটদের জন্য 'কাপালিকরা এখনও আছে'। সেসময় সকলে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করত পরের সংখ্যার জন্য।

সেন্ট পলস স্কুলে সবাই আমাকে ভালোবাসতেন। আমি ও আমার বন্ধুগোষ্ঠী মেতে থাকতাম পাঠ্যক্রমের বাইরের নানাবিধ কর্মসূচিতে। কখনও কার্টুমকুটুমের প্রদর্শনী, বার্ষিক উৎসব, স্কুল ম্যাগাজিনের দায়দায়িত্বে। আর নাটকের জন্য অভিনয় শেখানো এসব নিয়ে মেতে থাকতাম। মনে আছে ছেলেদের দিয়ে ডাকঘর অভিনয়ের কথা, সেই অমল দইঅলার ডাক এখনও কানে বাজে। মনে হয় অমলের মতো আমরা সবাই সেই রাজার চিঠির প্রত্যাশী।

ইতিমধ্যে আবার ডাক পাই বিদেশ থেকে। ওই সময়টা অদ্ভুত টানাপোড়েনের মধ্যে আছি। প্রচুর ছবি আঁকতাম। উৎকণ্ঠায় থাকতাম, ঠিক পথে আছি কিনা। যৌবন উত্তপ্ত করত, অথচ মাতাল হওয়ার চরিত্র আমার মধ্যে ছিল না। কিছুটা স্বাভাবিক ভয়ে, কিছুটা বাবার শাসনে বা এমনিই সংযমী থেকেছি। তখন বিদেশে যোগাযোগ একমাত্র বিশেষ লাল-নীল ছাপের খামে ভরে চিঠি দেওয়া, আর আবার প্রত্যাশায় দিন গোনা। দুয়েকবার টেলিফোন করতাম। উঃ সেকি খরচ! ওভাবেই যোগাযোগ হত। আমন্ত্রণ পেতাম। কখনও টিকিট চলে আসত। কখনও সস্তায় টিকিট জোগাড় করে এরোফ্লোতে পাড়ি দিতাম।

বিদেশে গিয়ে খ্যাতনামা চিত্রশালায় প্রদর্শনী, তার প্রচার বহু মানুষের সাক্ষাৎ খাতির, যত্ন আর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি থাকত না। কখনও-কখনও মনে হত, আমি এসবের যোগ্য কিনা! স্কলারশিপ কিংবা সরকারি বদান্যতা কখনও আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। মনে হত কোনও বিশেষ কৌশল

স্কলারশিপ কিংবা সরকারি বদান্যতা কখনও আমার চিন্তার মধ্যে ছিল না। মনে হত কোনও বিশেষ কৌশল কিংবা ছবি আঁকার পাঠ নেওয়ার জন্য বিদেশ নয়। আমার বিদেশ শুধু দেখার। চেতন-অবচেতনের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে বোধকে সজাগ রেখে আত্মস্থ করা, পৃথিবীর ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে নিজের অভিপ্সার ঐশ্বর্য হরণ করা, আসলে এ একধরণের চৌর্যবৃত্তি।

১৯৭৪ সালে অহিভূষণ মালিক ও ভবেশ সান্যালের সঙ্গে লেখক

কিংবা ছবি আঁকার পাঠ নেওয়ার জন্য বিদেশ নয়। আমার বিদেশ শুধু দেখার। চেতন-অবচেতনের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে বোধকে সজাগ রেখে আত্মস্থ করা, পৃথিবীর ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে নিজের অভিজ্ঞার ঐশ্বর্য হরণ করা, আসলে এ একধরণের চৌর্যবৃত্তি। শ্রেষ্ঠ কুশলী তাঁরাই, যাঁরা শ্রেষ্ঠ হরণকারী।

কিন্তু সেই ধন হরণে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ঐশ্বর্য ভরে যায়, ছড়িয়ে যায়। তার ভিন্ন দ্যুতিতে। সেইভাবেই পথে-প্রবাসে ঘুরে বেড়িয়েছি। অনেক বিদেশি বন্ধুর সাহচর্য পেয়েছি, সে ভালোবাসা কল্পনার অতীত। তার ঋণ শোধ করার এক আর্তি আজও মনে-মনে পোষণ করি। হয়তো এটা অহংকারের, কিন্তু বহু ঋণে আমি ঋণগ্রস্ত আজও। বিদেশের উপার্জন, সফলতার জৌলুস নিয়ে দেশে ফিরে আসি।

বিদেশে থাকলে মনে হত, আমি কী হনু সেটা দেশের বন্ধুদের দেখাই। প্রতিবেশীকে দেখাই, সহযোদ্ধাদের দেখাই। কিন্তু দেশে ফিরে কাস্টমস পেরিয়ে অসংখ্য মানুষের মধ্যে আমার অহংকার চুরমার হয়ে যেত। এই অসংখ্য জনস্রোতে বুঝতে পারি, আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। নিজেকে দেখাবার কোনও জৌলুসই আমার নেই।

আবার ফিরে যাই সেন্ট পলসে। কিংবা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে ঢুকে পড়ি সুতারকিন স্ট্রিটের পত্রিকা অফিসে। গোঁফওলা শান্তিবাবু আমাকে ছাড়পত্র দেন। তিনি সিকিউরিটি অফিসার। বিরক্তভরা মুখে কত বিখ্যাত মানুষই না তাঁর শাসন সহ্য করেন। আমি সৌভাগ্যবান। যখনতখন ছাড়পত্র পেয়ে যাই দোতলায় কিংবা তিনতলায় ওঠার। তারপরে অহিদার টেবিলে কথা হয়, কাজ হয়, আড্ডা হয়। গৌরকিশোর ঘোষ, বিমল কর, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কানাই সরকার কখনও-কখনও সন্তোষকুমার ঘোষেদের এই জগতে, এই বলয়ে ঘোরাঘুরি করে দিনের শেষে অহিদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম।

তখন সবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজার থেকে বিতাড়িত। অথচ তাঁর জনপ্রিয়তা, সাহিত্যখ্যাতি, নানান ধরণের উদ্ভাবনী শক্তি আর বন্ধুতার উষ্ণতা থেকে খুনসুটি সেসময়ের সাহিত্যসংস্কৃতি মহলে তাঁকে অন্যতম হিসেবে আলোকিত করে রেখেছিল। আনন্দবাজার গোষ্ঠী থেকে শ্যামলদার খসে পড়ার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। সেসময় একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীতে শ্যামলদার অন্য সহোদররা বহুদিন যুক্ত থেকেছেন। তাঁরা সকলেই কৃতী সাংবাদিক। অত্যন্ত দায়িত্ববান, ঠিকভাবে ওজস্বিতায় তা পালন করেছেন। কিন্তু শ্যামলদার ঘটনায় সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষকে জড়িয়ে মান-অভিমান চাওয়াপাওয়া থেকে এক আক্রোশের স্ফুলিঙ্গরূপ তাঁকে দূরে সরিয়ে দেয়। বাঙালির চরিত্র, মেধা, তার কল্পনাশক্তি, সৃষ্টিশীলতা পৃথিবীর যে-কোনও গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের থেকে অনেক আলাদা। কিন্তু বাস্তববোধ এত কম, আর মেনে চলার ক্ষমতা প্রায় শূন্য। আরেক ধরণ হল এমনি-এমনি অহংকার, স্বঘোষিত সম্রাট বনে থাকা, অন্যকে নস্যাৎ করা। তা হয়তো আপাত ক্ষতিকারক নয় কিন্তু ধ্বংসের সুপ্ত বীজ এগুলোই।

সন্তোষকুমার ঘোষ এক অনন্য মেধার অধিকারী ছিলেন। একটা সময় এই বাংলা শাসিত হত দুজন কিংবা তিনজন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। যদি রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেখি, তাহলে অসামান্য সংগঠক আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী একমাত্র দাপুটে মানুষ কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ। অন্যদিকে সাহিত্যসংস্কৃতি যা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির জীবনচর্যা আর সংস্কৃতিকে নেশাগ্রস্ত করে রাখত তার মধ্যমণি এবং দাপুটে নেতৃত্ব ছিল সন্তোষকুমার ঘোষের হাতে। অতুল্য ঘোষের মাথার ওপরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন। সন্তোষ ঘোষের ওপরে কর্তৃপক্ষ এবং পরিশীলিত বাঙালি অশোক সরকার ছিলেন।

তখনও ভারতবর্ষের সাংবাদিকতার জগতে অন্যতম খ্যাতিমান পুরুষ তুষারকান্তি ঘোষ জীবিত। যুগান্তর, অমৃতবাজার বহুল প্রচারিত। স্টেটসম্যান শিক্ষিত আর কুলীন বাঙালিদের আভিজাত্যের প্রতীক। সে এমন উঁচু গাছ যার ছায়া পড়ে না। এরকম সময়ে একজন সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাংবাদিক এবং প্রতিভাবান সাহিত্যকার সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর প্রতিষ্ঠা পেলেন আনন্দবাজারের দায়িত্ব নিয়ে। সেই পত্রিকার প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর থাকত।

তাঁর মতো শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বাংলা-সাহিত্যের এতবড় পাঠক বোধহয় অতিপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের গবেষক বা সাহিত্যকারদের মধ্যে বিরল। শুধু গদ্য নয়, ছন্দ ও গানে বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর অসম্ভব আত্মসংযোগ ছিল যার তুলনা হয় না। তিনি মদ্যপ ছিলেন। মাঝে মাঝে মনে হত, তাঁর প্রতিপত্তি, খ্যাতি, মেধা, জনসংযোগ আর সৃষ্টিসত্তা এইসব নিয়ে আত্মহারা হতে চাইতেন, তাকে সংগত দিত সুরা।

একদিন মনে আছে আমি একটা নাগাদ আনন্দবাজারের তিনতলায় লিফট থেকে নেমে সবে ঢুকছি, অন্যদিক থেকে সন্তোষবাবু এগিয়ে আসছেন। লোটানো ধুতির কোঁচা, খালি পা, মাঝে মাঝে কোঁচায় পা পড়ে শরীর টালমাটাল। মুখে পান। ছোট্ট মাছিগোঁফ। আমাকে দেখেই বললেন, শুভা এক্ষুনি একটা লেখা লিখে দাও। দেবীবাবু সম্পর্কে। আগের দিন বিকেলে শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরি প্রয়াত হয়েছেন। দেবীপ্রসাদের সঙ্গে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ভালো সম্পর্ক ছিল। উনিও আনন্দবাজারে প্রায়ই লিখতেন। শেষ উপন্যাস বেরয় 'মাংসলোলুপ' নামে। আমার সঙ্গে তাঁর ছিল স্নেহের যোগাযোগ।

আমি ওঁর কাছে প্রায় চলে যেতাম। মাদ্রাজের দায়িত্ব চুকিয়ে কলকাতার ভবানীপুরে বংশভিটেতে ফিরে এসেছিলেন। সন্তোষবাবু জানতেন, একজন দক্ষ গোয়েন্দা না হলে দক্ষ সম্পাদক হওয়া যায় না, বিশেষ করে যেসময় বিল গেটস বা জোবস পৃথিবীতে প্রকাশিত হননি। সুতরাং প্রযুক্তিহীন সময়ে প্রতিভা, মেধা

আর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় এসবের পরিপূরক ছিল। সন্তোষকুমার ঘোষ এই প্রযুক্তির ক্ষুরধার কুশলী ছিলেন। আমি যে উদ্দেশ্যে আনন্দবাজারে ঢুকেছিলাম সেসব ভুলে গিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। শিক্ষানবিশ এক তরুণের যেরকম হৃৎকম্প হয়, সেই মনে সন্ধেবেলায় লেখাটি নিয়ে এসে সন্তোষবাবুর হাতে দিলাম।

পরদিন সম্পাদকীয় পাতায় খুব বড় করে লেখাটি ছাপা হল। শিল্পী দেবীপ্রসাদকে স্মরণে রেখে এটাই একমাত্র লেখা, শিরোনাম ছিল 'দেবীপ্রসাদ : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব'।

কলকাতায় তখন বুদ্ধিজগৎ, মেধাজগৎ আর সৃষ্টিশীল জগতে খুব মাখামাখি ছিল। রাজনীতি তো থাকবেই কিন্তু সবটাই রাজনীতির অধিকারে ছিল না। কমিউনিস্টরা দাপুটে আন্দোলন করলেও সাম্রাজ্যবিস্তার করেনি। কংগ্রেসের কোথাও কোনও তেমন কিছু সংগঠন ছিল না। ভোটের আগে দু-চারজন অসম-লোক গজিয়ে উঠত মহল্লায়-মহল্লায়। তাঁরা প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে ঘোরাতেন। প্রার্থীরাও এঁদের সঙ্গে নিত। কারণ, বস্তিবাসীদের চিনিয়ে দিত ওঁরাই। বেশিরভাগ প্রার্থীই খুব বড়ঘরের অতিশিক্ষিত কিংবা নানা কারণে কেউকেটা। তাই কে কংগ্রেস, কে কমিউনিস্ট এ-নিয়ে মানুষের বিভাজন চরম আকার নেয়নি। তবে কমিউনিস্টরা ছিলেন একটু আড়বুঝে সৎপ্রকৃতির, ত্যাগী অথচ সন্ন্যাসী নয়। কোন মানুষের সঙ্গে তাঁরা মেশেন বোঝা যেত না। সকলেই যেন কিছু একটা গোপনীয়তার আশ্রয়ে আছেন। এরকম পাড়ায়-পাড়ায় দু-চারজন শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ তাঁরা নাকি মানুষ নিয়েই কাজ করেন। আমি তো তিরিশের দশকে জন্মাইনি। তাই বিপ্লবীদের গল্প শুনলেও সামনাসামনি বিপ্লবীদের দেখিনি। ওঁদের দেখে বুঝে নিতাম। পটভূমি মোটামুটি এই রকমই। ট্রামে, বাসে জীবন। হাঁটাপথে বন্ধুত্ব। অসংখ্য কবি। জলসা মানে শ্যামল মিত্র, হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জি। একটু তলায়-তলায় সারি-সারি শিল্পীরা। হিন্দি গান মানে মহম্মদ রফি, মুকেশ, কিশোর কুমার, তালাত মামুদ, আশা-লতা আর হ্যাঁ সলিল চৌধুরি। শীতে জমজমাটি শহর। পি সি সরকারের ম্যাজিক, পতৌদি, চাঁদু বোর্ডে, উমড়িগড় আর ভাষ্যকার অজয় ভট্টাচার্য। দুপুরে বীরেন ভদ্রের নকশা, সুচিত্রা-উত্তম জুটির সিনেমা, বিশ্বরূপা, রংমহল কিংবা স্টারে সরযুবালা, জহর রায় এঁরাই মধ্যবিত্তের ধ্রুবতারা। অলিম্পিক সার্কাস, মার্কাস স্কোয়ার, পার্ক সার্কাস জমজমাট আর বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন। অ্যাকাডেমি মানেই শম্ভু মিত্র, পাশাপাশি উৎপল দত্ত। একদল উত্তম একদল সৌমিত্র, একদল মান্না একদল হেমন্ত,

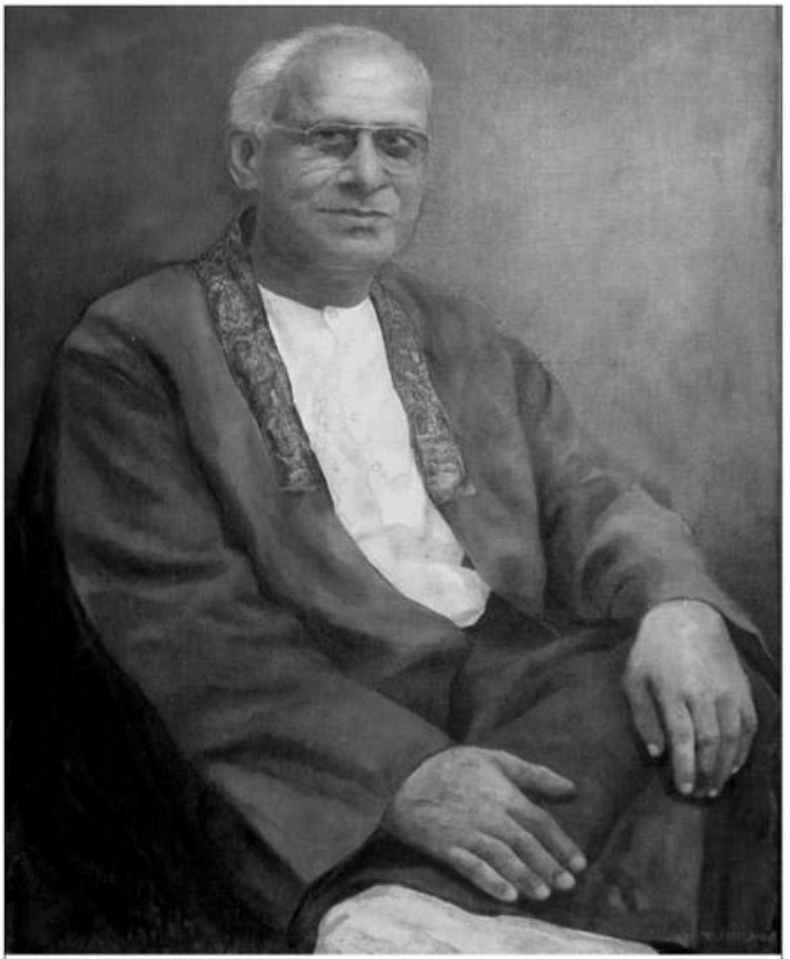

লেখকের ক্যানভাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একদল উৎপল একদল শম্ভু মিত্র। এই ধরণের বিভাজন সমাজে চালু ছিল। শত অভাবেও হিংস্র হয়ে ওঠেনি সমাজ। অথচ দুঃখের পরিকাঠামো চারদিকে।

শহরে হাতে-গোনা কিছু অশরীরী ধনী প্লাইমাউথ, সেভরলেট জাতীয় বিদেশি গাড়ি চাপতেন। হিন্দুস্তান আর অস্টিন এরাই মহাযান ছিল। বড়বাজার পগেয়াপট্টি, টেরিট্টি এইসব আর নাখোদা মসজিদের আশপাশ শতাব্দীব্যাপী একই ছিল, একই আছে। বদল হয়েছে কিছুটা হাওড়ামুখী হ্যারিসন রোডের বাঁপাশ, ডানপাশ। বুজে থাকা পার্কিং স্পেসগুলো এখন ঝাঁ চকচকে গাড়িতে ভর্তি। অস্টিন, হিন্দুস্তান উধাও।

আমরা চালচিত্র দেখি এইভাবে— কখনও প্রতিমা পাল্টায় কখনও চালচিত্র। আমি তখন কলকাতায় অনেক মানুষের কাছেই খুব পরিচিত। অনেকে ভালোবাসেন। যখন যাঁর কাছে মনে হয় ছুটে চলে যাই। শৈশব থেকে এই সাহস ক্রমশ আমায় অনেক সুযোগ দিয়েছে। কোনও বড় মানুষের কাছে যেতে আমার কোনও দ্বিধাবোধ হত না, কিন্তু সংসারে আরও-আরও অন্য বলয়, স্তর আছে। যে বলয়ে চট করে পৌঁছনো যায় না, সেই বলয়ের আঁচ পেতাম। কিন্তু প্রবেশের দ্বার অজানা ছিল। মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, সৃষ্টিশীল, চাকুরিজীবী এই ছিল আমার চারণভূমি। স্বজনের জগৎ। ক্ষমতার কেন্দ্রের মানুষদের কাছে-থাকা কিংবা সমাজ-সংসার-সংস্কৃতির নিয়ন্তাদের মহলে আমার মেলামেশা ছিল না। আমার কাছে অনেক তরুণ-তরুণী ছবি আঁকা শিখতে আসত। কিছুটা আমার পরিচিতি, কিছুটা ওইসব মহলে একটা ধারণা যে, আমি বোধহয় ছবি আঁকা শেখানোর সঙ্গে কিছুটা দিশা দিতে পারি। হ্যাঁ, আমি বরাবরই আলাপচারিতা ভালোবাসতাম। যা নিজে বুঝি তা প্রকাশ করতে পারতাম। যেহেতু ছেলেবয়েস থেকে সংগঠন করেছি তাই দৈনন্দিন অভ্যাসের মধ্যে অনেককে নিয়ে কিছু করার যেমন প্রবণতা ছিল তেমনই ঝাঁপিয়ে পড়তাম যে-কোনও উদ্যমে। এই রটনা থেকেই নানাধরণের ছাত্রছাত্রীরা

আমার কাছে ভিড় করত।

দ্বিতীয়বার ইউরোপ থেকে ফিরেছি। দ্বিতীয় প্রদর্শনী খুব সফল হয়েছিল। আমার মনে-মনে একটা আত্মবিশ্বাস হচ্ছিল— চাকরি না করে ছবি এঁকে বেঁচে থাকতে পারব। বাড়ি থেকে একটা চাপ আসছিল, পরবর্তী পরিণতির জন্য। কিন্তু পরিণয় পরীক্ষায় আমার জন্য কাউকে শামিল করতে কখনও মন সায় দেয়নি। প্রকৃতির আকর্ষণ অনুভব করতাম। বরং বেশিই করতাম। একটু সান্নিধ্য, একটু সৌন্দর্য, একটু দেহছন্দ, একটু লাবণ্য আমায় লোভী করত। বাস্তবতার চেয়েও স্বপ্নচারী হয়ে অধিকারীর কল্পিত আনন্দ-দুঃখে একান্ত সময়ের অনেকটা কেটে যেত। আমার এ-বর্ণনা আলাদা কিছু নয়। প্রকৃতির অধিকারে, প্রকৃতির আবর্তে, জীবজগতের সবকিছুর মতোই আমার আকর্ষণ ছিল। আবর্তিত হওয়ার রসদ ছিল। এগুলো এত সাধারণ, এত স্বাভাবিক যা আলাদা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আত্মপ্রকাশের লিপ্সায় এই রসদকে পুঁজি করে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অসংখ্য ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলছে আজও সাহিত্যকারেরা, কবিরা, শিল্পীরা। তবু আমার ভাষা, তবু আমার বোধ, তবু আমার অনুরণন, তবু আমার গোপন লিপ্সা আর দুঃখ যে অন্য কারও মতো না। সেই কৈশোর থেকে কত কিশোরী দেখেছি যারা স্বপ্নচারী কিন্তু বাস্তবে নেহাতই বোন। তারুণ্য-যৌবনে যারা আকর্ষণের, সম্পর্কের বোন নয়তো দিদি কিংবা অল্প-পরিচয়ের নারী তারা। তারা কল্পনায় প্রভাবিত করেছে। আমি দ্রুতগতিতে কাজ করেছি। বড়-বড় ছবি এঁকে ফেলেছি। কবিতা কিংবা লেখা শেষ করেছি। একটা ভালো জামাকাপড় পরে চিহ্নিত হওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি যে বিশিষ্ট তা প্রমাণ করার গোপন চেষ্টা চালিয়েছি। এসবের পিছনে কোনও-না-কোনও স্বপ্নচারিণীর ভূমিকা থেকে গিয়েছে। এরই মধ্যে কারও-কারও স্পর্শ-স্মৃতি আছে। কেউ-কেউ দূরত্বে দেখার। কেউ-কেউ ছোঁয়াছুঁয়ি-লুকোচুরি খেলার, গোপনীয়তার রোমাঞ্চে কাতর হওয়ার প্রতিমা। মনতাজের মতো এইসব ভেসে আসে জীবনে। কোনও ছবি উদ্ধার হয়, কোনও ছবি অস্পষ্টতায় ঢেকে যায়। স্মৃতিচারণে কিছু গন্ধ ভেসে আসে। কিংবা শব্দ, কিংবা স্পর্শ। কত একান্ত হারিয়ে গিয়েছে। কত কিছু সান্নিধ্যের তা হার্ডডিস্কে তোলা নেই। প্রকৃতিদত্ত এ-জীবনে এইসব জমে থাকা দস্তাবেজ হয়তো কোনও মহাফেজখানায় সংরক্ষিত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে একজন ছবি আঁকা শেখার ইচ্ছে নিয়ে আসে। আমার সেই খুপরি ঘরে বিম ছাড়া উচ্চতা যার ঠিক ছ-ফুট। দরজা ছোট। আর বিমের তলায় দাঁড়ালে আমার মতো খর্বাকৃতিকেও ন্যুব্জ হতে হয়। সেই স্বপ্নকুঠরিতে আমি সস্তা দামের লোহার পাইপের আরামকেদারায় শুয়ে থাকি। গরমের পর বর্ষার সন্ধ্যা। কাদা প্যাচপ্যাচে ভিজে আমেজ পরিবেশে সে আসে, বসে।

তখন সবে আত্মবিশ্বাসের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। কিন্তু সে কীরূপে প্রকাশ পাবে জানি না। নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে থাকলেও আমার নিজস্ব সময় ছিল গ্যারেজের ওপরে ম্যাজেনাইন ফ্লোরে, উঁচুনিচু চাতাল সদৃশ সেই ছোট কামরার চারদিকে আমার মতো করে সাজিয়ে রাখা বইপত্র, রং, তুলি, ক্যানভাস সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ ছবির ভিড়। ভেতর দিক দিয়ে একটা কাঠের পাটাতন করে ঘর-বার করা। সব ফাঁকফোকরেই শরীরকে সতর্ক করে ঢুকতে হত। সেখানে পছন্দমতো সংগ্রহ করে নানান ধরণের আসবাব জড়ো করেছিলাম। কখনও-কখনও তা পরিত্যক্ত পুরনোর সঙ্গে কিছু নতুন সংযোজন করে ব্যবহারযোগ্য অথচ অন্যরকম। কিছু টেবিল-চেয়ার, বই রাখার তাক এমনকি লোহার বিমের খাঁজেও সংগ্রহশালায় সাজানো দুর্লভ বস্তুর মতো রেখে দিতাম অনেক কুড়িয়ে পাওয়া সামগ্রীকে। ওই খুপরির কর্মশালা এখন আর নেই। এখন আরও অনেক মায়াজালের আবর্জনায় জড়িয়ে আছি, থাকি। কিন্তু সেই অসম খুপরির একাধিক তলে নামা-ওঠার সঙ্গে নিজেকে যেমন একাত্ম করেছিলাম, তেমনই সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজস্ব ঘরে ঢুকে যখন দরজা বন্ধ করে দিতাম তখন মনে হত গোটা বিশ্বই ওই খুপরিতে আর আমি তার একমাত্র অধিকারী। এখানে কল্পনার গল্প, অহংকার-ঐশ্বর্যের বিলাসিতা ভাগাভাগি করার কেউ নেই। এখানে হা-হা করে হাসতে পারি, কাঁদতে পারি। চারপাশের দেওয়াল, জানালা, দরজা, আসবাব, রং-তুলি, ক্যানভাস, চারকোল, বইপত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড তারা উদগ্রীব হয়ে থাকে আমাকে সাহায্য করার জন্য। মাঝে-মাঝে তারা যেন বলে ওঠে এই নাও তুমি আমায় স্পর্শ করো। সেসময়ের এই বন্ধুরা আজও আমার নিজস্ব ভালোবাসার সঙ্গী। শুধু তফাত, তাদের আমি যেভাবে যত্নে রাখতাম আজকাল তা রাখি না। একটা তুলি বা চারকোল একটু অকেজো হলে তাকে পরিত্যাগ করি। নতুন তুলিতে আমার সাহস দেখাই। সেই খুপরিতে সেই বর্ষাতুর অলস সন্ধ্যায় সেই স্বল্পপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সে মেয়েটি আসে। আমার সামনে রাখা দুটি মোড়ায় বসে ভদ্রলোকটি মেয়েটির আগমনের কারণ বর্ণনা করে আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে চলে যায়। তখন কি তাকে দেখেছি? ঠিক মনে নেই। সে জানায় ছবি আঁকা শিখতে চায়। কলেজের পরীক্ষা শেষ, এখনও ফলাফল প্রকাশ হয়নি। এই ফাঁকে তার ছেলেবেলার ইচ্ছা ছবি আঁকার তালিম যদি আমার কাছ থেকে পায়।

একেকটা মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে যখন বিবেচনা, ভাবনা, কাণ্ডজ্ঞান এসবের প্রয়োগ না করে অতি দ্রুততার সঙ্গে ইচ্ছায় ঝাঁপ দেয়। চোখে পড়ে ওর সারল্য, স্নিগ্ধতা আর অসম্ভব পরিপাটি করে একটি সাদা, সাধারণ অথচ আভিজাত্যে মোড়া পরিধেয় শাড়িটি। মুক্ত এ-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায়, কখন, চকিতে তারার দ্যুতি উদ্ভাসিত হয় কোন আঁধারে, কে জানে তা? আমাদের মনোজীবনের ঘূর্ণায়মান দুর্লভ হীরকখণ্ড অসংখ্য জ্যামিতিক চৌখসের কোন অংশে সেই অসংখ্য তারার দ্যুতির ঝলকানি উদ্ভাসিত হয় তা তো বলতে পারি না! তখন আমার এমনই হয়েছে, সেই বর্ণচ্ছটায় আমি তাকে বলি, হ্যাঁ আমি শেখাতে পারি কিন্তু যদি আমার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ভাবতে পারো। মনের মণিকোঠা থেকে দ্যুতির উদ্ভাস তো চকিতে হয়। পরে আঁধার নেমে আসে। বাস্তবের চোখে তাকাই— কিছু পরে মেয়েটি চলে যায়। সম্বিৎ ফিরে আসতে অনেক সময় কেটে যায়। আমি তো জানি না সে পৃথিবীর কোন খণ্ড থেকে এসেছিল, আমি তো জানি না কী তার ঠিকানা। স্বল্প পরিচিত ভদ্রলোকটিকে জানতাম— কিন্তু তাকেই বা বলি কী, তারই বা সন্ধান পাই কোথা! এভাবে ওলট-পালট দিন কেটে যায়। কখনও মনে হয় অপরাধী, কখনও মনে হয় অপরাজিত। তোলপাড় হয় মন। কাউকে কিছু বলতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনের লয় যেন বিলম্বিত হতে থাকে। দুর্ভাগ্যের কথা ভাবি। আমি কি অবিবেচক? এভাবে প্রায় সপ্তাহ কেটে যায়। সেরকমই সন্ধ্যায় প্রায় একই পরিবেশ, ঝিরঝির অলস বৃষ্টির কলতান। দরজায় একটা শব্দ ভেসে ওঠে। এগিয়ে যাই দ্রুত। দরজা খুলে দেখি সে, আমি এগিয়ে যাই— আমাকে অনুসরণ করে সে বসে সেই নির্দিষ্ট মোড়ায়। পরস্পর চোখাচোখি হয়। এক নিষ্পাপ হাসি বিনিময়। সম্মতির দেহছন্দে ঈষৎ নত গ্রীবায় একটা ছোট্ট উত্তর ভেসে আসে, ঠিক আছে। হৃদয়ে আমার স্বেদপ্রবাহ বইতে থাকে। শীতলতার উত্তেজনা। কীভাবে বর্ণিত করি সে অবস্থাকে। এ তো এক একান্ত অনুভূতি। পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণীর সে অনুভূতিও এক অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অভিন্ন অনুভূতিও কত ভিন্ন। কী করে বোঝাই? কেই বা বুঝবে তা। আমার জীবন, আমারই জীবন। আমার উষ্ণতা, শীতলতা, হৃদ-মনের একান্ত প্রক্রিয়াবোধ, উপলব্ধি আমারই। তবুও জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা বুঝিয়ে চলি। প্রকাশ করার নানাবিধ চেষ্টায় মেতে উঠি, ঘোষণা করি— আমায় দ্যাখো, আমায় বোঝো।

ক্রমশ

মহাশ্বেতা দেবী: *জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে, আকাদেমি প্রভৃতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভূষিতা লেখিকা।*

বহু ছেলেমেয়ে 'কর্মক্ষেত্র' পড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে।
অন্তত চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ের
কথা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।
যারা 'কর্মক্ষেত্র'-র সহায়তায়
কাজ পেয়েছিল। ওদেরকে আমিই
'কর্মক্ষেত্র'-র গ্রাহক করে দিয়েছিলাম।
'কর্মক্ষেত্র' প্রথম থেকেই ছোটখাটো
ব্যবসার এক আশ্চর্য নির্দেশিকা দিয়ে
আসছেন, যা অনুসরণ করলে যুবাপ্রজন্ম
বাঁচবার ও বাঁচাবার পথের সন্ধান পাবে।
টুথপেস্ট বানাবেন, না হাওয়াই চপ্পলের
ফিতে? মেশিনে পোট্যাটো চিপস বানিয়ে
বেচবেন, না ভিনিগার তৈরি করবেন?
'কর্মক্ষেত্র' এত বছরে, এরকম অন্তত
এক হাজার অল্প পুঁজির ব্যবসার হদিশ
দিয়েছে। ওই সব ব্যবসায় নেমে
কয়েক হাজার মানুষই স্বাবলম্বী হয়েছেন।
মৃত্যু যখন দরজায় ঘা দিচ্ছে, তেমন
সময়ে যে ঔষধ বাঁচাতে পারে, তাকে
আমাদের মুনিঋষিরা নাম দিয়েছেন
বিশল্যকরণী। আমি তো 'কর্মক্ষেত্র'কে
বলব বিশল্যকরণী।
'কর্মক্ষেত্র' যেভাবে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা
করার পরিকল্পনা জোগায়, তাতে তো
সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন
নতুন জীবনের রসদ পায়।
'কর্মক্ষেত্র' বলছে, পরিশ্রম করো
সততার সঙ্গে, শ্রমকে ভয় পেও না,
স্বীয় কর্মগুণে ভাগ্যকে জয় করো।
আজ দেশের তরুণ প্রজন্মকে এই কথা
বলার মহান দায়িত্ব 'কর্মক্ষেত্র' গ্রহণ করেছেন,
আমি অন্তর থেকে যেন সাড়া পাচ্ছি।

মহাশ্বেতা দেবী

৩ জুলাই, ২০০৫

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

ভগীরথ মিশ্র

গল্পের জন্মবৃত্তান্ত

আমাকে বিভিন্ন সময়ে আমার অনেক পাঠকই এমন প্রশ্ন করেন, আপনি যে এই গল্পটা লিখেছেন, কিংবা ওই চরিত্রটা এঁকেছেন, এগুলো কি বাস্তব নাকি সবই আপনার কল্পনা?

তার জবাবে যদি বলি যে, হ্যাঁ, এগুলো সবই বাস্তব, তৎক্ষণাৎ পরবর্তী প্রশ্ন, এই ঘটনাগুলো বা চরিত্রগুলো আপনার স্বচক্ষে দেখা?

বলি, হয়তো দেখেছি, হয়তো দেখিনি, তবে এগুলো সবই বাস্তব।

— যেগুলো দেখেননি, সেগুলোও বাস্তব?

— হয়তো চর্মচক্ষে দেখিনি, দেখেছি মনশ্চক্ষে। কিংবা মনশ্চক্ষেও দেখিনি। তবে সেগুলোও সমানভাবে বাস্তব।

— কেমন করে? মনশ্চক্ষেও যা দেখেননি, সেগুলো বাস্তব হয় কেমন করে?

মৃদু হেসে বলি, ব্যাপারটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। ব্যাপারটা আপনার কাছে যেমন, প্রায় দুশোর অধিক গল্প লেখার পরেও আমার কাছেও সমান রহস্যময়। তবে বাস্তবতার প্রশ্ন যদি ওঠে, তবে কবির ভাষায় বলতে হয়, সেই সত্য যা রচিবে তুমি। আসলে, লেখা থাকে সম্ভবত লেখকের চোখে নয়, থাকে তাঁর কল্পনায়, স্বপ্নে। আর কবি তো বলেইছেন, স্বপ্ন শুধু সত্য, আর সত্য কিছু নয়।

কথাশিল্পী অমিয়ভূষণ একবার বালুরঘাটের এক আলোচনাসভায় গল্পের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে লেখকসত্তার গভীরে একটা পাতনযন্ত্রের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। যেমন করে পাতনযন্ত্রে মদ তৈরি হয়। নানাজাতের শস্যের সঙ্গে জল ও অন্যান্য অনুঘটক মিশিয়ে প্রথমে প্রচণ্ড তাপে ফোটানো হল। তারপর ওই ফুটন্ত তরল থেকে যে জলীয় বাষ্প বের হল, তা শীতল নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হল। তার ফলে, জলীয় বাষ্প আবার তরলে পরিণত হয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল অন্য একটি পাত্রে। তৈরি হল মদ। ঠিক তেমনই, লেখক তাঁর চারপাশ থেকে যত উপাদান আহরণ করেন, সেগুলির সঙ্গে তাঁর কল্পনা (জল) ও দৃষ্টিভঙ্গি (অনুঘটক) মিশিয়ে সময়ের তাপে ফুটিয়ে তার নির্যাসটুকু ঝরিয়ে দেন কলমের ডগায়। রচিত হয় একটি গল্প, একটি কবিতা, একটি ছবি। এতদ্দ্বারা, ভাষা দিয়ে গোটা প্রক্রিয়াটির যতখানি বোঝানো গেল, সম্ভবত বাস্তবে প্রক্রিয়াটি তার চেয়েও ঢের বেশি জটিল। বাস্তবিক, আগেও বলেছি, একটা গল্প ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয়, গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, শেষ হয়, সেটা আমার কাছেও এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এমন তো নয় যে, আমি কোনও ঘটনা ঘটতে দেখলাম, সেই ঘটনাটিকেই সাজিয়ে গুছিয়ে একটা গল্প লিখে ফেললাম। ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। অত সহজ প্রক্রিয়ায় আমি তো নয়ই, সম্ভবত কেউই কোনও গল্প লিখতে পারেন না। আমরা চারপাশে যা দেখি, ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য, তার থেকে যে কাহিনি, প্লট, পটভূমি, চরিত্র ইত্যাদি বেরিয়ে আসে, সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে যদি একটা কিছু লিখি, তবে সেটা আর যাই হোক, গল্প হবে না। ঠিক যেমন কিনা, ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডার দিয়ে যা দেখি, তার একখানা ফটোগ্রাফ তুললে, সেটা কোনও মতেই একটা ছবির (চিত্র) মর্যাদা পায় না, ঠিক তেমনিভাবেই, যদ্দৃষ্টং তদ্‌লিখিতংও গল্প নয় কোনও মতেই।

বাস্তবিক, একটা গল্প কেমন করে জন্ম নেয়, সেটা বুঝিয়ে বলা বুঝি গল্প লেখার চেয়েও কঠিন। ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি, তার অনেক কিছুই তো স্মৃতিতে থেকে গেছে। নিজের অজান্তেই দিনের পর দিন জমেছে সেসব। তারপর, ধীরে ধীরে বয়েস বেড়েছে, মন হয়েছে পরিণত, বিশ্ব-সংসারকে দেখবার জন্য একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠেছে ততদিনে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শৈশব-কৈশোরের জমানো স্মৃতিগুলোকে হাতড়াতে গিয়ে দেখি, ততদিনে স্মৃতি থেকে অনেক কিছুই হয়তো-বা গিয়েছে হারিয়ে। আবার, যা-কিছু টিকে রয়েছে, বয়েসের অভিঘাতে তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ছেলেবেলায় যা ভেবে একটা ঘটনা, একজন মানুষ, কিংবা একটা দৃশ্যকে ভরে রেখেছিলাম মনের কুঠরিতে, দেখলাম, বয়েসকালে এসে ওগুলো আর ঠিক আগের মতোটি নেই। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন-হেতু, মনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধরণ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে, সেইসব ঘটনা, চরিত্র, দৃশ্যও বদলে ফেলেছে নিজেদের রূপ। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বেশি বয়েসের দেখাগুলো, বোঝাগুলো। একসময় ওরা বোঝা হয়ে উঠেছে মনের মধ্যে। ওদের কোথাও খালাস করবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে মন। সেই তাড়নায় কলম ধরেছি।

তবে একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, কোনও একটি ঘটনাকে, দৃশ্যকে বা মানুষকে দেখলাম, আর, তার ভিত্তিতেই লিখে ফেললাম একটা গল্প, এমনটা আমার জীবনে কখনওই ঘটেনি। কোনও ঘটনা, চরিত্র, বা দৃশ্য একেবারে অবিকল হয়ে উঠে আসেনি আমার একটাও গল্পে। সম্ভবত কারও ক্ষেত্রেই আসে না তা। আমাদের দেখাগুলো, শোনাগুলো, বোঝাগুলো সম্ভবত প্রথমে জমা পড়ে আমাদের সচেতন স্মৃতিতে। তারপর তারা চলে যায় আমাদের অবচেতনে। সেখানে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন অনুসারে তা এক রহস্যময় পাকশালাতে পাক হয়। আর, নানা জাতের সবজি দিয়ে একটি ব্যঞ্জন রান্না করলে যেমন রান্নার পর ওই ব্যঞ্জনে কোনও বিশেষ সবজি আর অবিকল থাকে না, ঠিক তেমনই, একটা গল্পে আমার দেখা অনেক ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য ও অন্য উপকরণগুলিও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কাজেই, আমি আমার কোনও গল্পের ক্ষেত্রেই বলতে পারি না যে, এই গল্পটি অমুক ঘটনার ভিত্তিতে, কিংবা তমুক মানুষটিকে নিয়ে লেখা। অনেক ঘটনা, মানুষ, দৃশ্য ও চিত্রকল্পের নির্যাস থেকে বেরিয়ে আসে আমার গল্পের উপাদান।

এমনও হয়েছে, একটা ঘটনার বীজ থেকে জন্ম নিল একটি গল্প, কিংবা একটি চরিত্রের ছায়া থেকে একটি গল্পের ভ্রূণ বেরিয়ে এল, একটি বিশেষ দৃশ্য থেকেও একটা গল্পের সূত্রপাত হতে পারে। এমনকী, একটি বাক্য বা পংক্তিই হয়ে উঠল একটি গল্পের বীজ। সেই বীজে অঙ্কুরোদগম ঘটল, পাতা গজাল, ডালপালা, শাখাপ্রশাখায় একটি গল্প জন্ম নিল।

প্রায় দুই শতাধিক গল্প লিখেছি আমি। তাদের সবগুলোর জন্মবৃত্তান্ত এক নয়। এই নিবন্ধে তাদের মধ্যে অনেকগুলি গল্পের সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করলেও তা পরিসরে বিশাল হয়ে উঠবে। তবে, সচেতনভাবে সেইসব গল্পের প্রতিটির জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে আমিও নিজেও বিস্মিত হচ্ছি এই কারণে যে, কত বিচিত্র উপায়ে জন্ম নিয়েছে ওরা, অথচ আমি তো আগে সচেতনভাবে এই নিয়ে ভাবিইনি।

অপরাহ্নের আলো

রওনা দিয়েছিলাম সেই সাতসকালে, নিখিলের সঙ্গে হাসিদির বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন ঠায় দুপুর। শেষচৈত্রের সূর্য একেবারে মাঝআকাশে স্থির। আর, পরানপুরের তাবৎ লম্বা গাছগুলোর ছায়া একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে মিশে যেতে চাইছে তাদের

মালিকের শরীরের সঙ্গে।

মাধব সিং গরুর গাড়িটিকে সদর-উঠোনের একপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে রাখল। গরুগুলোকে সদর-পুকুরে নিয়ে গিয়ে জল খাইয়ে আনল। তারপর দাওয়ায় বসে গামছা দিয়ে মুখ-হাত মুছতে লাগল পরিপাটি করে।

হাসিদি বুঝি সেই সকাল থেকেই হা-পিত্যেশ করছিল, আমরা পৌঁছনোমাত্র অন্দরমহলের কোনও প্রান্ত থেকে যেন দেখতে পেয়েই আঁচলে ভেজাহাতটি মুছতে মুছতে দ্রুতপায়ে চলে এল সদর-উঠোনে। নিখিলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল, এসে গেছিস? বলতে বলতে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল আমার দিকে।

নিখিলই আগ বাড়িয়ে বলল, চিনতে পারলেনি? আমার বন্ধু গোরা।

—ও— এই তবে গোরা! গৌরীর ছেলে! আমার দিকে তাকিয়ে হাসিদি মিষ্টি করে হাসল, কী করে চিনব বল, আগে তো তেমন করে দেখিনি অকে। মাত্তর একটিবার অকে দেখেছিলাম, তখন উ মায়ের কোলে। আমি কোলে লিয়া-মাত্তর এমন ট্যা-ট্যা করিয়া কান্না জুড়ল—!

শুনে তো আমি লজ্জায় মরি।

হাসিদি আমার নিজের দিদি নয়। তাঁর পোশাকি নাম যে সুহাসিনী সেটাও জেনেছি অনেক পরে। নিখিলের বড়দিদি তিনি।

আমার মা আমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। সেই সুবাদে আমার মামাবাড়িটি গাঁয়েরই অন্যপ্রান্তে। বিয়ের আগে হাসিদি আর আমার মা ছিল গলায় গলায় সই। গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলেও একসঙ্গে পড়েছে ওরা। গোটা শৈশব-কৈশোর একসঙ্গে কেটেছে ওদের। হাসিদির কথা উঠলেই এখনও অবধি মায়ের চোখেমুখে একজাতের ঘোর নেমে আসতে দেখেছি। সে নাকি ছেলেবেলায় ভারি ছটফটে ছিল। তার দস্যিপনার জন্য নাকি মাকে বেশ কয়েকবার মার খেতে হয়েছে ইস্কুলে। ডুব-সাঁতারে তার নাকি জুড়ি ছিল না। আর, গানের গলাটি ছিল ভারি মিষ্টি। যখন সে নেহাৎই কিশোরী, গাঁয়ের অনেক ছেলেই নাকি ওর দিকে স্রেফ অপলক তাকিয়ে থাকত। মেলায়-পার্বণে নাকি ওই বয়েসেই ওকে প্রেমনিবেদনও করেছে কেউ-কেউ। সেই সুবাদে ওই বয়েসে হাসিদিরও নাকি ছিল কোনও মনের মানুষ। আর কেউ নয়, এই জগৎসংসারে একমাত্র আমার মাকেই সে সংগোপনে বলত তার মনের সব কথা। না, মা আমাকে কখনওই সরাসরি বলেনি এসব কথা। তবে সুযোগ পেলেই কাকিমাদের কাছে সে খুলে বসত তার কৈশোরের ঝাঁপিটি। ওই ঝাঁপির অনেকখানি জুড়ে থাকত হাসিদি। আমি আড়াল থেকে শুনতে পেতাম সবকিছু। তৎক্ষণাৎ ছবি আঁকতে লেগে যেতাম হাসিদির।

সারা অঙ্গে অগাধ রূপের সঞ্চয় থাকায়, অল্প বয়েসেই হাসিদির বিয়ে হয়ে গেল পরানপুর গাঁয়ে। বিয়েতে আনন্দ করবে কি, মা নাকি পাক্কা সাতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলই কেঁদেছে।

মায়ের সই, সেই সুবাদে হাসিদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মায়ের মতোই। কিন্তু যেহেতু আমার কোনও দিদি নেই, আর, নিখিল আমার প্রাণের বন্ধু এবং মেলায় পাতানো গঙ্গাজল, তাই, নিখিলের দিদিদেরই আমি হাসিদি, কণাদি বলে ডাকি। ওদের ভাইবোনদের মধ্যে হাসিদিই সবচেয়ে বড়। নিখিলের সঙ্গে তাঁর বয়েসের তফাৎ প্রায় কুড়ি বছরের। নিখিল যে-বছর জন্মাল, হাসিদির প্রথম সন্তানের বয়েসই তখন দু'বছর। এখন আমি আর নিখিল পনেরো। সামনের বছর মাধ্যমিক দেব দুজনেই।

হাসিদিকে বলতে গেলে তেমন করে দেখিনি আগে। এমনিতে প্রাইমারি স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে আমি আর নিখিল চলে গেলাম শহরের হাইস্কুলের হোস্টেলে। পড়াশোনার চাপে বাড়ি যাওয়াটাও কমতে লাগল। তাছাড়া, সেই বিয়ের পর থেকেই হাসিদিও বাপের বাড়িতে আসত খুবই কম। নিখিলের মুখে শুনেছি, শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ, জমিজিরেত, মজুর-কামিন, গরুবাছুর নিয়ে ভরভরন্ত সংসার হাসিদিদের। শাশুড়িটি চিররুগ্না; শ্বশুরটি আলাভোলা, কাজেই, সংসারের বড়বউ হওয়ার সুবাদে বিয়ের পরপরই শ্বশুরবাড়ির গোটা সংসারটা চেপে বসেছিল হাসিদির মাথার ওপর। সেই থেকে বোঝাটিকে হাসিমুখেই সামলাচ্ছে হাসিদি। পরে পরে দেওরগুলোর বিয়ে হয়েছে, তাদের কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে, হাসিদির ঘাড়ের বোঝাটা আরও ভারী হয়েছে তাতে। আর, এখন তো নাকি ওই বিশাল বোঝাটি নিয়ে এমনই হিমসিম খাচ্ছে, এখন সে এমনই আকাট গিন্নিবান্নি যে, বছরে-দু'বছরে বাপের বাড়ি অবধি আসার সময় পায় না। কালেভদ্রে এলেও দুদিনের বেশি থাকতে পায় না বেচারি। এমনকী, আমাদের গাঁয়ের চড়কের মেলায়, যখন গাঁয়ের ঝিউড়িরা সব ঝাঁক বেঁধে বাপের বাড়িতে আসে ফি-বছর, ওই কটা দিনের জন্য সবাই সারাটা বছর শ্বশুরবাড়িতে হা-পিত্যেশ করে থাকে, হাসিদি ওই উপলক্ষ্যেও ফি-বছর আসতে পারে না। দু-তিন বছর বাদে বারেকের তরে এলেও থাকতে পারে না দুদিনের বেশি। ভরভরন্ত সংসার ছেড়ে তাঁর নাকি আসার উপায় নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-জা, জায়ের ছেলেপুলেগুলো, সংসারের মুনিশ-কামিন, মায় গরু-বাছুরগুলোরও নাকি হাসিদিকে না হলে দু'দণ্ডও চলে না। চিররুগ্না শাশুড়ি নাকি সে বিহনে ওষুধ পাবে না, চোখে-ছানি-পড়া শ্বশুর নাকি বেরোবার কালে লাঠিটি খুঁজে পাবে না, জা'গুলো সংসারের সব কাজকামই গুলিয়ে ফেলবে, জেঠাইমার কাছে না পড়তে পেলে জায়ের বাচ্চাগুলো নাকি পরীক্ষায় গোল্লা পাবে, হাসিদি খেতে না দিলে মুনিশ-কামিনদের তৃপ্তি হবে না, এমনকী, হাসিদি হাতে ধরে জাবনা না খাওয়ালে গরুগুলোর অবধি নাকি পেট ফাঁকা থেকে যাবে, ফলত, রাতভর গোয়ালের মধ্যে পাহাল পাড়বে ওরা। আর, চৌহদ্দির মধ্যেকার সবজিগুলো নিয়মিত জল না পেয়ে ঝিমিয়ে যেতে যেতে নাকি হাসিদির জন্যই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে দশচোখ মেলে। বলতে বলতে ফি-বারেই হাসিদির মুখে নাকি ফুটে ওঠে এমনই তৃপ্তিভরা নাজেহাল হাসি, দেখেই যা-বোঝার বুঝে ফেলে মা-কাকিমারা। পরবর্তীকালে ওইসব কথা ওগরাতে গিয়ে ওরা হেসে কুটিকুটি।

এর মধ্যেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ হাসিদি বাপের বাড়ি এলেও আমাদের সঙ্গে ওর দেখা হত না। আমি আর নিখিল হয়তো-বা তখন হোস্টেলে। তবে কয়েক বছর আগে, সেবার যখন হাসিদি এসেছিল চড়কের মেলায়, দুদিন মাত্তর ছিল, একদিন বিকেলে এসেছিল আমাদের বাড়িতে।

মায়ের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে অনেক গল্পগুজব করেছিল সারা বিকেল। কিন্তু নিখিল আর আমি তখন মেলার মধ্যে ঘুরছি। একসময় বাড়ি ফিরেই দেখি, শোবার ঘরে মা আর হাসিদি নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে মজে রয়েছে। কথায় কথায় খিলখিলিয়ে হাসছিল মা আর হাসিদি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছিল বারবার। আমি ছোট, তাই বড়দের পাশে ভিড়িনি। তবে বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ওদের গুনগুন কথা আর থেকে থেকে কাচভাঙা হাসি। একবার মনে হয়েছিল, ভেতরে ঢুকি, কিন্তু বেজায় লজ্জা করল। কাজেই বাইরে থেকে সেই প্রথম শুনলাম আমাদের বহু আলোচিত হাসিদির কথা আর খিলখিল হাসি। কী নিয়ে বারবার এমন হাসিতে ভেঙে পড়ছিল দুটিতে, কী এমন প্রাণের কথা ছিল তা, বুঝতে পারিনি বটে, তবে মাকে বহুদিন বাদে অমন বাঁধনছাড়া হাসি হাসতে দেখেছিলাম।

তখন সন্ধে হয়হয়, হাসিদিকে নিয়ে বাইরে বেরোল মা। উঠোন পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আগড়ের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ দুজনের বিদায়পর্ব চলল। আমি ততক্ষণে উঠোনের শেষপ্রান্তে পেয়ারা গাছটার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে দেখছি হাসিদিকে।

একসময় চলে গেল হাসিদি। ওই একবার মাত্র একঝলকে দেখেছিলাম হাসিদিকে। তাও দূর থেকে। মুখটা দেখতে পাইনি, তবে গায়ের রং ছিল একেবারে চাটিম কলার মতো। আর পরনে ছিল দামি আকাশি রঙের শাড়ি। সারা গায়ে ছিল অগাধ গয়না। হাসিদির অগাধ রূপ নিয়ে আবাল্য শুনে আসছি মা'দের মুখে, কাজেই হাসিদির অবশিষ্ট ছবিটা মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছিলাম স্রেফ কল্পনায়। একেবারে রাজরানির মতো করে এঁকেছিলাম ছবিটা।

হাসিদিকে বিদায় জানিয়ে ফিরে আসার পথে মাঝউঠোনে মুখোমুখি হওয়ামাত্তর মা বলে উঠলেন, ইস, এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই? হাসি তোকে কত খুঁজল। বারবার দেখতে চাইছিল তোকে। কালই নিখিলের বাড়িতে গিয়ে একটিবার দেখা করে আসিস।

আমি লজ্জায় নিজের থেকে যেতে পারিনি। নিখিলও তেমন করে ডাকেনি। হাসিদিকে একেবারে সামনে থেকে তাই আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। তবে মা এবং নিখিলের বাড়ির লোকজনের মুখে হাসিদির কথা বারবার শুনতে ওর সম্পর্কে এক ধরণের চাপা কৌতূহল তো সেই ছেলেবেলা থেকে ছিলই, তাঁকে নিয়ে একটা ঝাপসামতো ছবিও তো বুকের মধ্যে আঁকাই ছিল, কাজেই, নিখিল যখন আমাকে বলল, এবারের চড়কের মেলায় বড়দি আসবে, মাধবদা গরুর গাড়ি লিয়া যাবে, আমিই যাব

বিস্রস্ত খোঁপা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে মুখের আশপাশে। দামি শাড়ি আর ভারী ভারী গয়নাগুলো নেই ওর গায়ে। শরীরের সেই ঝকঝকে ভাবটি, যা সেদিন দেখেছিলাম পেয়ারা গাছের আড়াল থেকে, তার অনেকটাই উধাও। চৈত্রের এই দুঃসহ গরমে তার মুখে, ঘাড়ে, গলায় থিকথিকে ঘাম।

অকে আনতে। তুই যাবি আমার সঙ্গে? এককথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

আজ সারাটা পথ আমি বুকের মধ্যে আঁকা হাসিদির ওই ছবিটিকে মনশ্চক্ষে দেখতে দেখতেই পৌঁছে গিয়েছি ওর শ্বশুরবাড়িতে।

এতকাল বাদে সেই হাসিদিকে সম্পূর্ণত দেখলাম, একেবারে অন্য পরিবেশে, একেবারে অন্য রূপে। কিন্তু হাসিদিকে দেখামাত্রই আমার বুকের মধ্যেকার ছবিটা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। এই হাসিদির সঙ্গে আমার আঁকা ছবির হাসিদির অনেকটাই ফারাক।

এককালে যে বেজায় রূপসি ছিল, সেটা বোঝা গেলেও উপস্থিত আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রামাঞ্চলের একজন মধ্যবয়স্কা গিন্নিবান্নি মহিলা। বেশ মোটাসোটা গড়ন। গায়ের রংটি ফর্সা হলেও নিয়মিত পরিচর্যার অভাবে কিঞ্চিৎ মলিনতা সেই রঙে। বিস্রস্ত খোঁপা। মাথার চুলগুলো এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে মুখের আশপাশে। দামি শাড়ি আর ভারী ভারী গয়নাগুলো নেই ওর গায়ে। শরীরের সেই ঝকঝকে ভাবটি, যা সেদিন দেখেছিলাম পেয়ারা গাছের আড়াল থেকে, তার অনেকটাই উধাও। চৈত্রের এই দুঃসহ গরমে তার মুখে, ঘাড়ে, গলায় থিকথিকে ঘাম। মাথার চুলে দুয়েকটি পাকা চুলও উঁকি মারছিল। একটা লাট-খাওয়া তাঁতের শাড়ি খুব আটপৌরে ঢংয়ে পায়ের গোড়ালির বেশ ওপর অবধি পরেছে হাসিদি। গোটা শাড়ি জুড়ে এখানে ওখানে হলুদের ছোপ। গলা থেকে যে পুরুষ্টু বিছেহারটি ঝুলছে, তার খাঁজে খাঁজেও ময়লা কম নয়। দু'বাহুতে লাল সুতোয় বাঁধা একাধিক কবচ-মাদুলি। কপালে সিঁদুরের ঢাউস টিপটি ঘাম লেগে ঘেঁটে গিয়েছে। আর, সারা মুখে লেপটে রয়েছে একজাতের ক্লান্তি। না, কোনও দুঃখকষ্ট লেপটে ছিল না সেই মুখে, সারা শরীরে থোকা থোকা ফুল নিয়েও, কেবল দীর্ঘসময় রোদ্দুরে থাকবার দরুন, আহ্লাদি লতাটির সামান্য ঝিমিয়ে পড়া বুঝি। সেই ঝিমিয়ে পড়াতেও বুঝি তৃপ্তির কিছু কমতি ছিল না।

বেশ বোঝা গেল, তখনও অবধি স্নান-খাওয়া তো হয়নিই, বরং আমরা পৌঁছনোর মুহূর্তে বাড়ির মধ্যে কোনও কিছুতে ব্যস্ত ছিলেন হাসিদি, আমাদের দেখামাত্তর সেটা অসম্পূর্ণ রেখে দৌড়ে এসেছেন। কেন কি, হাসিদির ভুরুজোড়ায় দেখলাম মৃদু কুঞ্চন, আর চোখের তারায় দেখলাম একজাতের অস্থির-অস্থির ভাব। বাপের বাড়ির সবাইয়ের কুশল শুধোচ্ছে, আমাদের মাথায় স্নেহের হাতটি বুলিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝেই, কিন্তু অস্থির চোখের তারাদুটি চারপাশের অনেককিছুর ওপর পিছলে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। একফাঁকে অন্দরমহলের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল, ডালটা সিদ্ধ হইল কিনা দ্যাখ তো রে মাধবী। ও শেফালি— বাচ্চাগুলোকে খেতে বসিয়ে দে জলদি। বলতে বলতে আমাদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে হাসিদি, ইস্কুল থিকে ফিরেছে তো, খিদা পেয়েছে অদের। বলতে বলতে দূরের সবজি-খেতের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে ওঠে হাসিদি, হা-দ্যাখ, রাখাল-জেঠাদের পাড়াবেড়ানো গাইটা ফের ঢুকিয়া পড়ছে সবজির খেতে। জনার্দন কাকাকে কদিন ধরিয়া বলতিছি, ওখানকার বেড়াটা ভাঙিয়া গেছে, মেরামত করিয়া দাও, কথা যদি শুনে—। বলতে বলতে খালি পায়ে দৌড়তে থাকে হাসিদি সবজি-খেতের দিকে।

ওইবেলায় আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবার ফুরসৎ পেল না হাসিদি। আমরা চান করে খেয়েদেয়ে যখন বিছানায় গড়াতে চলেছি, সে তখন শাশুড়িকে ওষুধ খাইয়ে, ভেতর-বারান্দায় খেতে বসা মুনিশ-কামিনদের দু'কিস্তি পরিবেশন সেরে, আমাদের পরিবেশনের তদারকি করতে করতে শিলনোড়ায় ভেজা ছোলা গোছের কিছু বেটে চলেছে। ওকে ওই অবস্থায় দেখতে দেখতে আমরা হাসিদির বড়ছেলে বাপ্পার সঙ্গে শুতে চলে গেলাম দোতলায়।

পড়ন্ত বিকেলে যখন নামলাম নীচে, ভেতর-বারান্দার একপ্রান্তে দু'জায়ের সঙ্গে খেতে বসেছে হাসিদি। খাওয়ার ফাঁকে খুব গল্প জুড়েছে তিনটিতে। আমাদের দেখামাত্তর মিষ্টি করে হাসল হাসিদি, কী রে, ঘুম হয়্যাল-অ? বলতে বলতে পশ্চিম আকাশের পানে অপাঙ্গে

তাকিয়েই আঁতকে ওঠে হাসিদি, ইস, বেলা আর এক্কেরে নাই রে মেজো! এখনও অবধি রাজ্যের কাজ পড়িয়া আছে। বলতে বলতে তড়িঘড়ি পাত গোটাতে শুরু করে তিনজনাই। বাপ্পার সঙ্গে আমরা পায়ে পায়ে সদর-উঠোনের দিকে এগোই।

বিশাল সদর-উঠোনে আমরা কয়েকজনায় মিলে সারা বিকেল রবারের বল খেললাম। খেলার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করছিলাম, সামান্য একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে হাসিদি ফের নেমে পড়েছে কাজে। একে একে সবজির খেতগুলোতে জল দিল তিনজায়ে মিলে, ভেতর-বারান্দা ও ভেতর-উঠোনটিতে ঝাঁটপাট দিল। খাঁচার টিয়েটিকে দানাপানি দিল, তারপর সদর-উঠোনের একপ্রান্তে রাখা সারি সারি সিমেন্টের গামলায় কুঁড়ো, আমানি, লাউয়ের খোসা আর চিটেগুড় দিয়ে গাইগুলোর জন্য জাবনা বানাতে লাগল। তারপর ঝাঁটিকাঠের উনুন জ্বালিয়ে লোহার কড়াইতে খুদের জাউ বানাতে বসল হাঁসগুলোর জন্য। একটুবাদেই বাড়ির বাগাল গাইগরুগুলো চরিয়ে ফিরল, আর, খিড়কির পুকুর থেকে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে একডজন হাঁস এসে ঘিরে দাঁড়াল হাসিদির চারপাশে। হাসিদি একে ধমকায়, তাকে বকে, কিনা, থাম থাম, সবুর যেন আর সইছেনি তদের! অ্যাতোই যদি খিদা, তবে দিনভর পুকুরে থাকিয়া তরা করলিটা কী!

একসময় জাউয়ের কড়াই নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিল হাসিদি। গাইগুলো ততক্ষণে জাবনা খেতে শুরু করেছে। হাসিদি এ গামলায় গিয়ে জাবনাগুলো হাত দিয়ে মাখিয়ে দেয়, ও গামলায় গিয়ে হাত দিয়ে খানিক জাবনা তুলে ধরে দেয় গাইটার মুখের কাছে। তৎসহ চলতে থাকে অবিরাম গজগজানি, কিনা, আহা, আহ্লাদি, মুখের সুমুখে ধরিয়া না দিলে খাওয়া হয় না! রাতটি পুহালে তো চলিয়া যাব আমি, তখন কে মুখের সুমুখে খাবার ধরিয়া দেয়, দেখব। এরপর হাসিদি ভেতর উঠোনে হাঁসগুলোকে জাউ খাওয়ায় আর জা'দের উদ্দেশে মুহুর্মুহু পাঠাতে থাকে হাজারো নির্দেশ, কিনা, ও মাধবী, খিড়কির উঠোন থিকে শুকনো কাপড়গুলো তুলিয়া লিয়া যা। ও শেফালি, খিড়কিঘাট থিকে বাসনগুলো লিয়া আইলি? সবগুলা হাতা-চামচ আইল তো, নাকি অর্ধেক পড়িয়া রইল জলে! মাধবী রে, বেলা থাকতে খেত থিক্যা গোটাকয় বেগুন তুলিয়া আনিয়া রাখ তো, সইন্ধ্যায় বেগুনি ভাজব, ছেইলাগুলা মুড়ি খাবে। ও শেফালি, মাকে বিকালের ওষুধটা দিলি, নাকি ভুলিয়া মারিয়া দিছু?

এরপর হাসিদি বালতি নিয়ে দুধ দুইতে বসল। একে একে চারটে গাইয়ের দুধদোয়া শেষ হতে হতে ঘনিয়ে এল সন্ধে। বাড়ির বয়স্ক

ও গামলায় গিয়ে হাত দিয়ে খানিক জাবনা তুলে ধরে দেয় গাইটার মুখের কাছে। তৎসহ চলতে থাকে অবিরাম গজগজানি, কিনা, আহা, আহ্লাদি, মুখের সুমুখে ধরিয়া না দিলে খাওয়া হয় না! রাতটি পুহালে তো চলিয়া যাব আমি, তখন কে মুখের সুমুখে খাবার ধরিয়া দেয়, দেখব।

মুনিশ জনার্দনকে গোয়ালে খড়ের ধোঁয়া দেবার নির্দেশ দিতে দিতে হাসিদি প্রায় দৌড়তে লাগল অন্দরমহলের দিকে, কেন কি, ততক্ষণে তুলসিতলায় সন্ধেপ্রদীপ দেবার সময় অতিক্রান্ত প্রায়। ভেতর থেকে ছুটন্ত হাসিদির গলা ভেসে এল, ও মাধবী, প্রদীপে সলতে আর তেলটা দিয়েছু তো? শাঁখটা জলদি লিয়া আয় রে, সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল!

সন্ধের পর আমরা হাত-পা ধুয়ে ভেতর উঠোনে মাদুর পেতে বসলাম। আর, দেখতে লাগলাম, হাসিদি আর ওর জায়েদের সান্ধ্যকালীন কাজকর্ম। ততক্ষণে একজনায় দুধ ফোটাতে লেগেছে তো অন্যজন মশলা পিষতে লেগেছে। একজন মাছ বাছছে তো অন্যজন আমাদের জন্য বেগুনি ভাজতে লেগেছে। তারই ফাঁকে চটপট খানকয় রুটি বানিয়ে গরম দুধসহ হাসিদি দৌড়ল শ্বশুর-শাশুড়ির শোবার ঘরে কিনা, সন্ধেয় সন্ধেয় ওদের রাতের খাওয়াটা খাইয়ে দিতে হবে।

হাসিদির পিছু পিছু পায়ে পায়ে গেলাম ওই ঘরে। দেখলাম, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে দুধের বাটিদুটো নামিয়ে রেখে রুটিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দুধের মধ্যে ফেলতে লাগল হাসিদি। একসময় কানে-কালা শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলে উঠল, কাল সকালে আমি তো চলিয়া যাচ্ছি বাবা।

হাসিদির কথায় ফ্যালফ্যাল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে বুড়ো। হাসিদির কথাগুলো বোধগম্য হয় না বুঝি। তাই দেখে হাসিদি গলাটাকে আরও একটুখানি চড়ায়, শুনতে পাচ্ছো? কাল সকালে চলিয়া যাচ্ছি আমি।

বুড়োর চোখের তারা বুঝি সামান্য কেঁপে ওঠে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, কো-থা-য়?

— কাল বাপের বাড়ি যাচ্ছি যে। গলাটাকে সমানে চড়িয়ে বলতে থাকে হাসিদি, ওখানে চড়কের মেলা লেগেছে। কতদিন যাইনি তো।

হাসিদির কথায় প্রায় শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে বুড়ো। ঘোলাটে চোখের তারায় একজাতের মৃদু অস্থিরতা শুরু হয়। হাসিদির এমনতরো ঘোষণায় স্পষ্টতই বিপন্ন লাগে বুড়োকে।

শ্বশুর-শাশুড়িকে খাইয়ে-দাইয়ে ওষুধ দিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসে হাসিদি। এরপর সারাটা সন্ধে চলে রান্নাবান্না, দইপাতা, খেতে দেওয়া, হাড়িকুঁড়ি বাসনকোসন তুলে রাখা, রান্নাঘরটি নিকোনো। ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে স্বামী, দেওর, জা' ও ছেলেপুলেদের উদ্দেশে অবিরাম উপদেশ নির্দেশ, কিনা, মেজো ঠাকুরপো, মা'র বাতের তেলটা ফুরিয়া গেছে, কালই যেন মনে করিয়া আনবে উটা। জনার্দন-কাকা, গুয়ালে এত পা ঝাপটাচ্ছে কে, একটুখানি দেখিয়া আইসো তো। ছোট ঠাকুরপো, কাল কজন মজুর লাগবে খেতের কাজে, এইবেলা কইয়া দাও দেখি, অদের জলখাবারের বন্দোবস্তটা সারিয়া রাখিয়া যাই। মাধবী, শুন, মজুরদের মুড়ির সঙ্গে লৈতন তেঁতুলগুলা দিবিনি। পাশের হাঁড়ি থিকে গত বছরের পুরানোগুলাই দিবি। উগুলান তো আগে শেষ হোক। আর, আচারের আমগুলা শুকিয়া গেছে। সময়মতো তেল আর মশলা দিয়া রোজ রোদ্দুরে দিবি। আর মাধবী, শেফালি, বিকালে সবজি-খেতে জল দিতে যেন ভুলিসনি। আর হ্যাঁ, কালী গাইটার পিছের পা না বাঁধিয়া যেন দুইতে যাসনি, বড্ড পা ছাটে মাগি। ও জনার্দন-কাকা, এইবেলা লোহার ধানসিদ্ধ কড়াইটা ভিতরে আনিয়া রাখিয়া দাও না গো, ধান তো সিদ্ধ করা হইলনি, বাইরে পড়িয়া রইল, মাঝের থিকে অটা চোরের ভোগে যাবে। একসময় নিজের ও জায়ের ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে খরগলায় বলে ওঠে হাসিদি, কদিন থাকবোনি। ঠিক সময়ে যেন পড়তে বসা হয়। আর, ঠায় দুপোরে যদি বাড়ির বাইরে বারাতে শুনি, ফিরিয়া আইসিয়া এক-একটাকে উঠানের আমগাছের ডালে বাঁধিয়া পিটব।

আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম। নতুন জায়গায় ঘুম আসতে চাইছিল না। ফলে, সারাক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম একতলায় বাসনকোসন হাঁড়িকুড়ির আওয়াজ আর জায়েদের প্রতি হাসিদির অবিশ্রাম পরামর্শগুলি।

অনেক রাতে শোবার ঘরে এল হাসিদি। আমি তখনও অবধি ঘুমোইনি। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম, পাশের কামরা জুড়ে

হাসিদির হেঁটেচলে বেড়াবার শব্দ। নিজের শোবার ঘরের মধ্যে কীসব করে চলেছে হাসিদি। শুনতে পাচ্ছিলাম বাক্সো-তোরঙ্গ খোলা-বন্ধ করবার আওয়াজ। একবার নিজের স্যান্ডেলজোড়া বাইরে এনে ধুলো ঝাড়ল। কী কারণে যেন ধুপধাপ আওয়াজ করে নেমে গেল একতলায়, একটুবাদেই ফিরে এল। বুঝতে পারছিলাম, সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব সাঙ্গ করে এতক্ষণে হাসিদি কালকের জন্য গোছগাছ শুরু করেছে।

কতক্ষণ সেই গোছগাছ-পর্ব চলেছিল কে জানে, কারণ, একটুবাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। রাত পোহালেই সকাল-সকাল রওনা দিতে হবে আমাদের। বেরোতে দেরি হলেই চৈত্রের খর রোদ্দুর ঝাঁ-ঝা করে বেড়ে যাবে।

যখন ঘুম ভাঙল ভোরবেলায়, একতলা থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম হাসিদির চড়া গলার কথা। কাদের উদ্দেশে যেন সমানে উপদেশ দিয়ে চলেছে সে।

একসময় নীচে নেমে এসে দেখলাম, ওই সাতসকালে হাসিদির চান সারা। মজুরদের জন্য জলখাবারের মুড়ি সাজাতে বসেছে সে। ওই ফাঁকে জায়েদের উদ্দেশে দিয়ে চলেছে হাজার কিসিমের উপদেশ।

জলখাবার খেয়ে একসময় তৈরি হলাম আমরা। ভাগ্নে-ভাগ্নিদের সঙ্গে যাবার জন্য কাল থেকে অনেক উমেদারি করেছি আমরা দুজনায়। কিন্তু তাদের স্কুলে যেহেতু ছুটি পড়েনি, ফি-বিকেলে যেহেতু মাস্টার আসবেই পড়াতে, আর, গ্রীষ্মের ছুটির পরপরই যেহেতু ফার্স্ট-টারমিনাল পরীক্ষা, আমাদের সব ধরণের অনুরোধ-উপরোধ না-মঞ্জুর হয়ে গেছে কালই।

একসময় হাসিদি চটজলদি কিছু খেয়ে নিল। তারপর চলে গেল দোতলার শোবার ঘরে। একটু বাদে যখন নামল, মুখ-টুখ সাফসুতরো করে, চুলটুল বেঁধে-টেধে, পায়ে আলতা পরে, দামি শাড়ি আর গা-ভর্তি গয়নায় হাসিদির তখন একেবারেই অন্য রূপ।

শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে, একে-তাকে একেবারে শেষমুহূর্তের কিছু প্রয়োজনীয় কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়ে একসময় গাড়িতে উঠে বসে হাসিদি। তখনও তার চোখেমুখে সেই অস্থির চাউনি আর ভুরুজোড়ার মধ্যেখানটা কুঁচকে রয়েছে এক জাতের দুর্ভাবনায়।

একেবারে শেষ মুহূর্তে জনার্দন কাকার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, কালী গাইটা কাল কেন জানি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁটছিল। খুরের খাঁজে ঘা-টা হইল না কী... একটিবার ভবতারণ কাকাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাবে তো জনার্দন কাকা।

ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে আমাদের গাড়ি।

লাল মোরামের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। পথের দু'ধারে একফসলা ধানের খেতগুলো খাঁ-খাঁ। দূরে দূরে একেবারে দিগন্তের গা ঘেঁষে কালচে গ্রামগুলি। রাস্তার দু'ধারে সরকার থেকে গাছ লাগিয়েছে সারি সারি। আকাশমণি গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় কাঁপন তুলেছে হাওয়া। একসময় বীরকাঁড়ের জঙ্গলের গায়ে গায়ে চলতে লাগল গাড়ি।

পরানপুর গাঁ ছাড়িয়ে ঘণ্টাটাক চলার পর আমাদের গাড়ি একসময় কাঁচা রাস্তা ছেড়ে পিচরাস্তাকে ছুঁল।

বেলদা থেকে মেদিনীপুরের দিকে চলে গিয়েছে রাস্তাটা। কিন্তু আমরা পিচরাস্তা ধরে যাব না। বরং পিচরাস্তাটাকে ফুঁড়ে আবার ধরব গাঁয়ের মোরাম রাস্তা। ওদিক দিয়েই আমাদের গ্রাম শর্টকাট।

যেখানে আমরা পাকা রাস্তাটাকে পেরিয়ে চলে যাব, জায়গাটা নেহাৎই একটা বাসস্টপ। চারপাশে লোকালয় বড় একটা নেই। রাস্তার ধারে একটা ঝাঁকড়ামতো বট গাছ, তার তলায় দুতিনটি গুমটি-দোকান। তার মধ্যে একটা তেলেভাজার দোকান। দেখলাম, কলকলিয়ে পেঁয়াজি-ফুলুরি তপ্ত তেলে হাবুডুবু খাচ্ছে। এখানেই আমরা জলখাবার খাব। গরম তেলেভাজা সহযোগে মুড়ি। মাধবদা বটের তলায় গাড়ি থামায়। ঘটি নিয়ে দূরের কুঁয়ো থেকে থেকে জল ভরতে যায় সে। আমরা দু'বন্ধুতে দোকানের দিকে রওনা দিই তেলেভাজা কিনতে। হাসিদি পিছন থেকে বলে ওঠে, আলুর চপ পেলেও লিয়া আসবি।

বটের তলায় বসে বসে আমরা তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি খেলাম অনেকক্ষণ ধরে। তখনই লক্ষ করছিলাম, হাসিদির মুখমণ্ডলের ওই দুর্ভাবনার রেখাগুলি মুছে যাচ্ছে একটু একটু করে। ভ্রূসঙ্গমের ভাঁজগুলিও প্রায় উধাও। বেশ ফুরফুরে লাগছে ওকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার রওনা দিলাম আমরা। এরপর আমরা পুরোটাই যাব কাঁচারাস্তা দিয়ে। পথে পড়বে বহুরূপা গাঁ, বীরকাঁড়ের জঙ্গল আর কেলেঘাই নদী, এই শেষ চৈত্রে নদীটা মরা সাপের মতো শুয়ে রয়েছে একটুখানি সোঁতা হয়ে চওড়া বালুচরের ওপর।

লাল মোরামের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। পথের দু'ধারে একফসলা ধানের খেতগুলো খাঁ-খাঁ। দূরে দূরে একেবারে দিগন্তের গা ঘেঁষে কালচে গ্রামগুলি। রাস্তার দু'ধারে সরকার থেকে গাছ লাগিয়েছে সারি সারি। আকাশমণি গাছের ঝিরিঝিরি পাতায় কাঁপন তুলেছে হাওয়া। একসময় বীরকাঁড়ের জঙ্গলের গায়ে গায়ে চলতে লাগল গাড়ি।

ফুরফুর করে হাওয়া বইছে। চারপাশে ফাঁকা ফাঁকা খেতমাঠ, দূরে দূরে গ্রামগুলি। সব মিলিয়ে বেশ লাগছিল।

আমাদের গরুর গাড়ি বহুরূপা গাঁ'টা ছাড়াতেই একটু একটু করে খোলস ছাড়তে শুরু করল হাসিদি। তার মুখমণ্ডলে কিছু পরিবর্তন ঘটতে লাগল একটু একটু করে। খুবই শ্লথগতিতে। কাল থেকে সারাক্ষণ কুঁচকে থাকা ভ্রূসঙ্গম একটু একটু করে মসৃণ হয়ে এল। দায়িত্বের গুরুভারে সর্বক্ষণ অস্থির চোখের তারায় একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল সেই জাতের অভিব্যক্তি, ঠোঁটজোড়ায় ফুটে উঠতে লাগল সেই জাতের আহ্লাদিপনা, যা সাধারণত অবিবাহিতা সদ্য-প্রস্ফুটিতাদের চোখের তারায় দেখতে পাই। কথায় কথায় হেসে উঠছিল হাসিদি। দু'চারটে মজার কথাও বলছিল। আমার মায়ের সঙ্গে একত্রে তার দুষ্টুমির গল্প, রানিহাঁস দিঘির পাড়ে বনভোজনের গল্প, মা'দের লুকিয়ে সাবিত্রীদের বাড়িতে রেডিওয় অনুরোধের আসর শুনতে যাবার গল্প...। যেন কতকাল ধরে সযত্নে লুকিয়ে রাখা যষ্টিমধুটিকে নিঃশব্দে চুষছিল হাসিদি। সব মিলিয়ে অনেক নির্ভার লাগছিল তাকে। অনেক দায়মুক্ত মনে হচ্ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল, কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে হাসিদির বয়েসটা বুঝি কমে গিয়েছে অন্তত এক যুগ। গতকালের হাসিদির সঙ্গে এই মুহূর্তের হাসিদির বয়েসের ফারাক বুঝি অন্তত দশ-বারো বছর।

গরুর গাড়িতে আমরা তিনজন। হুহু করে ধেয়ে আসছে জঙ্গলের উদোম হাওয়া। হাসিদির চুলগুলো এলোমেলো হয়ে বারবার লেপটে যাচ্ছে মুখের ওপর।

চারপাশটাকে খুব তৃপ্তিভরে দেখতে দেখতে একসময় হাসিদি বলল, তোরা গান জানিসনি?

— না। খুব কুণ্ঠিত গলায় বলি, কিন্তু তুমি

ওই মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে এক সুতনুকা অষ্টাদশী, পুরুষোত্তমপুর গাঁয়ের কোনও নিরালা জায়গায়, হয়তো-বা রানিহাঁস দিঘির পাড়ে, কোনও বিশেষ একজনের গায়ের সঙ্গে নিবিড় হয়ে বসে, দু'চোখের তারায় অতলান্ত আকুতি নিয়ে তারই উদ্দেশে গেয়ে চলেছে এমন গান।

তো খুব ভালো গান গাইতে হাসিদি। মেজদিদের মুখে শুনেছি। একটা গান গাও না। আমরা বায়না ধরি।

চোখেমুখে সপ্তদশীর লজ্জা ফুটিয়ে হাসিদি বললেন, কতকাল আগে গাইতাম, এখন কি সেসব মনে আছে? সংসারে জুয়াল কাঁধে লিয়া গান-টান সবকিছু...।

বলতে বলতে হাসিদি একসময় সসঙ্কোচে ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করল একটা ভাঁজ করা কাগজ। খুবই পুরনো কাগজ, একেবারে লালচে হয়ে গিয়েছে। আর, দীর্ঘদিন ভাঁজ হয়ে থাকার দরুন বেশ বিবর্ণ, বিধ্বস্ত অবস্থা তার। মনে হচ্ছিল যেন গোয়েন্দা গল্পের বইতে পড়া কোনও গুপ্তধনের নকশা।

এতদিন ওটা যখের ধনের মতো আগলেছে হাসিদি।

একসময় হাসিদি কাগজটি সাবধানে খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে। কাগজের বুকে জেগে থাকা বিবর্ণ লেখাগুলির ওপর চোখদুটো বিঁধিয়ে রেখে মিহি গলায় গুনগুনিয়ে গান ধরল—

তুমি আজ কতদূরে, তুমি আজ কতদূরে—
আঁখির আড়ালে চলে গেছ তবু রয়েছ হৃদয় জুড়ে,
তুমি আজ কতদূরে—।

প্রাক-মধ্যাহ্নের বুনো হাওয়ায় হাসিদির মিহি গলার সুর মিশে যাচ্ছিল নিঃশেষে। একসময় আমরা পেরিয়ে এলাম জঙ্গলটা। হাসিদি তন্ময় হয়ে গেয়েই চলেছে

— যাবার বেলায় হাতদুটি ধরে, বলেছিলে— চিঠি দিও,
বলেছিলে তুমি চিঠি দিও মোরে,
দূর থেকে তাই গানের লিপিকা লিখে যাই গো— লিখে যাই সুরে সুরে—
তুমি আজ কতদূরে—।

এই মুহূর্তে তার চোখমুখ থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে একটু আগের যাবতীয় অস্বস্তি, লজ্জা। নিজের মধ্যে যেন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে সে। পিছনে পড়ে থাকা দূরবর্তী অরণ্যের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে যেন অন্য এক রাজ্যে হারিয়ে যেতে থাকে সে। যেন ওর পাশটিতে তখন আমি নেই, নিখিল নেই, মাধব সিং নেই, এমনকী, একটু আগে অবধি দেখা হাসিদিও নেই...। ওই মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে এক সুতনুকা অষ্টাদশী, পুরুষোত্তমপুর গাঁয়ের কোনও নিরালা জায়গায়, হয়তো-বা রানিহাঁস দিঘির পাড়ে, কোনও বিশেষ একজনের গায়ের সঙ্গে নিবিড় হয়ে বসে, দু'চোখের তারায় অতলান্ত আকুতি নিয়ে তারই উদ্দেশে গেয়ে চলেছে এমন গান। বুকের কোন অচেনা খোপ থেকে বুঝি এইমাত্র ছাড়া পেয়েছে বুক-নিংড়ানো বিরহের গানটি।

কতদিন ধরে সেই সুতনুকা অষ্টাদশী বুকের কোন অচেনা কোটরে লুকিয়ে রেখেছে গানের গুটিকয় কলি, প্রাণপণে আগলে রেখেছে, নরম ফুলের মতো, যাতে চারপাশের খর-রোদ্দুরের ঝাঁঝে শুকিয়ে না যায়। হয়তো-বা এই দীর্ঘ সময় ধরে সংগোপনে শীতল বারি সিঞ্চন করে গেছে সবার অগোচরে। বুকের কোন গোপন উদ্যানে সংগোপনে লুকিয়ে রাখা গানের সেই কলিগুলি অনুকূল হাওয়া পেয়ে বুঝি এই মুহূর্তে পদ্মের কুঁড়ির মতো একটু একটু করে পাপড়ি খুলতে চাইছে আমাদের চোখের সামনে। হয়তো-বা ওর মনের অতল প্রদেশে কাঁপন তুলেছে পদ্মের ভিরু কোরকগুলি।

বাঘ দেখা

পাখিরালা। তার পোশাকি নাম পাখিরালয়। অর্থাৎ কিনা, পাখির আলয়।

লঞ্চঘাটাতে কাঠের জেটি। জেটির দু'ধারে উঁচু রেলিং। জেটি পেরিয়ে উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপারে কাঁচা রাস্তা।

ভার্মা সাহেবের পুরো দলটা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে নদীটাকে দেখছিলেন। জেটির গায়ে ওঁদের সরকারি লঞ্চখানা দুলছিল।

বিকেল গড়িয়ে আসছে। চোখ ফেরালে দূরে দেখা যায় কালচেপানা সজনেখালি। ততক্ষণে আঁধার মাখতে শুরু করেছে সে।

এই শীতের মরসুমে এই অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের ভিড় মন্দ হয় না। নদীর জলে ভার্মা সাহেবদের লঞ্চটার কাছাকাছি আরও কয়েকখানা লঞ্চ।

বাঁধের গা ঘেঁষে যে কাঁচা রাস্তাটা, তার দু'পাশে গজিয়ে উঠেছে কিছু পান-সিগারেট, চা-তেলেভাজার দোকান। নেহাতই মরসুমী দোকান ওগুলো। লঞ্চ থেকে নেমে ট্যুরিস্টদের দল এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকল করছে বাচ্চারা, পাশের পান-সিগারেট, লজেন্স-বিস্কুটের দোকান থেকে ললিপপ কিনছে। বয়স্করা চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা-মামলেট খাচ্ছে। ভার্মা সাহেব জানেন, এরা আর অধিকক্ষণ থাকবে না। এদের একটা অংশ গিয়ে ডেরা পাতবে সজনেখালির ট্যুরিস্ট লজে। বাকিরা যে-যার লঞ্চের মধ্যেই রাত কাটাবে কেবিনে। এসব লঞ্চে তেমন ব্যবস্থা থাকে।

ভার্মা সাহেব সঙ্গের মানুষগুলির দিকে তাকান। আপাত-পরিতৃপ্ত মুখগুলির আড়ালে বুঝি সামান্য আশাভঙ্গের বিষাদ। অথচ সকালে যখন শুরু হয়েছিল যাত্রা, প্রত্যেকের মুখ চকচক করছিল খুশিতে। দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছিল লঞ্চ। সারেঙের কেবিনের সামনে কাঠের প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের ওপর জাজিম পাতা ছিল। তাকিয়াও দু'তিনটে। তাতে এলিয়ে বসেছিলেন মিসেস ভার্মা, মিসেস চতুর্বেদী, মিসেস পালও। দু'পাশের সারবন্দি গার্ডেন-চেয়ারে বসেছিলেন ভার্মা সাহেব, মিঃ অরবিন্দ চতুর্বেদী, দু'সাহেবের তিনটে ছেলেমেয়ে গায়ত্রী, রিঙ্কি আর ডন। পালসাহেবের জন্যও নির্দিষ্ট ছিল চেয়ার, কিন্তু তিনি বসবার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। অতিথিদের জন্য চা-কফি, প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে ঘনঘন ওঠা-নামা করতে গিয়ে ওই শীতের সকালেও তাঁর কপালে, নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু ঘাম...। ভার্মাসাহেব সর্বসমক্ষে বার

দু'তিন মিঃ পালের উদ্দেশে 'আজকের ট্রিপে আমাদের গার্জিয়ান অ্যান্ড গাইড' বলে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ট্রিপের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ঝক্কি তিনি অনুগ্রহ করে মিঃ পালের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর, মিঃ পাল, রাজ্য সিভিল সার্ভিসের একজন বিশ বছরের সিনিয়রিটি-সম্পন্ন অফিসার, সারাক্ষণ চোখেমুখে এক ধরণের চৌকস ভাব ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। মিঃ ভার্মা যখন অতিথিদের সঙ্গে তাঁর ঘটা করে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁকে সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি একেবারে নিশ্ছিদ্র করে তুলতে হবে। কেন কি, 'মিঃ পাল থাকলে আর আমাদের কোনওই ভাবনা নেই, উনি একাই একশো'... পিওন-চাপরাশীদের সামনে উচ্চারিত ভার্মাসাহেবের স্তুতিবাক্যগুলি সারাক্ষণ চরকার মতো ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ তুলেছে মিঃ পালের মগজে। আর, তার ফলে, মিউজিক-সিস্টেমে মৃদু সেতার বাজতে শুরু করেছে রবিশঙ্করের, উচ্চাঙ্গের প্রাতরাশ, ফিনফিনে পোর্সিলিনের প্লেটে, ...তৎসহ চা-কফি, কাজু..., এবং বেলা সামান্য চড়তেই মহিলা ও বাচ্চাদের জন্য পেপসি, এবং সাহেবদের জন্য দামি হুইস্কি। দেখতে দেখতে পুলকিত উচ্ছ্বসিত অরবিন্দ চতুর্বেদীর চোখদুটি চকচক করে উঠেছে বারবার। আজ ধামাকাটা জমে যাবে!

ভার্মাসাহেব জিভ কেটে বলেন, ছিঃ, ধামাকা বলে না। এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্যুর। সুনডোরবোনের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এর ওপর।

প্রশ্নটা বাঁচা-মরার বলেই সম্ভবত মিঃ চতুর্বেদী সামান্য মনোযোগী হন, ব্যাপারটা একটুখানি বুঝিয়ে বল ইয়ার।

তখন কাজু সহযোগে হুইস্কি পান চলছিল। জাজিম-পাতা প্ল্যাটফর্মের ওপর সুদৃশ্য ট্রেতে হুইস্কির জোড়া-বোতল এবং মিনারেল ওয়াটার, হাতে হাতে ফিনফিনে কাচের গ্লাসগুলি,... রোদ্দুর পড়ে ঝিলিক মারছিল ওদের শরীরে। আর, মিঃ পালের ব্যস্ততা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। লঞ্চের নীচের তলা থেকে পারসে মাছ ভাজবার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল নোনা হাওয়ায়। ভার্মাসাহেব মাঝে মাঝেই বলে উঠছিলেন, অ্যাতো ছোটাছুটি করছেন কেন, পাল? চেয়ার খালি রয়েছে, বসুন। এনজয় করুন।

খুব গদগদ হাসিতে মুখ ভরিয়ে মিঃ পাল বলে ওঠেন, এনজয় তো করছি স্যার।

মিঃ চতুর্বেদী খুব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান মিঃ ভার্মার দিকে, সকলের এনজয় করবার ধরণ তো একরকম নয়, ইয়ার।

— না, না, সবাই তো আমরা এনজয় করতেই এসেছি...। বলেই পরমুহূর্তে তা ভুলে গিয়ে মিঃ পালকে একটা ফরমায়েশ করে বসেন মিঃ ভার্মা।

> লঞ্চ চলছিল ঢিমেতালে। হাওয়া বইছিল ফুরফুরিয়ে। চোখের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে সরে-সরে যাচ্ছিল প্রকৃতি। বাইনোকুলার ঘনঘন হাত বদল হচ্ছিল। ক্যামেরায় সাটার টেপা চলছিল ঘনঘন। হুইস্কির বোতলটা খুলতে খুলতে চতুর্বেদী বলেছিলেন, রাতে কি লঞ্চেই থাকছি?

হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ভার্মা সাহেব আজকের ট্যুরটার গুরুত্ব বোঝাতে থাকেন চতুর্বেদীকে। বলেন, এনটায়্যার সুনডোর-বোনের টোট্যাল রিসোর্সেস, তার ল্যান্ড, ওয়াটার, ফ্লোরা, ফোনা, তার একজিস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ...টেকেন টুগেদার... একটা ইন্টিগ্রেটেড প্রোজেক্ট ফর টোট্যাল ডেভলপমেন্ট... ভার্মা সাহেব আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন, একটা মিটিং ডেকেছি সজনেখালির ট্যুরিস্ট লজে। যেসব গভমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এই এলাকায় কাজ-টাজ করছে, সবাইকে ডেকেছি। সবাই মিলে একসঙ্গে ভাবতে হবে। একটা কনসার্টেড এফোর্ট চাই। আফটার অল, একা-একা মানুষের ভালো করা যায় না। এ সিঙ্গল স্প্যারো কান্ট ব্রিং দ্য স্প্রিং।

মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদীর মন ছিল না ওসবে। কতক্ষণ আর ওইসব ভারী ভারী আলোচনা চালাবে বাপু!

মিসেস চতুর্বেদী বলে ওঠেন, মানুষের ভালো করবার কথা বলছো, সুনডোরবোনে আবার মানুষও থাকে নাকি?

মিসেস পাল, পাশেই বসে রয়েছেন বটে, কিন্তু দুই মহিলা কেবল নিজেদের মধ্যেই গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন সারাক্ষণ। মিসেস পালের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলছেন। মিসেস পাল চুপটি করে বসে বোবার মতো শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা। মিসেস চতুর্বেদীর প্রশ্নটা শুনে কথা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে যান বুঝি। বলেন, সে কি! সুন্দরবনে মানুষ থাকে না?

মিসেস চতুর্বেদী আকাশ থেকে পড়েন, আমরা তো চিরকাল শুনে আসছি, সুনডোরবোনে বাঘ থাকে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

শোনামাত্রই বাচ্চাগুলোর গা-ছমছম উচ্ছ্বাস, বাঘ দেখতে পাব তো আঙ্কেল?

ভার্মাসাহেব মৃদু হেসে এড়িয়ে যেতে চান প্রসঙ্গটা। তাই দেখে মহিলাকুল নাছোড়বান্দা।

মিসেস ভার্মা ভ্রূসঙ্গমে অপরূপ ঢেউ তুলে বলেন, তুমি কিন্তু এদের কমিট করেছ। ইউ প্রমিসড...!

অরবিন্দ চতুর্বেদী হলেন ভার্মা সাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে পড়াশোনা। একটা বিশাল প্রাইভেট কোম্পানির ভারী অফিসার চতুর্বেদী। বছর দুয়েক আগে কলকাতায় বদলি হয়ে আসায় দু'বন্ধুতে একেবারে নরক গুলজার। চতুর্বেদীর স্ত্রী গায়ত্রীও কবে কবে খুব বন্ধু হয়ে গেছে মিসেস ভার্মার। সেই কারণেই জেলাসদরে বদলি হয়ে আসার পর থেকেই চতুর্বেদীকে তাড়া দিচ্ছিলেন ভার্মা সাহেব, চলে আয়, তোদের সুনডোরবোন দেখাব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অ্যাতো দিনে সময় হল ওদের।

স্ত্রীর মিষ্টি অনুযোগে খুব বিপাকে পড়ে যান ভার্মাসাহেব। হ্যাঁ, কমিট তো করেইছি। আসলে, বাঘ দেখা, ইন ফ্যাক্ট, আ ম্যাটার অব চান্স। আমি তো কম বার এলাম না..., বাট...।

— দেখেননি? বাঘ? মিসেস চতুর্বেদীর দু'চোখে ভরাট কৌতূহল, — একবারও না?

ভার্মাসাহেবের চোখেমুখে চাপা অস্বস্তি — একবার... মনে হচ্ছে... দেখেছিলাম... এক লহমার জন্য...। চোখের ভুলও হতে পারে। আসলে, হোগলা- হেতালের ঝোপগুলোতে এমন গা মিশিয়ে থাকে ওরা,... ভুল হয়ে যায় দেখায়।

— দেখিসনি ভাবছিস কেন? আলবত দেখেছিস। অত পেসিমিস্টিক কেন তুই? সহসা চতুর্বেদী উত্তেজিত, —না দেখলেও ভাব, দেখেছিস। তুই কি জানিস, চোখের এই দেখা না দেখার মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে থাকে? আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে তো বলেইছে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। এই চারপাশের যা-কিছু দেখছি আমরা, এই গাছ-গাছাল, হোগলা-হেতালের বন, এই নদী, আকাশ, তুই, আমি, সবই নাকি অলীক মায়া। কিছুই নাকি বাস্তবে নেই।

— তোর ওই অলীক মায়ার তালিকায় কি গায়ত্রীও রয়েছে? নাকি স্রেফ তোতে-আমাতেই তালিকা শেষ?

— না, না, ঠাট্টা নয়। চতুর্বেদী তিলমাত্র ঢিলে দিতে চান না। একেবারেই টানটান হয়ে থাকেন তিনি।

— ব্যাপারটা ভাবতে গেলে..., সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এই যে...।

— অ্যাই, অ্যাই অরবিন্দ, তোর হলটা কী? হঠাৎ এমন দার্শনিক হয়ে উঠলি কেন?

— মাঝে মাঝে ওকে ফিলোজফিতে পায়। পাশ থেকে ফুট কাটেন গায়ত্রী।

— ফিলোজফিতে পায়? চতুর্বেদীকে সহসা তর্কে পেয়ে বসে, — ফিলোজফিটা খারাপ জিনিস?

— খারাপ কে বললে? সোপেনআওয়ারের সেই বিখ্যাত উক্তিটা ইয়াদ কর, দর্শনচর্চা হল, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত্রিতে একজন অন্ধ লোকের এমন একটি কৃষ্ণকায় বেড়াল খোঁজা, যে বেড়ালের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই।

— তাহলে তুই কি বলতে চাস যে, জীবনে দর্শনের কোনওই মূল্য নেই?

— থাকলেও, এখানে, এই ঘোর সুনডোরবোনে, সব দর্শনই মূল্যহীন।

— ঠিক। এখানে ব্যাঘ্র-দর্শনই একমাত্র দর্শন। পাশ থেকে পুনরায় ফুট কাটেন গায়ত্রী।

— রাইট, ভেরি রাইট। মিসেস ভার্মা সারা শরীর দুলিয়ে সায় দেন, — তোমার মিটিং ক'টায়?

— ডেকেছি তো একটায়। ভার্মা সাহেব হাতঘড়ির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে সময় দেখে নেন, — বোধ করি পৌঁছতে পারব না।

— ওখানেই তো লাঞ্চ?

— হ্যাঁ, লাঞ্চ সেরেই মিটিংয়ে বসব। দুটো-আড়াইটে বাজবে।

লঞ্চ চলছিল ঢিমেতালে। হাওয়া বইছিল ফুরফুরিয়ে। চোখের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে সরে-সরে যাচ্ছিল প্রকৃতি। বাইনোকুলার ঘনঘন হাত বদল হচ্ছিল। ক্যামেরায় সাটার টেপা চলছিল ঘনঘন। হুইস্কির বোতলটা খুলতে খুলতে চতুর্বেদী বলেছিলেন, রাতে কি লঞ্চেই থাকছি?

— সেটা কিঞ্চিৎ রিস্কি আমার মতে। ভার্মা সাহেব বলেন, পাখিরালায় জেলা পরিষদের বাংলো বুক করা রয়েছে। এবার তোমরাই ডিসাইড করো, লঞ্চে নাকি বাংলোয়।

— বাঘ নাকি সাঁতরে সাঁতরে চলে আসে লঞ্চে?

— নিঃশব্দে তার নির্বাচন করা শিকারটিকে নাকি তুলে নিয়ে যায়? অন্যরা নাকি জানতেই পারে না?

— না বাব্বা,...। খুব ভয় মেশানো আদুরে গলা মিসেস চতুর্বেদীর, — অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। বাংলোই ভালো।

— অবশ্য লঞ্চে থাকলে রাতের বেলায় চাঁদের আলোয় বাঘ দেখবার সুযোগ থাকত। চতুর্বেদী বলেন।

— চাঁদের আলো কই? ভার্মা সাহেবের চোখেমুখে টিটকিরি, — কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পূর্ণিমার ঢের দেরি।

— কদিন অপেক্ষা করে পূর্ণিমার দিনে এলেই হত। মিসেস চতুর্বেদীর গলায় আক্ষেপ।

— ওরেব্বস! চোখ কপালে উঠে যায় ভার্মা সাহেবের, — ওই সময়ে লঞ্চ ফ্রি পাওয়া অসম্ভব।

— কেন?

— ওই দিনগুলোতে ভি-ভি-আই-পিদের ট্যুর থাকে সুনডোরবোনে। তাদেরও তো এলাকার কিছু কিছু উন্নতি করতে সাধ যায়, না কী? ভার্মাসাহেব হো-হো করে হেসে ওঠেন।

মিটিংটা যতখানি সময় নেবে বলে ভাবা গিয়েছিল, ততটা সময় নিল না। একে তো সজনেখালি পৌঁছতে দুটো বেজে গিয়েছিল,... সুধন্যখালির ওয়াচ-টাওয়ারে মহিলাকুল আর বাচ্চারা অনেকখানি সময় নিয়ে নিল, বাঘ না দেখে নামতেই চায় না কিছুতেই। বাঘ অবশ্য দেখা দেয়নি শেষ অবধি। দুঃখী দুঃখী মুখ করে বন বিভাগের যেসব রক্ষী প্রায় লুকিয়ে বসেছিল ওয়াচ-টাওয়ারের ঘেরাটোপে, তাদের থেকেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদী।

— তোমরা কি এখানেই থাকো?

— দিনের বেলায় এখানে, রাতের বেলায় লঞ্চে।

— রাতে বাড়ি ফেরো না?

লোকগুলোর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তাও বিড়বিড় করে জানায়, তাদের বাড়ি অনেক দূরে। কারও মুর্শিদাবাদে, কারওবা বীরভূম কিংবা মেদিনীপুরে।

— বাড়ি যাও না?

— মাসে একবার যাই, মাইনে পেলে।

— এদের কী মজা! বাচ্চাগুলো কলকলিয়ে ওঠে, — রোজ রোজ বাঘ দেখতে পায়।

মিসেস চতুর্বেদী শুধোন, তা-ই! রোজই বাঘ দ্যাখ তোমরা?

লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মিসেস চতুর্বেদীর দিকে। গলায় খুব উষ্মা ফুটিয়ে বলে, আমরা বাঘ দেখতে চাই নে।

— ও মা, কে-ন? বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তোলেন মিসেস ভার্মা।

ওরা জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। চোখে-মুখে চাপা বিদ্বেষ জমে।

ভার্মাসাহেব ইংরিজিতে প্রাঞ্জল করেন ব্যাপারটা। আসলে, নিজের চাকরিটাকে খুব কম লোকই ভালোবাসতে পারে। এদের চাকরিই হল, বাঘ দেখা।

একসময় ওদের একজন সামান্য অস্থির হয়ে ওঠে। বলে, বেশ আমরা বসেছিলাম চুপচাপ, আপনারা এসে সোরগোল তুললেন,... বাঘেরা জেনে গেল, এই টাওয়ারের ওপর মানুষ রয়েছে। আপনারা তো একটুন বাদে চলে যাবেন, আমাদের বিপদ গেল বেড়ে।

বলতে বলতে লোকটা খুব দুঃখী-দুঃখী হাসল।

সজনেখালিতে পৌঁছতে পৌঁছতে লাঞ্চ প্রায় ঠান্ডা হওয়ার উপক্রম। কাজেই, লাঞ্চটা সেরে নিয়ে মিটিং শুরু করতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। ট্যুরিস্ট-লজের কোনও ঘরে একটুখানি গড়িয়ে নিতে চাইছিলেন মহিলারা, কিন্তু সে সময় আর পেলেন না। শীতের বেলা। সাড়ে-তিনটের মধ্যে বেরতে না পারলে পাখিরালা পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাবে।

২

জেলা পরিষদের বাংলোতে, গ্রিলঘেরা প্রশস্ত বারান্দায় বেশ জুত করে বসেছেন সবাই। যে লোকটা ট্রেতে করে জল নিয়ে এল, ভার্মা সাহেব দেখেই বোঝেন, কেয়ারটেকার নয় সে। কেয়ারটেকারকে চেনেন তিনি। ইতিমধ্যে দু'চারবার এসে থেকেছেন এই বাংলোতে। জেরা করে বুঝতে পারেন, কেয়ারটেকারের মাসতুতো ভাই। বাজিতপুরের দিকে বাড়ি। শীতের মরসুমে সাহেব-সুবোদের ভিড় বাড়ে বাংলোতে। রান্নাবান্না, চা-জলখাবার, বিছানা পাতা, ফাই-ফরমায়েশ, — কেয়ারটেকার একা সামাল দিতে পারে না। মাসতুতো ভাইটিকে সেই কারণেই ডেকে নিয়েছে মাস-দুয়েকের তরে।

গ্লাসভর্তি ট্রে'খানা সেন্টার-টেবিলে সসম্ভ্রমে নাবিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে চলে যায় লোকটি। একটু বাদে ট্রেতে করে চায়ের কাপ আর কাজুর প্লেট নিয়ে পুনরায় হাজির হয়।

লোকটাকে খুব নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন ভার্মা সাহেব। খুব যান্ত্রিক হাতে প্রত্যেকের সামনে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিচ্ছিল সে। মুখের অসংখ্য জটিল রেখায় ভাঙচুর হচ্ছিল ঘনঘন। এই ধরণের মানুষেরা খুবই মিস্টিরিয়াস হয়। আপাত-ভাবলেশহীন মুখ দেখে ভেতরের জোয়ার-ভাটা আন্দাজ করা যায় না তিলমাত্র।

এক টুকরো কাজু প্লেট থেকে তুলে নিয়ে অলস দাঁতে কাটতে কাটতে ভার্মা সাহেব শুধোন, নাম কী?

লোকটা জবাব দেয় না। কী যেন ভাবতে থাকে। এদিক-ওদিক তাকায়। একসময় খুব অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করে, রতিকান্ত।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহেব-মেমসাহেবরা সমবেতভাবে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। ভার্মা সাহেব হাসেননি। অধস্তনদের সামনে এমন কথায় কথায় হেসে ওঠা তাঁকে মানায় না। বরং আচমকা এমন সমবেত খ্যা-খ্যা হাসিতে তাঁর সযত্নলালিত ব্যক্তিত্বের বলয়টিতে সামান্য টোল পড়ে বুঝি। এক ধরণের অস্বস্তি ফুটে ওঠে সারা মুখে।

নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরেরা অমন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন কেন, রতিকান্তর মগজে তা ঢোকে না বুঝি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে ভয় পেয়ে যায়।

— কত মাইনে পাও? চতুর্বেদী খুব তাচ্ছিল্য সহকারে শুধোন।

সহসা খুব উদাস হয়ে যায় রতিকান্ত। খুব ধীরলয়ে মাথা দোলাতে থাকে দু'দিকে, মাইনা টাইনা পাই না।

চতুর্বেদী প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন। সরকারি প্রশাসনের অন্ধিসন্ধি তাঁর একেবারেই অজানা। একটা লোক বিনে মাইনেতে কেন কাজ করে, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। বলেন, মাইনে ছাড়াই কাজ করো তুমি?

ভার্মাসাহেবকে বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হয়। ইংরিজি ও হিন্দি সহযোগে তিনি চতুর্বেদীকে বুঝিয়ে দেন, কেমন করে মাইনে ছাড়াও সরকারি প্রশাসনে কত কিসিমের ইনসেনটিভ চালু রয়েছে এদের জন্য। কেমন করে মাইনে না দিয়েও প্রায় সমপরিমাণ অর্থ একজন মানুষকে পাইয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু চতুর্বেদীর মাথায় সহজে ঢুকতে চায় না সে অঙ্ক। ভার্মাসাহেব নাচার হয়ে বলেন, ধরো, এই যে আমরা চা খাব এখানে, এই লোকটাই বানাল, পরিবেশন করল। দশ কাপ চা, বাজার দরেই দাম নেবে। লাভ রইল অর্ধেক। ধরো, রাত্তিরে এই বাংলোয় যারা থাকে, খায়, তাদের রান্নাবান্না করে দিল। মিলপিছু দর ধরলে বেশ কিছুটা নাফা থাকে। নিজের খাওয়াটাও ওই সঙ্গে হয়ে যায়। তারপর ধরো, বাংলোর পর্দা, চাদর, তোয়ালে, লেপ-বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি কেচে, ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিল এরাই, লন্ড্রির দরে বিল করল। বাংলোর ভেতরে ঝোপ-আগাছা সাফ করল, লনের ঘাস ছাঁটল, লেবার চার্জ বাজার দরে ওরাই পেল। এছাড়া, বখশিস বাবদ সদাসর্বদা টাকাটা সিকিটা তো রয়েছেই।

আলোচনাটা প্রায় গবেষণার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে দেখে বাদ সাধেন মিসেস ভার্মা। — হয়েছে, হয়েছে, অফিসের কিস্যা থামাও। সারাক্ষণ শুধু অফিসের কথা! এমন কাজপাগল মানুষ জন্মেও দেখিনি বাবা! বলতে বলতে আহ্লাদে মাখো-মাখো হয়ে আসে মিসেস ভার্মার মুখ। বলেন, তার চেয়ে ওকে শুধোও না, এই এলাকায় বাঘ রয়েছে কিনা। এরা তো বারোমাস তিরিশ দিন থাকে, বলতে পারবে ঠিকঠিক।

ভার্মাসাহেব এক ঝলক দেখেন রতিকান্তকে। শুধোন, বাড়িতে কে কে আছে?

আবার ভাবতে বসে রতিকান্ত। চোখেমুখে এমন অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, যেন এই প্রশ্নটার জবাবের জন্য তাকে স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে হাতড়াতে হচ্ছে। একটু বাদে

রতিকান্তর সারা মুখে আলোআঁধারি ছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মণিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চরা গলায় বলে ওঠে, মানুষ কী করে দেখবেন, হুজুর? সুন্দরবনে তো কেউ মানুষ দেখতে আসে না। মানুষ দেখতে চায়ও না।

ফিসফিসিয়ে বলে, বউ...বাচ্চা...।

— জমি-জিরেত রয়েছে?

রতিকান্ত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সাহায্যের আশায় চারপাশে আলুথালু তাকায়। শেষে সারা মুখে প্রায় নাক ঝাড়বার মুদ্রা ফুটিয়ে বলে, নাহ।

— চলে কেমন করে?

রতিকান্ত কেমন যেন ডুবে যেতে থাকে নিজের মধ্যে। ডুবেই থাকে অনেকক্ষণ। একসময় ভুস করে ভেসে উঠে বলে, চলে না।

বাংলোর আসল কেয়ারটেকার হরিপদ। জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে হাজির হয় এতক্ষণে। সমবেত জেরার হাত থেকে ও-ই বাঁচায় রতিকান্তকে। বলে, যাহ, যাহ, মুরগিটা কেটে ফ্যাল দি'নি।

রতিকান্ত ধীরপায়ে চলে যায়।

— আজ কী রাঁধবে, হরিপদ?

নিজের নামটা সাহেবের অমন ঠিকঠাক মনে আছে, এতেই বুঝি কৃতার্থ হয়ে যায় হরিপদ। গদগদ গলায় বলে, মুগের ডাল, পোটাটো চিপ, মটর-পনির, চিকেন, চিংড়ির মালাই-কারি, আর স্যালাড, হুজুর। ভাত চাপাটি দুইই থাকবে'নি।

হরিপদকে ভারি সাদামাটা লাগে সকলের। কোনও মারপ্যাঁচ নেই কথাবার্তায়, অভিব্যক্তিতে। কোনও মোচড় নেই গলার স্বরে। অমন মানুষের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে চায় না কেউই। কাজেই, হরিপদকে ছেড়ে ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় সবাই।

শীতটা যতখানি পড়বে ভাবা গিয়েছিল, ততটা পড়েনি। খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের গ্রিলঘেরা বারান্দায় প্রাক-শয্যা গুলতানি। টুথপিক দিয়ে দাঁতের মধ্যেকার মাংসের কুচিগুলিকে নিপুণ হাতে বের করে আনছিলেন ভার্মাসাহেব। এমনই সময়ে রতিকান্ত আসে।

মিসেস চতুর্বেদীর ফরমায়েশ মতো জলের জাগ আর গ্লাস এনে সামনের সেন্টার-টেবিলে নাবিয়ে দেয়। চলে যেতে চাইছিল, চতুর্বেদীই থামান ওকে। — রতিকান্ত, শোন।

রতিকান্ত থমকে দাঁড়ায়। তখন লোডশেডিং চলছে। হ্যারিকেনের তেরচা আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ডানদিকে। বাঁদিকটায় নিকষ অন্ধকার। সব মিলিয়ে রতিকান্তর মুখখানাকে বড়ই রহস্যময় লাগে।

ভার্মাসাহেব আর চতুর্বেদী, সারা সন্ধে বেশিমাত্রায় পান করেছেন দুজনেই। ওদের সসম্ভ্রমে সঙ্গ দিয়েছে পাল সাহেব। বাংলোয় দু'খানা মাত্তর ঘর। কাজেই, পালসাহেবের থাকবার ব্যবস্থা লঞ্চে। রাতের খাওয়া সেরে পালসাহেব সস্ত্রীক চলে গিয়েছেন লঞ্চে। হরিপদ ওঁদের পৌঁছতে গিয়েছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বাড়ছে। কনকনে হাওয়া বইছে। উত্তুরে হাওয়া। গ্রিলঘেরা বারান্দায় বসে ঢুলুঢুলু চোখে বাইরেটা দেখতে থাকেন চতুর্বেদী। বলেন, কী নির্জন লাগছে, তাই না?

ভার্মাসাহেব ঢুলুঢুলু হাসেন।

— এদিকে গ্রাম-ট্রাম নেই? লোকালয়?

— নাহ। এই ঘোর জঙ্গলে আর গ্রাম কোথায়? ভার্মাসাহেব অনুমোদনের আশায় তাকান রতিকান্তর দিকে, — কী হে, গ্রাম-ট্রাম আছে নাকি এদিকে?

— আছে তো। খুব নির্লিপ্ত জবাব রতিকান্তর।

— আছে? কটা?

— চারপাশেই রয়েছে হুজুর।

— তাতে মানুষ থাকে?

— থাকে বইকি। অনেক মানুষ থাকে।

— কী বলছো? ভার্মাসাহেব রতিকান্তর প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি, — আমি তো কতবার এসেছি এদিকটায়, একটা গ্রামও তো নজরে পড়েনি। খালি তো জঙ্গল আর জঙ্গল। গ্রাম কই? মানুষ কই?

রতিকান্তর সারা মুখে আলোআঁধারি ছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মণিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চরা গলায় বলে ওঠে, মানুষ কী করে দেখবেন, হুজুর? সুন্দরবনে তো কেউ মানুষ দেখতে আসে না। মানুষ দেখতে চায়ও না।

— তবে? ভার্মাসাহেব ঢুলুঢুলু চোখে তাকান।

— সবাই বাঘ দেখতে আসেন, হুজুর। বাঘ।

বলতে বলতে দপ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তর চোখ। ক্ষণিকের তরে পশুর চোখের মতো নীলাভ হয় চোখের মণি।

এবং, ভার্মাসাহেবের মনে হয়, সুন্দরবনে এসে, বহুদিন বাদে, এই প্রথম, আচমকা বাঘ দেখে ফেলেছেন তিনি।

সবিতেন্দ্রনাথ রায়

। পর্ব ১৪ ।

প্রসঙ্গ দেবব্রত বিশ্বাস

এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সাহিত্যের নিয়মিত লেখক নন, কিন্তু যখন বাংলা লিখেছেন, পাঠক চমৎকৃত হয়েছেন।...

এ লেখাটি আমার স্মৃতিকথা থেকে সংকলিত। তবে সেই লেখা যাঁরা পড়েননি, তাঁদের তো বটেই, যাঁদের পড়া, তাঁদেরও আশা করি সেটির পুনরাবৃত্তি খারাপ লাগবে না।

স্মৃতি সততই সুখের— এই কথাটি বহু প্রচলিত। দুঃখের স্মৃতিও অনেক সময়ে মনে আনন্দ জাগায়। ইংরেজ কবি তো বলেইছেন– Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.

দেশভাগের অব্যবহিত আগে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় যখন কলকাতা, বাংলা তথা সমগ্র ভারত ক্ষতবিক্ষত, তখনও আমরা দেখেছি কত অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে, কখনও আত্মাহুতি দিয়ে ভিন্নধর্মের, ভিন্নসম্প্রদায়ের মানুষকে বাঁচিয়েছেন। দাঙ্গা, হত্যা, মৃত্যুর পাশে পাশে এসব ছবির স্মৃতি আজও উজ্জ্বল আমাদের মনে।

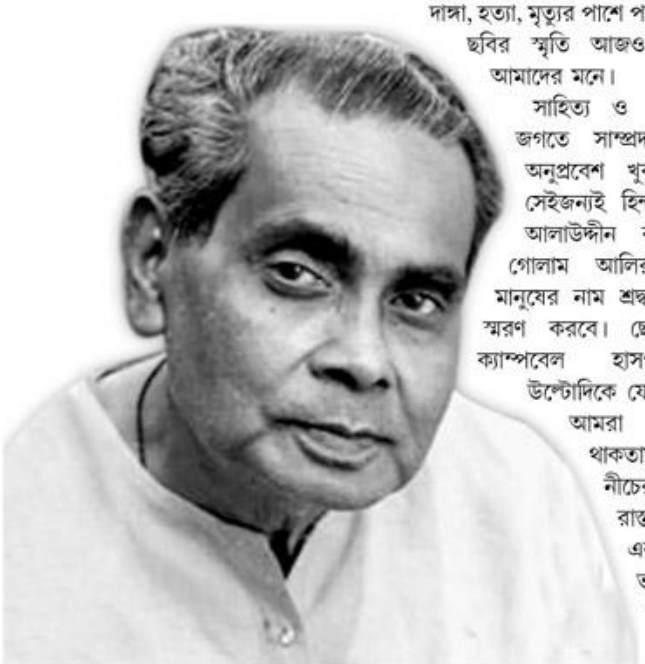

সাহিত্য ও সঙ্গীতের জগতে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ খুব ক্ষীণ। সেইজন্যই হিন্দু শ্রোতা আলাউদ্দীন বা বড়ে গোলাম আলির মতো মানুষের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ছোটবেলায় ক্যাম্পবেল হাসপাতালের উল্টোদিকে যে বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম, তার নীচের তলায় রাস্তার দিকে একটি ঘরে ভাড়া থাকতেন আব্বাস উদ্দীন। সে সময়ে তাঁর 'চল যাই চল মাঠে লাঙল বাইতে, বউ দিয়াছে গলায় দড়ি পেটের জ্বালা সইতে,' রেকর্ড শুনেই মা এই গানটি চমৎকার গাইতেন। কাজী নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত কে না ভালোবাসেন। ঠিক এইরকমই অনেক মুসলমান শ্রোতা কীর্তন ভালোবাসেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠের গান শুনতে পাগল দেখেছি বাংলাদেশের বহু মুসলমান সঙ্গীতরসিককে।

তখন ১৯৪৬-এর দাঙ্গার প্রবল উন্মত্ততা। বিখ্যাত গায়ক কলিম শরাফী কলকাতায় এসেছেন। দাঙ্গার খবর রাখেন না, হয়তো শোনেননি। তিনি সোজা দক্ষিণ কলকাতায় দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে এসে হাজির। সেই সব ভয়ংকর দিনে হিন্দু পাড়ায় কলিম শরাফীকে দেখে দেবব্রত বিশ্বাস হতবাক— তুমি কি শোন নাই কলকাতার খবর? আস আস, ভেতরে আস।

ভেতরের ঘরে কয়েকদিন লুকিয়ে রেখে, একটু নিরাপদ সময়ে দেবব্রত কলিম শরাফীকে গান্ধি-টুপি পরিয়ে ডেকার্স লেনে কমিউনিস্ট নেতা কাকাবাবু মুজাফ্‌ফর আহমেদের ডেরায় রেখে এসে তবে নিশ্চিন্ত হন।

এসব দুঃখময় দিনের স্মৃতিও আজ রূপকথার মতো স্বপ্নময় মনে হয়।

দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল ১৯১১ সালে ৬ই ভাদ্র। তাঁদের আদি বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ শহরে। তবে তাঁর জন্ম বরিশালে মাতামহের বাড়িতে। দেবব্রত বিশ্বাস পরিণত বয়সে তাঁর পূর্ববঙ্গের জীবন, সঙ্গীত নিয়ে কার্যক্রম, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গে একটি তথ্যবহুল স্মৃতিকথা লেখেন— *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত* (প্রকাশক— করুণা প্রকাশনী, ১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯)।

এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সাহিত্যের নিয়মিত লেখক নন, কিন্তু যখন বাংলা লিখেছেন, পাঠক চমৎকৃত হয়েছেন। আমরা ছোটবেলায়

জগদীশচন্দ্র বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনা পড়েছি, একালে পেয়েছি অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের *আট দশক, সাত সতেরো, স্মৃতি ও শ্রুতি* প্রভৃতি গ্রন্থ; রসায়নবিদ পি সি রক্ষিতকে অর্গানিক কেমিস্ট্রির লেখক বলেই ছাত্রাবস্থায় জেনেছি, শেষবেলায় তিনি লিখলেন অমূল্য এক স্মৃতিকথা— *পেরিয়ে এলেম।* প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত নামটিও তখন জানলাম, এতাবৎকাল পুরো নাম জানতাম না। দেবব্রত বিশ্বাসের বইটিও এইরকম তথ্যসমৃদ্ধ চিত্তাকর্ষক একটি গ্রন্থ।

দেবব্রত বিশ্বাসের পিতামহ কালীকিশোর বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেজন্য প্রথমে একঘরে, পরে স্বগ্রাম থেকেই বিতাড়িত হলেন। কালীকিশোরের মধ্যম পুত্র দেবেন্দ্রকিশোরের মধ্যম সন্তান দেবব্রত, তাঁর ওপরে চার-পাঁচ বছরের বড় দিদি আর চার-পাঁচ বছরের ছোট কনিষ্ঠ ভগিনী। পিতা দেবেন্দ্রকিশোর, পত্নী অবলা তিন সন্তানকে নিয়ে কিশোরগঞ্জ শহরে বসবাস করতেন।

তখনকার দিনে হিন্দুরা, বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুরা, ব্রাহ্মদের ম্লেচ্ছ বলে গণ্য করতেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া একত্রে করতে চাইতেন না। ফলে বাল্যবয়সে দেবব্রতকে এই প্রতিবন্ধকতা ভোগ করতে হয়েছিল। অনেক হিন্দুবাড়িতে তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার ছিল না। যদিও হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলোয় কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হত না। বাতাবি লেবুকে বল করে পূর্ববঙ্গের মাঠে-ঘাটে হিন্দু-মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে অবাধে খেলাধুলো হত। কিন্তু ওই যে বললাম, তিনি অনেক হিন্দু বাড়িতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারতেন না। এই প্রতিবন্ধকতা তাঁর মনে বাল্যবয়সেই এক প্রতিরোধ-শক্তির জন্ম দিয়েছিল। এই শক্তির বলেই দেবব্রত আজীবন লড়াই করতে পেরেছেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি।

দেবব্রতকে কিশোরগঞ্জে সবাই ডাকত 'খোকা' বা 'দেবু' বলে। 'জর্জ' নামে বিশেষ কেউ ডাকত না। 'জর্জ' নাম সম্ভবত চালু হল কলকাতায়। নিয়ম করে সঙ্গীত-শিক্ষা যাকে বলে, দেবব্রতকে তা করতে হয়নি। তার বড় কারণ বাড়িতেই গান গাওয়ার একটি স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া ছিল। 'সন্ধ্যায় মায়ের সঙ্গে সবাই মিলে নানাধরণের ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া, ছোটখাটো ব্রহ্মোপাসনা, তারপর আবার পড়াশুনো। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বড়দের সঙ্গেও ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি নানা খেলাই খেলেছি— এই খেলাগুলো কারও কাছে আমাদের শিখতে হয়নি— দেখে দেখেই শিখেছি। গানের বেলাতেও তাই। মাঝিমাল্লাদের গান, মুসলমান রাখাল ছেলেদের গান, ভিখারীদের গানগুলি আমাদের কানে ও গলায় উঠে যেত। তাছাড়া আমাদের মা তো সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সবসময়েই গুন গুন করে গাইতেন। শুনতে শুনতে গানগুলি আমার এবং আমার বোনদের গলায় উঠে যেত।'

নীরদচন্দ্রের ছোটভাই বিনোদ ছিলেন দেবব্রতর সহপাঠী। নীরদ-বিনোদের মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবিবাবুর গান গাইতেন বলে পাড়ার হিন্দু বাসিন্দারা তাঁর নিন্দা করতেন।

নিজেরা ব্রাহ্ম বলে এবং ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের অনেক বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে দেবব্রতর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন হলেন থুদুদা, তাঁর ভালো নাম পুলিনবিহারী সেন। পরবর্তীকালে পুলিনবাবু রবীন্দ্রনাথের নির্ভরযোগ্য কর্মী ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থবিভাগের অধ্যক্ষ হন।

কিশোরগঞ্জে থাকাকালীন একটি সাইকেলের দোকানে পুরনো গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রি হত। চোঙালাগানো সেই গ্রামোফোনে রেকর্ডের গান শুনে শুনে সেসব গানও দেবব্রত গলায় তুলে নিতেন। কে মল্লিক, আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রভৃতি সেকালের গাইয়েদের গান বাড়িতে গাইলে কিন্তু মা-বাবার কাছে বকুনি খেতেন। 'কি ছাতামাতা গান গাস? রবিবাবুর গান গাইতে পারিস না?' ইন্দুবালার রেকর্ডে গানের শেষে এই কথা কটি রেকর্ড করা থাকত— মাই নেম ইজ ইন্দুবালা, অ্যামেচার। এই ব্যাপারটিতে দেবব্রতরা মজা পেতেন।

ব্রাহ্ম বলে অনেক হিন্দু বাড়িতে স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার না থাকলেও কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে দেবব্রতর বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের পরিবার। নীরদচন্দ্রের ছোটভাই বিনোদ ছিলেন দেবব্রতর সহপাঠী। নীরদ-বিনোদের মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবিবাবুর গান গাইতেন বলে পাড়ার হিন্দু বাসিন্দারা তাঁর নিন্দা করতেন।

দেবব্রতর কিশোর বেলা স্বদেশি আন্দোলনের যুগ। স্বদেশি সভায় দেশাত্মবোধক গান গাইতে দেবব্রত ও তাঁর বন্ধুদের প্রায়ই ডাক পড়ত। দেবব্রতর পিতৃদেবের এসব কাজ পছন্দ হত না। কোনও কোনও স্বদেশি নেতার আচরণ, যেমন সরোজিনী নাইডুকে ইংরেজ সরকারের ভয়ে কিশোরগঞ্জে নিজেদের কারও বাড়িতে না রাখা (শেষ পর্যন্ত দেবব্রতর পিতৃদেবই তাঁকে নিজের বাড়িতে যত্নে রাখেন), যেসব মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া গিয়েছিল সেখানে চুরি ও ঠগবাজি শুরু হয়ে গিয়েছিল— এসব উদাহরণ দেখে তখনকার স্বদেশি কংগ্রেসি নেতাদের ওপর দেবব্রতর পিতৃদেব বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, কংগ্রেস দেশ শাসনের উপযুক্ত নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের ওপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল।

ইন্দুবালা

কে মল্লিক, আঙুরবালা, ইন্দুবালা প্রভৃতি সেকালের গাইয়েদের গান বাড়িতে গাইলে কিন্তু মা-বাবার কাছে বকুনি খেতেন। 'কি ছাতামাতা গান গাস? রবিবাবুর গান গাইতে পারিস না?' ইন্দুবালার রেকর্ডে গানের শেষে এই কথা কটি রেকর্ড করা থাকত— মাই নেম ইজ ইন্দুবালা, অ্যামেচার।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বিশেষ করে নাইটছুড ফেরত দেওয়ায় সে শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্ধিত হয়। ১৯২৭-এ ম্যাট্রিক পাশ করার পর দেবব্রত ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন।

এই সময় কলকাতার সিটি কলেজে সরস্বতী পুজো করা নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিবাদ বাধল। কলেজের নিয়মানুসারে সিটি কলেজে পুজো করতে দেওয়া যায় না। এক কংগ্রেস নেতা হিন্দু ছাত্রদের সিটি কলেজ ছেড়ে অন্যত্র ভর্তি হতে নির্দেশ দিলেন। কলেজ উঠে যায় যায় দেখে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ সব ব্রাহ্ম ছাত্রছাত্রীদের সিটি কলেজে ভর্তির জন্য অনুরোধ করলেন, যাতে কলেজ টিকে থাকে। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে দেবব্রত ভর্তি হলেন সিটি কলেজে। সিটি কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছিলেন দেবব্রত।

দেবব্রতর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বেড়েই চলল। বিলেতফেরত কোনও কোনও বামপন্থী নেতার রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উন্নাসিকতা ছিল। দেবব্রতর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে তাঁরা পূর্বের ধারণা বদলাতে বাধ্য হন।

১৯২৯-এ বি এ পড়তে দেবব্রত ভর্তি হন বিদ্যাসাগর কলেজে। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সমবেত সঙ্গীত-গাইয়েদের মধ্যে অনায়াসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন দেবব্রত। একাধিক গায়ক— হিমাংশু দত্ত, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ দত্তগুপ্ত প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ হয় এই সময়ে। হিমাংশুবাবু প্রসঙ্গে দেবব্রত নিজেই বলেছেন— 'উনি সত্যিকারের গুণী ছিলেন, কারণ তখন থেকেই তিনি নানা গানে সুরারোপ করতেন এবং সেই সুরগুলি একেবারে নতুন ধরণের লাগত। এই ধরণের সুরের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না।'

আরেকজন গায়ক, সন্তোষ সেনগুপ্তের সঙ্গেও পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব এই সময়ে।

তবে ব্রহ্মসঙ্গীতের সুরের মাধুর্যে আকৃষ্ট হলেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা দেবব্রতর কোনও কালেই হয়ে ওঠেনি।

কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের নানা অনুষ্ঠানে তখন যেসব ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হত তার বেশির ভাগই ছিল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা রচিত। সেগুলির সুরের মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল না যা দেবব্রতের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিত। যদিও সঙ্গীত সম্বন্ধে তখনও তাঁর গভীর জ্ঞান গড়ে ওঠেনি। অথচ ১৯৩১ সাল থেকে বেশ কয়েকবছর শান্তিনিকেতনে যেসব গান ওখানকার ছাত্রছাত্রীদের গলায় শুনতেন, সেগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করত না। মনে হত, হয় তাঁর নিজের বোঝবার অক্ষমতা অথবা শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের গানের মধ্যে রসসঞ্চারণে অক্ষমতা।

এইভাবে সঙ্গীতচর্চার মধ্য দিয়েই ১৯৩৩-এ অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে ফেললেন দেবব্রত। ১৯৩৪-এ বিনা মাইনেতে হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরি। পরে ১৯৩৫ সনের মে মাসে পাকা খাতায় পঞ্চাশ টাকা মাহিনার করণিক হলেন। তখন গায়ক হবেন স্বপ্নেও ভাবেননি।

দেবব্রত একদিকে যেমন অনেক ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি আর একদিকে চরম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। ওজনে বোধহয় দুটিই তুল্যমূল্য। কর্মসূত্রে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্র সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রেই সুবীরবাবুর পিসিমা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে আলাপ হয়। দেবব্রতর গলা শুনে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে তাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে এবং গেয়ে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী' গানটি দেবব্রতকে দিয়ে পাশ্চাত্য কায়দায় হারমোনাইজ করে গাওয়াতেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গান শুনে দুটি গান রেকর্ড করিয়েছিলেন সেনোলা কোম্পানি থেকে। যদিও সে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গাস্টিন প্লেসে কলকাতা বেতারকেন্দ্রে দেবব্রতকে গান গাইবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েসের পদস্থ অফিসার হেম সোম মশাই কনক দাসের সঙ্গে দেবব্রতর দ্বৈতসঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করেন— একটি হল 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান' আরেকটি 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'। এর পর আরও দ্বৈতসঙ্গীত রেকর্ড হল। তখন দেবব্রত থাকেন কবির রোডের বাড়িতে। এখানেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন চৌধুরী, সমরেশ রায়, সন্তোষ দাশগুপ্ত প্রভৃতি বন্ধুদের নিয়ে গানের জমাট আড্ডা ও আসর জমে উঠল।

দেবব্রতর গলা শুনে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী নিজে তাঁকে পিয়ানো বাজিয়ে এবং গেয়ে 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানটি দেবব্রতকে দিয়ে পাশ্চাত্য কায়দায় হারমোনাইজ করে গাওয়াতেন। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গান শুনে দুটি গান রেকর্ড করিয়েছিলেন সেনোলা কোম্পানি থেকে। যদিও সে রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি।

এরই সঙ্গে চলছিল গানের টিউশনি। কারণ মাইনের অত কম টাকায় বাড়িভাড়া দিয়ে সংসার চলে না।

১৯৩৮ সাল থেকে দেবব্রত বামপন্থী রাজনীতিতে আকৃষ্ট হলেন। তখন কম্যুনিস্ট পার্টি অবিভক্ত ছিল এবং সেটি ইংরেজ সরকারের নির্দেশে বেআইনি দল হিসেবে ঘোষিত হয়। ফলে দলের কাজকর্ম গোপনে করতে হত। এ-কাজে দেবব্রতর সহকর্মী চিন্মোহন সেহানবীশ বিশেষ সাহায্য করতেন।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান, নানা জায়গায় শোক দিবস পালন, গীতবিতান সঙ্গীতায়ন প্রতিষ্ঠা ও সেখানে নানা অনুষ্ঠানে গান গাওয়া— দেবব্রতর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা বেড়েই চলল। রেকর্ডও বেরোতে শুরু হল একটার পর একটা। বিলেতফেরত কোনও কোনও বামপন্থী নেতার রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে উন্নাসিকতা ছিল। দেবব্রতর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে তাঁরা পূর্বের ধারণা বদলাতে বাধ্য হন। তখন দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে সরকার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। এই সময় থেকে ১৯৫২/৫৩ পর্যন্ত দেশে এক চরম রাজনৈতিক ডামাডোল। দেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, পঞ্চাশের মন্বন্তর, কারফিউ। তারই মধ্যে সাংস্কৃতিক বিকাশের চূড়ান্ত। একদিকে সাহিত্য, আরেকদিকে গণনাট্য আন্দোলন, 'নবান্ন'র মতো নাটকের অভিনয়। 'শহীদের ডাক' ছায়ানাটক, সলিল চৌধুরী সুরারোপিত সুকান্তর গান 'অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি।'

এর সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও দেশভাগের মতো চরম সর্বনাশ নেমে এল বাঙালির জীবনে।

দেবব্রত তখন কবির রোড ছেড়ে উঠে এসেছেন ত্রিকোণ পার্কের কাছে রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাড়িতে। বন্ধুবান্ধবের পরিমণ্ডল আরও বেড়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সঙ্গে আলাপও এই সময়। উভয়েই পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ। পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হল এখানে এসে। পঙ্কজ মল্লিক তাঁকে ডাকতেন 'মিঃ ট্রাস্ট' বলে।

১৯৪৭-এর কিছুকাল পরে কমিউনিস্ট পার্টি আবার বেআইনি ঘোষিত হয়। পার্টির জন্য গোপনে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। দেবব্রতর বাড়িতেই বৈঠক হত গোপনে। অর্থসঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ঘোষণা না করে গানের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন দেবব্রত।

শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্রদের সঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন, আই পি টি এ'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবব্রত অন্যতম পুরোধা, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই অতিরিক্ত পরিশ্রমেই হয়তো তাঁর শরীর ভাঙল। যা ছিল অল্পস্বল্প শ্বাসকষ্ট, তা হাঁপানিতে দাঁড়াল। নিয়মিত চিকিৎসা ও ঔষধ-নির্ভর হয়ে পড়লেন। আবার এই সময়েই জনপ্রিয়তা ক্রমে তুঙ্গস্পর্শী হতে চলেছে।

শান্তিনিকেতনে কালোর চায়ের দোকানে তাঁকে দেখতে পেলেই, নন্দিতা কৃপালনী বা অন্য কেউ চেঁচিয়ে উঠতেন। জর্জ এসেছে, জর্জ এসেছে। ব্যস, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভর্তি হয়ে যেত গানের আসর। প্রফুল্ল মহলানবীশ পকেট থেকে বাঁশি বার করে বাজাতে শুরু করতেন গানের সঙ্গে। শচীন কর টেবিল বাজিয়ে তবলার কাজ চালাতেন।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সফরে বিদেশে গিয়েছেন। চিন দেশে গান গাইতে গিয়েছেন। তাঁর গান, দেশি বিদেশি শ্রোতামাত্রই মুগ্ধভাবে উপভোগ করত।

১৯৬১-৬২ সাল নাগাদ থেকে দেবব্রতর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁর সঙ্গীতসাধনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। এই সময়ে আরেকটি কারণে তাঁর মন ভাঙে। কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে দ্বিধাবিভক্ত হল। অফিসের ইউনিয়নেও সেই মতো ভাঙন দেখা দিল। যদিও অবসর নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে অফিসের কাজে, বিদায়বেলায় এই ভ্রাতৃবিরোধ দেবব্রতর প্রাণে বড় বেজেছিল। সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায়-সংবর্ধনা নিতে চাননি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের লয় বৃদ্ধি, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে একাধিকবার তর্কবিতর্ক, রেকর্ড প্রকাশে বাধাদান বেড়েই চলল। যতদিন অনাদিবাবুর মতো গুরুস্থানীয়রা বোর্ডের কর্তা ছিলেন, ততদিন দেবব্রতর অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যখন তাঁর সমবয়সি ও কমবয়সি অন্য গায়ক গায়িকা মিউজিক বোর্ডের কর্তারূপে এলেন, তখনই নানারকম বাধানিষেধ আরোপিত হতে লাগল দেবব্রতর গানের ওপর।

দেখুন ঈশ্বর আমাকে গলা দিয়েছিলেন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার জন্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্য। আমি স্বদেশি সঙ্গীত গাইলাম, গণনাট্য করলাম, আই পি টি এ করলাম। ফলে সামান্য শ্বাসকষ্ট হাঁপানিতে দাঁড়াল। যার যা কাজ, তার বাইরে যেতে নাই।

এইরকম সময়ে একবার দেবব্রত যাচ্ছেন ভাগনেকে নিয়ে বোম্বেতে। ছেলেটির হার্টে একটি জন্মগত: দোষ ছিল। ফার্স্ট ক্লাসের সেই কামরাতেই উঠলেন সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আগেই আলাপ ছিল উভয়ের। কথায় কথায় ভাগনের অসুখের কথা বললেন। জানালেন, চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার ডাক্তারদের বিরাট চেহারা দেখে ছেলেটি এমনই ভয় পেল যে তাঁরাই বিধিনির্দেশ দিয়ে বললেন, দেশেই অপারেশন করাও, এখানে ভয় পেলে অপারেশনে মুশকিল হবে।

কথায় কথায় অনেক কথা বলেছিলেন দেবব্রত। বলেছিলেন, দেখুন ঈশ্বর আমাকে গলা দিয়েছিলেন ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার জন্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্য। আমি স্বদেশি সঙ্গীত গাইলাম, গণনাট্য করলাম, আই পি টি এ করলাম। ফলে সামান্য শ্বাসকষ্ট হাঁপানিতে দাঁড়াল। যার যা কাজ, তার বাইরে যেতে নাই।

হরিনারায়ণ বলেছিলেন, আপনার এই হাঁপের টানটা গানে একটু বেশিরকম মাধুর্যের মাত্রা এনে দেয়। হাঁপ বলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না।

দেবব্রত হেসে বলেছিলেন, আমি কিন্তু পরে বিলক্ষণ বুঝি। এই যে ইনহেলারটা দেখছেন, তখন এটাই ভরসা।

এই সময় সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত বিরোধ বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে আরও গোলমাল পাকিয়ে তুলল। বলা যায়, মিউজিক বোর্ডের বিরোধিতা বেশি মাত্রা পেয়ে গেল। আনন্দ-অনুষ্ঠানে গাইবার জন্য দেবব্রত বিশ্বাসকে সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর বাড়ি গিয়ে অনুরোধ জানালেন। দেবব্রত অনেক জায়গায় বিনা পয়সায়, কখনও বা নামমাত্র ত্রিশ টাকা নিয়ে গেয়ে এসেছেন। যেখানে টিকিট বিক্রি করে অনুষ্ঠান হত, সেখানে অবশ্য টাকা-পয়সার ব্যাপার

সন্তোষকুমার ঘোষ

তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় সন্তোষবাবুর অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই প্রত্যাখ্যান উনি ভুলতে পারলেন না। এর পরেই আনন্দবাজার পত্রিকায় দেবব্রতবাবুর গান গাওয়ার বিষয়ে সন্তোষবাবুর সমালোচনা বেরোতে লাগল— স ক ঘ নামে, কখনও স কু ঘো নামে। দেবব্রত স্বরলিপি মানেন না, লয় তাল বদলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

বনানী ঘোষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতসঙ্গীত অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র সদনে। বিজ্ঞাপন, টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে বোম্বে থেকে হেমন্তবাবুর টেলিগ্রাম এল— গুরুতর অসুস্থ। বনানীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সন্তোষবাবুর শরণাপন্ন হলেন। সন্তোষবাবু সুচিত্রা কণিকার কথা বললেন। বনানী বললেন, গায়িকা হলে হবে না, গায়ক চাই।

আগে থেকে ঠিক করে নিতেন।

দেবব্রতবাবু সন্তোষবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আনন্দ-অনুষ্ঠান ব্যাপারটা কী? সন্তোষকুমার ঘোষ বিশদ ভাবে আনন্দবাজার পত্রিকার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান বোঝালেন।

দেবব্রত স্বভাবসিদ্ধ বললেন, হ, এটা তো তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাপার। তা আমারে কত দিবেন গান গাইবার জন্য?

সন্তোষবাবু হয়তো এমন প্রশ্ন আশা করেননি। উনি 'মানে মানে' বলতে দেবব্রতবাবু সটান বলে দিলেন, বোঝলাম আপনার বলতে অসুবিধা আছে। আপনি আপনার মালিককে জিগায়ে আসেন। তারপর আমি ঠিক করুম, যাব কী যাব না।

অন্য একটা শর্ত আছে আমার, ওই যে গানের মধ্যে মধ্যে কথা বলতে হয় না, গ্রন্থনা না কি বলে, ওইটে সন্তোষবাবুরে করতে হইব। এই শর্ত মানলে তবেই আমি দ্বৈতসঙ্গীতে যোগ দিব।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আনন্দবাজার পত্রিকায় সন্তোষবাবুর অপ্রতিহত ক্ষমতা। এই প্রত্যাখ্যান উনি ভুলতে পারলেন না। এর পরেই আনন্দবাজার পত্রিকায় দেবব্রতবাবুর গান গাওয়ার বিষয়ে সন্তোষবাবুর সমালোচনা বেরোতে লাগল— স ক ঘ নামে, কখনও স কু ঘো নামে। দেবব্রত স্বরলিপি মানেন না, লয় তাল বদলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার তার প্রতিবাদও হতে লাগল বিভিন্ন জনের কাছ থেকে।

ইতিমধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ একটু বিপাকে পড়লেন। তাঁর স্নেহধন্যা গায়িকা বনানী ঘোষ ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দ্বৈতসঙ্গীত অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র সদনে ঠিক ছিল। বিজ্ঞাপন, টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে বোম্বে থেকে হেমন্তবাবুর টেলিগ্রাম এল— গুরুতর অসুস্থ। সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আসতে পারবেন না। বনানীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সন্তোষবাবুর শরণাপন্ন হলেন। সন্তোষবাবু সুচিত্রা কণিকার কথা বললেন। বনানী বললেন, গায়িকা হলে হবে না, গায়ক চাই। দ্বিজেনবাবুও কলকাতায় নেই।

সন্তোষবাবু বললেন, একমাত্র দেবব্রত ভরসা। তবে দেবব্রতবাবুর সঙ্গে তো আবার আমার সম্পর্ক ভালো না। তুমি নিজে গিয়ে অনুরোধ করো।

বনানী ঘোষ সেইমতো দেবব্রতবাবুকে গিয়ে ধরলেন। সবকিছু জানিয়ে হেমন্তবাবুর জায়গায় দ্বৈতসঙ্গীতে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। দেবব্রতবাবু প্রথমে বললেন— আরে আপনাকে বনানী দেবী কে না জানে! আপনি 'সোলো' করেন, দ্যাখবেন তাতেই কত লোক!

বনানী নাছোড়বান্দা। তখন দেবব্রত হঠাৎই জিজ্ঞেস করে বসলেন, আচ্ছা বনানী দেবী, একটা সত্য কথা কন তো, আমার কাছে আপনাকে কে পাঠায়েছে? সন্তোষকুমার ঘোষ না?

বনানী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন। দেবব্রত বললেন, আমি জানি আপনি তাঁর বিশেষ স্নেহপাত্রী। ঠিক আছে, আমি গান করুম, আমারে পয়সাও দিতে হইব না।

বনানী 'না না' বলতে, দেবব্রত বললেন, অন্য একটা শর্ত আছে আমার, ওই যে গানের মধ্যে মধ্যে কথা বলতে হয় না, গ্রন্থনা না কি বলে, ওইটে সন্তোষবাবুরে করতে হইব। এই শর্ত মানলে তবেই আমি দ্বৈতসঙ্গীতে যোগ দিব।

সন্তোষবাবুকে বাধ্য হয়েই এই শর্তে রাজি হতে হল।

রবীন্দ্রসদন শ্রোতায় পরিপূর্ণ। দেবব্রত শ্রোতাদের মধ্য দিয়েই মঞ্চে উঠলেন। একহাতে নমস্কার করতে করতে।

মঞ্চে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন সন্তোষবাবু ও বনানী দেবী। দেবব্রত উঠতেই শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে অনুরোধ— আগে দেবব্রত, আগে দেবব্রত।

দেবব্রত মাইক টেনে শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন— দ্যাখেন, এখানে আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে আইছি বটে আপনারাও শোনতে আসছেন, কিন্তু মনে রাখবেন এই অনুষ্ঠানে গ্রন্থনা করতাছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত-সুর-বিশেষজ্ঞ শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি যা কইবেন তাই হইব।

সন্তোষবাবু বললেন, না না, আপনি আগে গান দেবব্রতবাবু।

দেবব্রত ধরলেন তাঁর বিখ্যাত গান— আকাশ ভরা সূর্য তারা।

শেষ হতে না হতে শ্রোতারা 'এনকোর, এনকোর', আরেকটা দেবব্রতবাবুর শুনব।

দেবব্রতবাবু ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন— আপনাগোর সবাইকে তো আগেই কইয়া দিছি, এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সুর-বিশেষজ্ঞ সন্তোষবাবু প্রধান কর্তা, তিনি যা কইবেন তাই শেষ কথা।

সন্তোষবাবুও অনুরোধ করলেন। দেবব্রতবাবু তখন গাইলেন— পুরানো সেই দিনের কথা।

নিজেই ঠিক করে এসেছেন এমন সব গান যা শ্রোতাদের মনে প্রাণে বিপুল সাড়া তোলে। তাঁরা আবারও আওয়াজ তোলেন আরেকটা আরেকটা।

দেবব্রত ততোধিক জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন— আপনাদের আমি মানুষ করতে পারলাম না। কইলাম না এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সুর-বিশেষজ্ঞ সন্তোষকুমার ঘোষই কর্তা— আপনারা আমি কেউ না।

সন্তোষবাবু পরে হাত জোড় করে বলেছিলেন— দেবব্রতদা, দয়া করে আর ওই বিশেষণটা বলবেন না।

কথামতো দেবব্রত বনানীর কাছ থেকে কিছুই নেননি। বেরিয়ে এসে বন্ধুদের বলেছিলেন একটু হেসে, কেমন দিলাম! বাঙালের লগে লাগতে আছিল।

হিসেব মতো সন্তোষবাবু-দেবব্রতবাবু দুজনেই

বাঙাল। কম আর বেশি।

টেগোর রিসার্চ সোসাইটির সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। সোসাইটি থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে দেবব্রতবাবুকে। প্রমথবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম একটা বইয়ের ব্যাপারে। প্রমথবাবু বললেন, চলুন ভানুবাবু আপনাতে আমাতে যাই।

যেতেই প্রমথবাবুকে সাদর আপ্যায়ন। প্রমথবাবু কথা পাড়লেন সংবর্ধনার। দেবব্রতবাবু চুপ করে থেকে বললেন, বিশীদা ওসব থুইয়া রাখেন। আপনি বললে তো আমার গুণব্যাখ্যান হইল না, সন্তোষকুমার ঘোষ থুড়ি স ক ঘ কী কইলেন তারই ওপর সব নির্ভর করে।

প্রমথবাবু বললেন, ওসব রাখুন দিকি। আপনার গান সবাই চায়। এই তো ভানু ধর্মতলায় রেকর্ড কিনতে গিয়ে শুনে এসেছে, আপনার রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড সব থেকে বেশি বিক্রি, তারপর হেমন্ত, এর অনেক পরে বাকিরা। জনপ্রিয় হলেই শত্রু বাড়ে।

দেবব্রত বললেন, হ হ, সব জানি। তবে বিশীদা, আমিও শোধ নিছি। শোনছেন তো?

প্রমথবাবু হেসে বললেন, সব শুনেছি, ভানুও তো ছিল সেই অনুষ্ঠানে।

দেবব্রতর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল। দুটি গান গেয়েছিলেন। একটি মনে আছে— আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই।

দেবব্রত বিশ্বাস রগড়েও কম ছিলেন না। একবার রবীন্দ্রসদনে সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় মশাইয়ের পর দেবব্রত গাইবেন ঠিক আছে। দেবব্রত নিরীহ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন— দ্বিজেন, তুমি কি কি গাইবা ঠিক করছ?

দ্বিজেনবাবু গানের প্রথম লাইনগুলি বলে গেলেন পর পর। দেবব্রত নিরীহ ভাবে বললেন— আমাকে তোমার আগে গাইতে দিবা? আমার আবার রক্ত-টক্ত পরীক্ষা আছে। দেরি হইলে মুশকিল।

দ্বিজেনবাবু বললেন— হ্যাঁ হ্যাঁ নিন না জর্জদা।

সেই মতো ঘোষণা হল।

দেবব্রত হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে দ্বিজেনবাবুর ঠিক করা গানগুলি পর পর গেয়ে দিয়ে অন্যদিকে দৃকপাতমাত্র না করে 'দ্বিজেন, এবার তুমি গাও' বলে উঠে পড়লেন।

সাহিত্যিক ননী ভৌমিক অনুবাদের কাজ নিয়ে রাশিয়ায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে এক রাশিয়ান মহিলাকে বিয়ে করে থেকে যান। পরে যখন এখানে সস্ত্রীক আসেন, দেবব্রত বিশ্বাসের গান শুনতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

দেবব্রত বাংলা ইংরিজি এমনকী রুশ ভাষায় অনূদিত গানও শুনিয়েছিলেন।

ননী ভৌমিকের স্ত্রী দেবব্রতর গান শুনে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। বলেন, মিঃ বিশ্বাস, আপনার গান তো অপূর্ব, তাছাড়া আপনার মতো রাশিয়ান ইনটোনেশন আমি আর কোনও গায়কের কণ্ঠে শুনিনি। এত নিখুঁত যে বলবার নয়।

দেবব্রত বলেছিলেন, মাদাম, এই কৃতিত্বের জন্য আমার জন্মভূমিই আসল দাবিদার। আমি যেখানে জন্মেছি সেখানকার ভাষা আর আপনাগোর দেশের ভাষা অনেকটা একরকম।

ননী বললেন, এ আবার কী কথা?

দেবব্রত বললেন, বুঝলেন না মাদাম, আপনারা বলেন— ভ্রনস্কাই আলেকসাই, আমাগোর দ্যাশে তেমনি বলে— যাস কই, খাস কই!

ননীবাবু তখন হেসে কুটোপাটি।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এখানকার একদল সাংস্কৃতিক মানুষ সে-স্বাধীনতা উৎসবে গিয়েছিলেন। অনেক সঙ্গীত গায়ক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেবব্রতও। প্রথম দিকে অল্পখ্যাত গায়িকারা গাইছেন। শ্রোতারা অধীর, বিশৃঙ্খল, কেউ কেউ শিসও দিচ্ছে। ভলান্টিয়ার, পুলিস, সেনা বিশৃঙ্খলা থামাতে অক্ষম। তখন দেবব্রত মঞ্চে গিয়ে মাইক ধরে জলদগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, এই আপনাদের ভদ্রতা, আমাদের আমন্ত্রণ করে এনে গানের মধ্যে অসভ্যতা। আপনারা না রক্ত দিয়া সদ্য স্বাধীনতা আনছেন, আপনাদের আচরণে তা বিশ্বাস হয় না। এখনই যদি চুপ করে গান না শোনেন আমি এঁদের সবারে বলব, চলেন একটিও গান না করে ফিইর‍্যা যাই।

পুলিস ভলান্টিয়ার যা পারেনি, দেবব্রতর ধমকে তা মন্ত্রের মতো কাজ করল।

বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের অত্যাচারে এই অমিত শক্তিধর গায়ক ১৯৭১ সাল থেকে রেকর্ড করা বন্ধ রাখেন। বিশ্বভারতীর হিতাহিত-কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় দেশবাসী তাঁর কণ্ঠস্বরে অমূল্য আরও কিছু সঙ্গীত শোনা থেকে বঞ্চিত হল। এখন তো কপিরাইট উঠে যাওয়ায় রবীন্দ্রসঙ্গীত যে যার মতো গাইছেন ও গাইবেন।

১৯৮০ সালে এই গায়ক যে যন্ত্রণা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন শেষ রেকর্ডে এই কথাটি বলে— এরা কারা আমারে গাইতে দিল না। আমি গাইতে পারলাম না।— তা শুনলে চোখে জল আসে।

দেবব্রত রেখে গিয়েছেন, তাঁর ১৯৭১-এর আগে পর্যন্ত করা তাঁর অসাধারণ কণ্ঠস্বরে গানের রেকর্ড আর একখানি অমূল্য স্মৃতিগ্রন্থ— *ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত।*

প্রমথনাথ বিশী

প্রমথবাবু কথা পাড়লেন সংবর্ধনার। দেবব্রতবাবু চুপ করে থেকে বললেন, বিশীদা ওসব থুইয়া রাখেন। আপনি বললে তো আমার গুণব্যাখ্যান হইল না, সন্তোষকুমার ঘোষ থুড়ি স ক ঘ কী কইলেন তারই ওপর সব নির্ভর করে। প্রমথবাবু বললেন, ওসব রাখুন দিকি। আপনার গান সবাই চায়।

ভ্রম সংশোধন

'কালের কষ্টিপাথর' মে-জুন ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রাজশেখরের ছেলেবেলা' শীর্ষক স্মৃতিকথার লেখক শশিশেখর বসু। ভুল করে লেখকের নাম গিরীন্দ্রশেখর বসু ছাপা হয়েছে, এজন্য আমরা দুঃখিত।

এ প্রসঙ্গে বলার, রাজশেখর বসুরা ছিলেন চার ভাই— শশিশেখর, রাজশেখর, কৃষ্ণশেখর ও গিরীন্দ্রশেখর। রাজশেখরের অগ্রজ শশিশেখর মূলত ইংরিজিতেই লেখালেখি করতেন। অনুজ গিরীন্দ্রশেখর একাধারে প্রখ্যাত মনোবিদ এবং শিশুদের জন্য 'লাল কালো' বইটির লেখক হিসেবে সমধিক বিখ্যাত।

পুরনো অ্যালবাম

কালান্তর

১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যায় সম্পাদকের লেখা লেখক-পরিচিতি

শ্রী প্রমথ নাথ বিশীর জন্মস্থান ভারতবর্ষ। জন্মকাল— বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। মৃত্যুকাল— বিংশ শতাব্দীর কোন এক অনাগত বৎসর। সেক্সপীয়ারের মতোই তিনি স্বল্প বাংলা ও স্বল্পতর সংস্কৃত শিখিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে প্রব্দায় চল্লিশ খানা পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন এবং নির্ব্বোধপ্রকাশকগণ ছাপিয়াছেন। কেবল Quantum Theory ও সরল সাবান প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে এখনো কিছু লেখেন নাই। আরও ১৬০ খানা পুস্তক লিখিবার ইচ্ছা আছে। ইহার hobby বাঙ্গালী সমাজের নিন্দা করিয়া শ্রোতাদের আনন্দ দাম করা। শ্রোতা যখন জোটেনা বুনো ভালুক শিকার করিয়ে ভাল বাসেন। বাংলা দেশের বিদূষক বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়াই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রমথ নাথ বিশী ও প্র. না. বি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় প্রায় দশ বছর আগে। কল্লোলোত্তর যুগের অল্প যে ক'টি লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। প্রধানতঃ ছোট গল্প লেখক। এঁর রচিত গল্প-সংগ্রহের নাম, 'অসমতল', 'হলদেবাড়ি', 'উল্টোরথ' ও 'পতাকা'। উপন্যাস: 'দ্বীপপুঞ্জ'।

নরেন্দ্র নাথ মিত্র সেই জাতের লেখক যাঁরা নীরের মধ্যে থেকে ক্ষীরটুকু বার করে নিতে জানেন। তাঁর রচনায় জীবনের জটিলতার ভেতরের আর বাইরেকার দু'টো রূপই আছে। অর্থাৎ আঁশ আর শাঁশ দুইই। কিন্তু কেবল মাত্র আঁশটুকুর কারবার না করে তিনি সহজলভ্য জনপ্রিয়তার পথ পরিত্যাগ করেছেন। কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত।

ব্যক্তিগত জীবনে নরেনবাবু গম্ভীর, স্বল্পভাষী। বাইরের কাঠিন্যের আড়ালে তাঁর যে রসিক, কৌতুকপ্রিয় মন আছে, অতি অন্তরঙ্গ দু'চারজন বন্ধবান্ধব ছাড়া অন্য কেউ সহজে সেটা অনুভব করতে পারেন না। জন্ম পূর্ববঙ্গে; বর্ত্তমানে কলকাতা প্রবাসী।

নবেন্দু ঘোষ জন্ম ঢাকা, ১৩ই চৈত্র, ১৯২৮ সাল। পাঁচ ছ'বছর বয়স থেকে পটনায় গিয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। সেইখানেই স্কুল ও কলেজ-জীবন শেষ হয়। ১৯৩৯ সালে ইংরাজীতে এম এ পাশ করেন। স্কুল জীবনেই লেখক হবার বাসনাটি তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর প্রথম গল্প 'একটি বর্ষার সন্ধ্যা' ১৩৪৩ সালে 'শনিবারের চিঠিতে' প্রকাশিত হয়। ছোটবেলায় মাছ ধরতে, গল্পের বই পড়তে ও থিয়েটার করতে ভাল বাসতেন; একটু নির্জনতার আড়ালে থাকতে চাইতেন। ইনি বিহারের বহু জায়গায় নৃত্য-কলা প্রদর্শন করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। বর্তমানে সিনেমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়েছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়** নামে পরিচিত হলেও এঁর আসল নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৩২৫ বঙ্গাব্দ। আদি নিবাস বরিশাল জেলায়। প্রথম রচনা আরম্ভ করেন কবিতা দিয়ে। বাজে তর্ক করে ভালো মানুষকে চটিয়ে আনন্দ পান। বৈশিষ্টের মধ্যে এক গান দুবার কখনও এক সুরে গান না। কবিতার অসহ্য আবৃত্তি করে লোকের মাথা ধরিয়ে দেন। ছবি আঁকতে জানেন। খাদ্যের মধ্যে প্রিয় বস্তু হ'ল ইলিশ মাছ ও চিচিঙ্গে। বইএর মধ্যে প্রিয় হ'ল 'আবোল-তাবোল'। বর্ত্তমানে কলিকাতায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

বিজ্ঞানাচার্য **মেঘনাথ সাহা** আত্ম-ভোলা মানুষ। বহুবিধ বিদ্যার অধিকারী তিনি, অনেক কিছুই তাঁকে মনে রাখতে হয়; কিন্তু তাঁর নিজের ছাতা, ঘড়ি হ্যাটের কথা তিনি মনে রাখতে চান না। এগুলি প্রায়ই তিনি ফেলে আসেন। সব কিছু তিনি সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পণ্ডিতমন্যতা বা Snobbery তাঁর অসহ্য। দেশের ও জাতির উন্নয়নের বহু পরিকল্পনা আছে তাঁর। বাঙালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের বিষয়ে তিনি গোখলের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন।

তীক্ষ্ণচক্ষু, উচ্চনাসা এনসাইক্লোপিডিয়া-বিলাসী পণ্ডিত দেখে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা **সৈয়দ মুজতবা আলীকে** দেখলে আনন্দিত হবেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং বিনয়ী, স্পষ্টবক্তা হয়েও প্রিয়ভাষী। অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছেন, কিন্তু ভালবাসেন মাতৃভূমিকে। অধিকার আছে বহু ভাষায়, কিন্তু অনুরাগ মাতৃভাষার ওপর। তিনি প্রিয়দর্শন অথচ অবিবাহিত। সুরসিক পাণ্ডিত্য তাকে স্বচ্ছতা দিয়েছে, আবরণ নয়।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার ১৯০৭ সালের স্বদেশী আন্দোলনে পিকেটিং করবার অপরাধে ৬ বৎসরের জন্য স্কুল হইতে বিতাড়িত। লক্ষ্মীছাড়ার দলে যোগ দিয়া যাযাবর বৃত্তি—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান— ১৯১৫ সাল হইতে উদ্বোধন ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় লেখা আরম্ভ,—পরে চিত্তরঞ্জন দাসের "নারায়ণের" নিয়মিত লেখক,— ১৯২২ সাল হইতে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। বিবেকানন্দ চরিত, জওহরলালের আত্মজীবনী, ষ্টালিন প্রভৃতির লেখক। কবিতা সাহিত্য, ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞানে অনুরাগ আছে। সঙ্গীত জানেন না, সহ্যও করতে পারেন না। জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুতান্ত্রিক।

কল্লোল পরবর্তী যুগের লেখকদের মধ্যে **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী** অন্যতম। বেশীর ভাগ ছোট গল্প লেখেন। এযাবৎ একখানা গল্পের বই বেরিয়েছে— 'খেলনা'। জন্মস্থান কুমিল্লা। কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করছেন। বয়স— উত্তর তিরিশ। সম্প্রতি একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' ১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত। *বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।*

শিল্পী গণেশ পাইন

তপন ভট্টাচার্য

শিল্পী গণেশ পাইনের ভেতর ছবি আঁকার প্রেরণা এসেছিল বালক বয়সেই, এবং তিনি যখন আর্ট কলেজে ভর্তি হন ১৯৫৫ সালে, তাঁকে দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ তখনই প্রাথমিকভাবে তাঁর ছবিতে এমন মুনশিয়ানা ছিল যা কলেজের শিক্ষকদের নজর এড়ায়নি। কলেজের করা কাজগুলি এবং পাস করে বেরোবার পরে পরেই যে কাজগুলি আমরা দেখি তা একজন মনোযোগী ছাত্ররই, তিনি ভূ-দৃশ্যরই প্রচুর ড্রইং করতেন এবং দিবালোকের নানান দৃশ্যও আঁকতেন। এখন সবাই জানেন, ধীরে ধীরে এসবই বদলে যাবে এবং তা হয়ে উঠবে রাত্রির ভাষার একান্ত ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মননশীল কবিতা।

অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ও লেখা দুটো দিকেই উৎসাহিত ছিলেন গণেশ পাইন। কলেজ জীবনে অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন যা সরাসরি বেঙ্গল স্কুলের ঘরানার। কিন্তু তাও ব্যতিক্রম বলা চলে না, অসংখ্য তরুণ শিল্পীই তখন অ্যাকাডেমিক ও বেঙ্গল স্কুল নিয়ে উৎসাহিত হচ্ছেন। এমনকী শিল্পী যোগেন চৌধুরীও কয়েকটা বেঙ্গল স্কুল ঘরানার কাজ করেছিলেন ৫৭-৫৮ সাল নাগাদ। এ অবস্থায় কাজগুলি হত গীতিধর্মী, পেলব, ভাবাবেগ-রঞ্জিত, স্নিগ্ধ, শোভন, মার্জিত এবং অবশ্যই মন কেমন-করা স্মৃতিমুখর। এবং বলা বাহুল্য, গণেশ পাইনের ছবিগুলিও তেমনই হত। কিন্তু ষাটের দশকের শেষের দিকে গণেশ পাইনের ছবিতে একটা ব্যক্তিগত ভাষা তৈরি হতে থাকে। সেটা গণেশ পাইনের ক্ষেত্রে কালি-কলমের অসংখ্য ড্রইং-এর ভেতর দিয়েও তৈরি হচ্ছিল। আবার '৬৭ সালেই গণেশ পাইন এমন কয়েকটা ছবি আঁকছেন, যেমন— মুকুট, ১৯৬৭; তা একান্তই তাঁর ছবি। এসব ছবিতে আর সরাসরি বেঙ্গল স্কুলের প্রভাব থাকেনি। কালি-কলমের ড্রইংয়ের ক্ষেত্রে বাংলায় যেন একটা বিশেষ স্কুল তৈরি হয়ে গিয়েছিল সে সময়। যদি গণেশ পাইনের সঙ্গে শ্যামল দত্তরায়, সুহাস রায়, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত প্রমুখ অনেকের আঁকা নমুনা মিলিয়ে ব্যাপারটা দেখি তবে এমন স্কুলের প্রভাব স্পষ্ট হয়।

অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে সরাসরি আর কোনও যোগাযোগ গণেশ পাইনের থাকেনি ষাটের দশকের শেষ থেকেই। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের যে স্মৃতিমেদুরতা, একাকী অভিজাত পরিবেশ রচনা করার ইচ্ছা এবং নানান হিন্দু আইকোনগ্রাফির প্রতি টান তাও গণেশ পাইনের মধ্যে আজীবনের জন্যই সঞ্চারিত হয়েছিল। বেহুলা-লখীন্দরের থিম উপস্থাপনা, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ বা প্রদীপজ্বালা বেদি ইত্যাদি গণেশ পাইনের আজীবনের বিষয়। সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের যে ব্যাপকতা, ক্রমাগত নিজের স্টাইলাইজেশনের বদল বা জীবন শেষে ফোক্ আর্ট স্টাইলে আঁকা, এসব কিছুই গণেশ পাইনে নেই। আর অবনীন্দ্রনাথের স্কলারশিপ গণেশ পাইনের অধরাই ছিল, যেমন অবনীন্দ্রনাথের ইসলামিক জীবন নিয়ে ছবি আঁকার যে হঠাৎ-উৎসাহ, তা গণেশ পাইনের মধ্যে সাধারণত দেখা যায়নি। যে রোমান্টিসিজম থেকে অবনীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে শুধু ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা নয় বরং নির্বাচিত অতীতের বিশিষ্টতা দিয়েও শিল্পরচনা সম্ভব। ঠিক একইভাবে রোমান্টিসিজমকে গণেশ পাইনও যে গ্রহণ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

শিল্পী পল ক্লি-র ব্যাপকতা, বৌদ্ধিক নিরন্তর প্রশ্ন, মুক্ত একটা স্টাইলের ভেতর বাস, নানান শিল্প-ইতিহাসের আত্মীকরণ গণেশ পাইনের আকর্ষণের বিষয় হয়ে ওঠেনি। এমনকী পল ক্লি-র এতরকম গভীর সংবেদন, নির্মাণক্রিয়া ও বস্তুর গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা— তাও অধরাই ছিল গণেশ পাইনের। কিন্তু গণেশ পাইনের ছবির ক্ষেত্রে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল তিনি পল ক্লি-র নির্বাচিত ছবি আঁকার রূপারোপ নিজের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। এ ক্ষেত্রে এও লেখা দরকার, পঞ্চাশ ষাটের দশকে অনেক ভারতীয় এবং এশিয়ার শিল্পীই পল ক্লি-র দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। উনিশশো বিশের দশকে পল ক্লি-র ছবিতে যে ধরণের উপস্থাপনা দেখি, একটা স্টেজের নাটকীয় পরিবেশ পাপেট থিয়েটারের মতো, তার সঙ্গে গণেশ পাইনের ছবির একটা যোগাযোগ রয়েছে। সত্তরের দশকের ছবিগুলিতে— যেমন ১৯৭২-এর 'দ্য ফিশারম্যান', 'দ্য ফলিং বার্ড'

> শিল্পী গণেশ পাইনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বে যত অমিলই থাকুক না কেন, তাঁরা দুজনেই তাঁদের শিল্পকর্মে এমন নিঃসঙ্গতার, একাকিত্বের চর্চা করেন, তা যেন সমাজ-রহিত বিমূর্ততার মতো।

ইত্যাদি বিশেষত বিশের দশকের পল ক্লি-র ছবিগুলির কথা মনে পড়ায়। পল ক্লি-র ড্রইংয়ে রূপকথা, বিচিত্রতা না থাকলেও, তা থেকেও উৎসাহিত হয়েছিলেন গণেশ পাইন সহ অনেক ভারতীয় শিল্পী। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার, গণেশ পাইন উৎসাহিত হয়েছিলেন আর-এক জার্মান শিল্পী আলফ্রেড কুবিনের ড্রইং দেখেও। যদিও কুবিনের এরোটিসিজম থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। গণেশ পাইনের কোনও কোনও ছবিতে বা ড্রইংয়ে ফরাসি প্রতীকী শিল্পী ওডিলন রেঁদনের ছবির কথা মনে পড়ে।

রেমব্রান্টের ছবির কিছু কিছু মোটিফ গণেশ পাইন অনুসরণ করেছিলেন। যেমন রেমব্রান্টের ১৬৬১-১৬৬২-তে আঁকা 'Conspiracy of Julius Civilis' ছবিতে যেমন তরবারি দেখি, তেমনই দেখা যায় গণেশ পাইনের 'দ্য অ্যাসাসিন' ছবিতেও। তরবারি হাতে একজন মানুষ যেমন রেমব্রান্টের বহু ছবিতেই পাগড়ি পরা অবস্থায় রয়েছে, তেমন দেখা যায় গণেশ পাইনের ক্ষেত্রেও। আলো-ছায়ার পরিবেশ তৈরির জন্যেও গণেশ পাইন রেমব্রান্টের তুলনায় অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। গণেশ পাইনের রুচিবোধ বরং গথিকের দিকে ঝুঁকেছিল।

২

শিল্পী গণেশ পাইনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বে যত অমিলই থাকুক না কেন, তাঁরা দুজনেই তাঁদের শিল্পকর্মে এমন নিঃসঙ্গতার, একাকিত্বের চর্চা করেন, তা যেন সমাজ-রহিত বিমূর্ততার মতো। যেন সমাজকে বোঝা যায় না ধরে নিয়ে সমাজ থেকে দূরের এক নিঃসঙ্গ, একাকিত্বের মৃন্ময় চর্চা তাঁরা করতে চেয়েছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'শিকড়ের মতো, একা' কবিতায় রয়েছে এমন দুটো লাইন শুরুতেই, 'মাথার ভেতর শান্ত অগ্নি তাকে পাগল করেছে। সে বসে রয়েছে গর্ত খুঁড়ে মগ্ন শিকড়ের মতো'। এমন এই 'শান্ত অগ্নি' ও 'মগ্ন শেকড়' গণেশ পাইনের ছবিতেও বারবার এসেছে এবং গভীর মগ্নতা দিয়ে আঁকা বলেই গণেশ পাইনের ছবি প্রাথমিক ভাবে আকর্ষণও করেছে। তেমনই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'শব্দের ঝর্ণায় স্নান' কবিতায় রয়েছে 'কীটের প্রবৃত্তি থেকে কীর্তিনাশা অগ্নি জ্বলে দেখে ভয় পায় দুঃখ পায়'। এই যে কীটের প্রবৃত্তির সঙ্গে কীর্তিনাশা অগ্নি মিশে একাকার হয়ে যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, তেমন গণেশ পাইনেরও অসংখ্য ছবিতে হয়েছে। আবার কবি যখন লেখেন, 'অতগুলি বাগানের তীব্র ফল, আমি একা। অস্ত্রের গৌরবহীন/পড়ে আছি,' (কখনও বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস) সেই সময়ে আমাদের মনে পড়ে গণেশ পাইনের কয়েকটি ছবি। আসলে গণেশ পাইন ক্রমাগত চেষ্টাও করেছেন ছবিতে এমন কবিতার অভিজ্ঞতা তৈরি করতে।

যদিও একই সময়ের কবি ও চিত্রকর ছিলেন তাঁরা দুজন এবং কোথাও দুজন এমনভাবে মিলেও গিয়েছেন কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবি-জীবনে হ্যাংরি জেনারেশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কবি অ্যালেন গিনসবার্গের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া ছিল তাই কখনও প্রচলিত সামাজিক জীবনকে আঘাত করার ইচ্ছেও প্রবল হয়ে উঠেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। কিন্তু সেদিক থেকে দূরে সরেই ছিলেন গণেশ পাইন। বরং তিনি নিজস্ব মগ্নতায় কেবলই ব্যক্তিগত জাল বুনে চলেছিলেন, ফলে প্রায়ই তাঁর শিল্পে উঠে এসেছে মন কেমন-করা স্মৃতি বেদনা। গণেশ পাইনের ছবি হয়ে উঠেছে তাঁর ব্যক্তিগত হোম থিয়েটার। কিন্তু তবুও এত দরদ, ভালোবাসা ও একাগ্রতা দিয়ে তিনি ছবিগুলি এত নিটোলভাবে শেষ করতেন যে তা আকর্ষণও করেছে দর্শককে, সংবেদনশীলতা ও সূক্ষ্ম-কোমল অনুভবে।

৩

ছবিতে প্রাচীনের অনুভব, অভিঘাত দিতে চাইতেন গণেশ পাইন। তাঁর শিল্পী-মন ও অবচেতন মন বিম্বকে একটা আদি প্রতিমা হিসেবে উপস্থিত করত। বলা যায় প্রায়শই এমনভাবে বিম্বকে উপস্থিত করতে গিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের নানান উপকরণও নিয়ে আসতেন। যেমন প্রদীপ ও তার আলো, মানুষের হাড় ও করোটি। আর আসত খিলান, তোরণ, ধনুক, তরবারি এবং কখনও দেব-দেবীরাই, যেমন— গিরিধর গোপাল, দুর্গা ইত্যাদি। এই প্রাচীনতার প্রতি আসক্তির কারণে গূঢ় রহস্যময়তার সঙ্গে ছবিতে নিজের খেয়ালে গড়া এক সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচাও এসে উপস্থিত হত। যেভাবে এই বাংলারই আর এক শিল্পী কে. জি. সুব্রমণিয়ম দেব-দেবীকে কৌম অবস্থান দিতে পারেন, তাদের মানব-মানবী দিকগুলি তুলে ধরতে পারেন বা তাদের বহুরূপী অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করান, তা গণেশ পাইনের ছবির ক্ষেত্রে ঘটে না। এমনকী বিশ্বাসের জায়গাটা জোরালোভাবে উপস্থিত হয় না, যতটা হয় এক প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপট নির্মাণে। নাগরিকতার ইঙ্গিত কিছু কিছু ছবিতে অবশ্যই থাকে কিন্তু তবুও তা ছাপিয়ে ভরা অতীতের পুরাণকল্প ও প্রায় ঢেকে ফেলা অন্ধকার ছেয়ে যায় ছবিকে। একটা আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্ন শিল্পী গণেশ পাইনকে ক্রমাগত উদ্দীপিত করত এবং ছবি জুড়ে এমন প্রতীকের উপস্থিতি ছড়িয়ে রাখতেন যে প্রতীকগুলি জোর করে চাপানো না হয়ে বরং রহস্যময় আবহ তৈরি করত। যেহেতু ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিকতা রয়েই গিয়েছে, সেই কারণে তাঁর ছবির জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী, যাঁরা ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের ঘেরাটোপে থাকেন— তাঁরা কোথাও এত খিলান, প্রদীপের আলো, তির-ধনুক ইত্যাদিতে নিজেদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং এরা সবাই গণেশ পাইনের ছবির সংগ্রহকারী হয়ে ওঠেন। যদিও মনে রাখা দরকার, শিল্পী গণেশ পাইন সচেতন ভাবে তা করেননি, তা হয়ে উঠেছিল মাত্র।

ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে যে বাজার তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 'ভূপেন খাক্কর' বইতে বিখ্যাত শিল্প সমালোচক টিমোথি হাইম্যান লিখেছিলেন 'A Flourishing market remains in India for contemporary painting, as a commodity and status symbol' (Chemould Publications and Art, 1998)। এই পণ্যদ্রব্যও ধনসম্পত্তির প্রতীক বলে গণ্য হতে থাকে গণেশ পাইনের ছবিতে সত্তর দশকের শেষ দিক থেকেই। বলা ভালো, এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু সাধারণত বাঙালি শিল্পীদের ক্ষেত্রে এই দুটোই একসঙ্গে জোটেনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। স্ট্যাটাস-সিম্বল হলেও শিল্পকে পণ্যদ্রব্য করে তোলা সহজ কাজ নয়। যেহেতু সফল লোক এই সমাজে এত কম এবং একই সঙ্গে পণ্যদ্রব্য ও স্ট্যাটাস-সিম্বল হয়ে ওঠা বিশেষত দুষ্প্রাপ্য, তাই পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ায় নিয়মিতই গণেশ পুজো হয়েছে। আমাদের দেশের মিডিয়া নিজে থেকে সফলতাকে চিহ্নিত করতে পারে না। ফেনায়িত কথার জাল, অতিরঞ্জিত অতিকথনের ধোঁয়া— বুদ্ধিগত, যুক্তিগত সমালোচনাকে বারবার ঢেকে দেয়। এমন অবস্থায় এসব পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন তথাকথিত অনেক শিল্পী ও লেখক। যে দু'একজন তা পান, তাঁদের শরীরী ভাষাও কেবলই হয়ে উঠতে থাকে পলায়নের এবং এড়িয়ে যাওয়ার তাঁদের প্রতি, যাদের তাঁর নিজের প্রয়োজনীয় মনে হয় না। তিনি এই পলায়ন ও এড়িয়ে যাওয়ার থেকেই নিজেকে মহার্ঘ করে তোলেন।

৪

শিল্পী গণেশ পাইনকে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর দীর্ঘ সময় বেকার জীবন কাটাতে হয়। শিল্পীর নিজের ভাষায় 'বহুদিন, বহুবছর কোথাও কিছু না হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে আমায়। চাকরি খুঁজে হয়রান হয়েছি। জোটেনি একটিও।' সে সময় তার প্রেমিকারও অন্য কোথাও বিয়ে হয়ে যায়। ছোটোবেলাতেই বাবাকে হারিয়েছিলেন, শরিকি বিবাদ ও ঋণ ছিল তাঁর। বাড়ির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে বহুদিন সমস্যায় ছিলেন তিনি, বিবাদ ও বিষাদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর যৌবনের অনেকগুলি বছর

চলে গিয়েছে। এইসব কিছুই একজন মানুষের ভেতর সমাজ হারানোর একটা অনুভূতি দিতে পারে, তার ভেতর গভীর একাকিত্বের জন্ম দিতে পারে। এই একাকিত্ব তাঁকে ঠেলে দিতে পারে এক নিঃসঙ্গ কল্পনার দিকে যেখানে ফিরে ফিরে আসতে পারে জীবনের নানা স্মৃতি। গণেশ পাইন তারপর নামমাত্র বেতনে বহু বছর (১৯৬১-১৯৭৭) মন্দার মল্লিকের স্টুডিয়োতে অ্যানিমেশন ফিল্মের কাজ করেন, এই ফিল্মগুলি দেখাও গণেশ পাইনের ছবি বুঝতে পারার ক্ষেত্রে প্রয়োজন; কিন্তু ফিল্মগুলি কোথাও ইদানীং প্রদর্শিত হয়েছে বলে জানা নেই। গণেশ পাইনের ড্রইংয়ে যে অ্যানিমেশনের কার্টুন চরিত্রগুলির ড্রইং থাকে তার সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে তা পরিষ্কার, তাঁর অনেক ড্রইংয়েই বিশেষ আড়ষ্টতা রয়েছে। এই আড়ষ্টতা নজর এড়ায় না। আবার এই আড়ষ্টতাও হয়ে ওঠে গণেশ পাইনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

গণেশ পাইনের জীবনে আর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয় ১৯৪৬ সালে যখন তিনি ও তাঁর পরিবার দাঙ্গার মুখোমুখি হন। তাঁদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয় এবং কিছু দিন থাকতে হয় মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে। এই সময় তরুণ গণেশ পাইন একজন খুন হয়ে যাওয়া নগ্ন মহিলাকেও দেখেছিলেন যাঁকে তিনি ভুলতে পারেননি। এই স্মৃতিটাই রূপান্তরিত হয়েছিল তাঁর বহু ছবিতেই যা গণেশ পাইন নিজেই জানিয়েছিলেন তাঁর লেখায়। মানুষের হাড়, করোটি আঁকার প্রবণতাও এমন বিষাদের অভিজ্ঞতা থেকে হয়েছিল একদিন। যেমন সেই দাঙ্গাতেই তাঁদের প্রতিবেশী কার্তিক দত্তদের ঠাকুরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এই ঠাকুরবাড়ির নানান অনুষঙ্গ, গৌরাঙ্গের বিশাল দারুমূর্তি, শিউলতলায় প্রদীপ দেবার চত্বর, শানবাঁধানো প্রশস্ত উঠোন তাঁর ছবিতে বার-বার করে এসেছে। এমন মনে হয় বাস্তবে যা দাঙ্গায় বিনষ্ট হয়েছে তাঁকেই যেন ব্যক্তিগত ভাবে পুনর্নির্মাণ করতেন তিনি। তাঁর ছবিতে রং যেমন মনোক্রমেটিক ধূসর নীল হয়ে উঠত বারবার তাঁর কারণও হতে পারে এই ব্যক্তিগত বিষাদ। তিনি যে তাঁর নিজস্ব টেম্পারা মিডিয়াতে সাধারণত ক্যানভাসে ছবি আঁকতেন তা তাঁর আর্থিক সফলতাতেও বদলে যায়নি। তিনি কেমন আটকে গিয়েছিলেন নির্দিষ্ট একটি গণ্ডির মধ্যে। সফল অসংখ্য শিল্পীরাই যেমন ভিন্ন ভিন্ন সাইজে ছবি আঁকেন, এমনকী সুযোগ পেলে ম্যুরালও করেন, গণেশ পাইন তা কখনওই করেননি। এই ভাবেই তিনি ব্যক্তিগত থেকে যান, আশির দশক থেকেই সারা ভারতের চিত্রকলায় যে নানান পরিবর্তন এসেছিল, বিষয়ের দিক থেকেও সমকামী, নারীবাদী, রাজনৈতিক সচেতনতা ও উত্তর-আধুনিক কত ভাবনা, গণেশ পাইন তার থেকে দূরে থেকে গেলেন শিল্পী হিসেবে। বিষয়ের নানা দিক থেকেই সে কারণে তাঁর ছবির উল্লেখযোগ্যতা যেমন হারায়, তেমনই বিশেষ সফল ছবিগুলির ক্ষেত্রে তিনি হয়েও ওঠেন একক এবং স্মরণীয়।

ভাস্কর্যে যেমন নেগেটিভ স্পেস্ থাকে গণেশ পাইনের অসংখ্য ছবিতেই থাকে অন্ধকারের কোটর। যৌন অনুষঙ্গ না টেনে এনেও বলা যায়, এই ভাবে যেন এক মধ্যযুগীয় প্রাচীনতার দিকেই তাঁর ছবি কখনও মুখ ফেরাত। এক্ষেত্রে আধুনিকতাটি হল, এইসব চিহ্ন রূপদানের ভেতর অস্থিরতা...

শারীরিক ভাবে গণেশ পাইনের উচ্চতা বেশি ছিল না, তাঁর স্টুডিয়ো বলতে একটা ছোট ঘর মাত্র। সফল শিল্পীদের মতো বিশাল স্টুডিয়ো নয়। তেমন ছবিও দৈর্ঘ্যে বড় নয়। এ-যেন এক ছোট কিন্তু অনুভূতিময় উপস্থিতির প্রতি তার খোঁজ। তাঁর শিল্পকর্মে প্রতিবেশী কার্তিক দত্তদের ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা প্রভাব ব্যাপক ও কেন না ওই পরিবেশ তাঁকে স্থায়িত্বের, আশ্রয়ের এক অনুভব দিয়েছে, সৌন্দর্যবোধের কাঠামো নির্মাণ করেছে তাঁর মনে। আর প্রভাব পড়েছিল ঠাকুমার বলা নানান রূপকথার গল্পের। এসবই ছিল বাড়ির ভিটে নিয়ে যে শরিকদের বিবাদ, তার অ্যান্টি-থিসিস।

সমালোচক মৃণাল ঘোষের 'গণেশ পাইনের ছবি' বইটি গণেশ পাইনের শিল্প মানস জানার পক্ষে একটা আকর গ্রন্থ। সেখানে গণেশ পাইনের পারিবারিক জীবন-ইতিহাস সম্পূর্ণতার সঙ্গে লেখা হয়েছে। সেই বইতে রয়েছে তাঁদের পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানে বরকে পরতে হত সিল্কের পাগড়ি এবং তা ছিল একটা স্থায়ী পাগড়ি। আবার অষ্টধাতুর তৈরি একটা টরসো বা দেহকাণ্ডের বৃত্তাকার কোটরে রাখা হত শালগ্রাম শিলা। এই দুই মোটিফ্ গণেশ পাইনের ছবিতে বারবার ফিরে এসেছে। বিশাল পাগড়ি, টুপি পরা বাঁদর থেকে বালক নানান ছবি রয়েছে গণেশ পাইনের— তেমন অন্ধকার এক কোটর তো তিনি কতই এঁকেছেন। যেমন ১৯৭৮-এ আঁকা 'বিফোর দ্য চ্যারিয়ট', তাতেও রথের কোটরে রয়েছে একরাশ অন্ধকার, ১৯৯৪-তে আঁকা 'দ্য গেট' ছবিতেও দরজার ভেতরে একরাশ অন্ধকার। তেমনই ১৯৭৭-এ আঁকা 'দ্য ডোরস্ দ্য উইনডোজ'-এও দরজা, জানালার অভ্যন্তরে ঘরটা অন্ধকার। ভাস্কর্যে যেমন নেগেটিভ স্পেস থাকে, গণেশ পাইনের অসংখ্য ছবিতেই থাকে অন্ধকারের কোটর। যৌন অনুষঙ্গ না টেনে এনেও বলা যায়, এই ভাবে যেন এক মধ্যযুগীয় প্রাচীনতার দিকেই তাঁর ছবি কখনও মুখ ফেরাত। এক্ষেত্রে আধুনিকতাটি হল, এইসব চিহ্ন রূপদানের ভেতর অস্থিরতা, অসম্পূর্ণতার ছাপও থেকে যেত। পরম কোনও নিশ্চিত এসব ছবি থেকে উঠে আসে না। নাটক, সিনেমায় গভীর আকর্ষণ ছিল তাঁর। শিল্পী-জীবনের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটক থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুলনায় এক বৃহৎ ছবি এঁকেছিলেন তিনি। তিনি যে ছবির প্রেক্ষাপটকে স্টেজ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন কেবল তা নয়, ছবিগুলিতেও গভীর নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস করেন। তারপর পূজার বেদিতে জ্বলন্ত প্রদীপ, ছায়াঘেরা আলো, কখনও বিচিত্র-লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ও বিশাল পাগড়ি পরা মানুষজন তির-ধনুক বা তরবারি হাতে যেন বিগত কালের কোনও নাটক হয়ে উঠেছে— অভিনয় এখানে মানুষের জীবনের, চেতনার অংশ হয়ে ওঠে।

এই নাটক তিনি নিজের জীবন নিয়েও তৈরি করেছিলেন, যেমন অল্পবিস্তর আমরা সবাই করে থাকি। মৃণাল ঘোষের বইতে রয়েছে, ১৯৬০ সালে কাশ্মীর ঘুরতে গিয়েছিলেন গণেশ পাইন, ৬১-তে ওড়িশা, বিশেষত ভুবনেশ্বর ও কোনারক, ১৯৬২-তে দীঘা ও জোনপুট, যদিও ১৩৯৯ বাংলা সালের 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় গণেশ পাইনের নিজের লেখা 'জীবনপাত্রের মাধুরী'তে তিনি নিজেই লিখেছিলেন, 'আমার জীবনে ব্যাপ্তি নেই, বৈচিত্র্য নেই, ভ্রমণে আমার প্রবল অনীহা', পরেও অনেক ঘুরেছিলেন, ইউরোপ, মিশর গিয়েছেন তিনি।

Festival of India ১৯৮২-র 'Contemporary Indian Art' ক্যাটালগেও লেখা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে, 'He has always lived in Calcutta and almost never travels outside it.' তাঁর জীবনে ব্যাপ্তি, বৈচিত্র যদি নাই থাকবে তবে এত বছর ধরে তাঁর প্রেম এবং তিন দশক পর সেই প্রেমিকাকেই বিয়ে করা তো সচরাচর কোনও বাঙালি মধ্যবিত্ত করেন না।

গণেশ পাইন নিজেকে কীভাবে উপস্থিত করবেন শিল্পী সমাজে, তা নিয়ে তাঁর নিজের ভেতরই দ্বন্দ্ব ছিল।

গণেশ পাইনের ছবিতে ফিগারগুলি প্রায়শই এমনভাবে আঁকা হয়েছে যেন তারা রাজস্থানি কাঠের পুতুল। সিল্কের পাগড়ি, কাঠের ঘোড়া, খেলনা ইত্যাদিতে তারা যেন মানুষের আদল নিয়ে নাটক করছে। কখনও এমনও মনে হয় মানুষ রূপান্তরিত, পরিবর্তিত হচ্ছে কাঠের পুতুলে অথবা কাঠের পুতুলগুলি পরিবর্তিত হচ্ছে মানব-মানবীর নাটকে। এই রূপান্তরিত আকৃতির দিক থেকে দেখলে ছবিগুলিতেও যে প্রাণবত্তা আসে তাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। এবং সেদিক দিয়ে খুব উল্লেখযোগ্য ছবিগুলিকে আলাদা করলে তা সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত তৈরি করতে পারে।

তাঁর ছবিতে যে নারীরা রয়েছে তারাও কেমন রানির মতো এবং দূরের রহস্যময়তা তাদের ঘিরে থাকে। এমন অসংখ্য ফিগার তিনি এঁকেছেন, যারা বিস্ফারিত চোখে দূরের কোথাও কিছু দেখছে। তাঁর ছবিতে আবেগের তারতম্য তেমন নেই, একই ভাবে তাকিয়ে থাকা ফিগারও রয়েছে অনেক। ১৯৬৭-তে এঁকেছিলেন এক 'রাজকুমারী', দূরের সেই রানিই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে ফিরে আসে ১৯৯৬ সালের টেম্পেরায় আঁকা 'হার হ্যান্ড' ও ১৯৮৯-এ আঁকা 'দ্য লোটাস' ছবিতে।

যদিও গণেশ পাইন ফিগারেটিভ শিল্পী কিন্তু তিনি বাস্তবিক ভঙ্গিতে বা অ্যাকাডেমিক কায়দায় নগ্ন নারী-পুরুষ কখনও আঁকেননি। অন্তত বইতে তা দেখা যায় না। শিল্পী যোগেন চৌধুরী বা বিকাশ ভট্টাচার্যর ক্ষেত্রে যে নগ্ন শরীর আঁকার চর্চা দেখা যায় তা গণেশ পাইনে নেই। বরং বাস্তব প্রতিকৃতি আঁকার চর্চা তিনি করেছিলেন। কোথাও রক্ষণশীলতা কাজ করার জন্যই তিনি এঁকে উঠতে পারেননি নগ্ন শরীর, একথা বলা যায়। ফলে তাঁর ছবিতে পরবর্তীকালেও সরাসরি কোনও erotic বিষয়, যৌন প্রেম-সংক্রান্ত বিষয় কিছু আসেনি। সুররিয়েল (Surreal) ছবিতে অবচেতনে erotic দিক থেকে যে উন্মেষের ব্যাপার থাকে তাও তাঁর ছবিতে নেই। একান্ত ব্যতিক্রম হিসেবে ১৯৬৭-তে আঁকা 'দ্য ফাউন্টেন' ছবিটি বলা যায়।

৫

বিখ্যাত সমালোচক গীতা কাপুর গণেশ পাইনকে নিয়ে যে মন্তব্য করেন তার যথার্থতা রয়েছে: 'The locational ideology in an archaic and mock ironic form of ancestor worship is institutionalized in Calcutta and Santiniketan and carried as current legacy in Bengal by an artist like Ganesh Pyne' (*When was Modernism*, Geeta Kapur, Tulika Books, 2000) অর্থাৎ গণেশ পাইনের ছবিতে আধুনিকতা ঠিক কোথায় সেই প্রশ্ন উঠেই যায়। গণেশ পাইনের শুরুর দিকের কিছু ছোট ড্রইং ও গুয়াশে আঁকা ছবি সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনি রেস্তোরাঁয়, হোটেলে বসে মানুষের আড্ডার ছবি এঁকেছেন, হয়তো তাঁর বসন্ত কেবিনে বসে বন্ধু, পরিচিতদের সাথে গল্প করার কথা মনে পড়েছে তখন। এমনই সব ছবি রয়েছে ১৯৬৪-তে আঁকা, যেমন গুয়াশে 'Two Friends'। এই ধরণের ছবিকে আরও বিশদ, বিস্তৃত করে আঁকতে পারতেন তিনি তাতে নতুন পরিচয় চিহ্নও তৈরি হতে পারত, হয়তো শিল্পী হিসেবে খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দেওয়ার পরিসর কমে গিয়েছিল এবং নাগরিক বিষয়গুলিও কমে গিয়েছিল।

কখনও নাগরিক বিষয়গুলি একেবারেই থাকে না বইয়ের সচিত্র-করণের সময়ে। ১৯৭১ সালে গণেশ পাইন 'অর্ধকথনক' বইটির অলঙ্করণ করেন এবং ১৯৯০ সালে করেন 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' গ্রন্থের অলঙ্করণ। সাধারণভাবে তিনি যেমন ড্রইং করতেন এই দুটো বইয়ের সচিত্রকরণই তার থেকে আলাদা, যেন মুঘল-রাজস্থানি-মিনিয়েচার থেকে উৎসাহিত হয়ে ড্রইং করেছেন মাত্র, শিল্পী গণেশ পাইনের নিজস্ব উদ্ভাবনশীলতা এখানে নেই। অন্য দিকে, বিশেষত শেষের দিকের অনেক কাজেই বর্ণনা যত বেশি হয়েছে— অনুভব, সংবেদন তত থাকেনি। এই সচিত্রকরণের সমস্যা শিল্পী গণেশ পাইনকে বারবার তাড়া করেছে। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে, তিনিই আবার অনেক ছবিতে খুবই সফল হয়েছেন এমনকী শেষের দিকের কিছু কাজে ড্রইংও করেছিলেন কন্টি, চারকোলে এবং সাদা চকে যা খুবই সুন্দর এবং অনুভূতিময়তায় টলমল। সমাজ একজন শিল্পীকে মনে রাখে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলির ভেতর দিয়ে। সত্তর সাল থেকেই তেমন বেশ কিছু উদাহরণও রয়েছে গণেশ পাইনের ছবিতে।

সাধারণত তিনরকম ড্রইং করতেন তিনি। একটাকে তিনি বলতেন 'জটিংস', যা একটা ভিস্যুয়াল ডাইরির মতো ছিল। তাতে লিখতেন তিনি, উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতিও তিনি অনবরত লিখতেন, এইভাবে জটিংসের ভেতর দিয়ে 'পাঠক গণেশ পাইন' প্রকাশ পেয়েছেন। দ্বিতীয় ছিল তাঁর পরিণত টেম্পেরাগুলির জন্য খসড়া বা প্রস্তুতিপর্বের ড্রইংগুলি, সেখানেও দেখা যেত একই বিষয় নিয়ে তিনি নানান ইমেজ পাশাপাশি করছেন। এগুলি দেখাত পাশাপাশি রাখা সিনেমার ফ্রেমের মতো, প্রায়ই গভীর, অনুভূতি-পূর্ণ হত এই খসড়া ড্রইংগুলি। আলো-ছায়ার প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল, বিশেষত ছায়াকেই একটা ফিগারের উপস্থিতি দিতেন তিনি। তাঁর টেম্পেরার ছবিতেও ছায়াকে এমন শরীরী উপস্থিতি দিতেন, কোনও কোনও ছবিতে যেন ছায়াটাই একা একা চলে বেড়াচ্ছে বা কোথাও স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। রোমান্টিকতা ও স্মৃতিমেদুরতা দিয়ে আঁকতেন পুরোহিত, ফেরিওয়ালা, বাউল ইত্যাদি। যেমন ১৯৮৩ সালে মিশ্র মাধ্যমে আঁকা 'ব্যাগ-পিকারস'। আর তৃতীয় যে ধারায় তিনি ড্রইং করতেন তা হল মিশ্র মাধ্যমে পরিপূর্ণ একটা ড্রইং, এ যেন হয়ে উঠত তাঁর টেম্পেরার একটা বিকল্প ছবি। মিশ্র মাধ্যমের ক্ষেত্রে কন্টি, চারকোল, চক ব্যবহারের প্রবণতা গভীরভাবে ছিল তাঁর ভেতর। এই ধারায় সফল ড্রইং তিনি অনেকগুলিই করেছেন। যেমন *Fisherman, 2008* ড্রইংটি বা *The Lunatic, 2009*। গণেশ পাইনের গরুড় বা পাখিদেবতা আঁকার প্রবণতা ছিল কিন্তু তাকেই আবার রূপান্তরিত করে পাখি-নারী বা পাখি-পুরুষ এঁকেছেন যা ড্রইং হিসেবে খুবই সুন্দর। এবং এই রূপান্তরের কারণেই শুধুমাত্র পারস্পরিক থাকেনি তাঁর ছবি, সেখানে নিজস্ব সংবেদন তৈরি হয়েছে। মিশ্র মাধ্যমেও রংগুলি মিশিয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাব আনতে পেরেছেন।

৬

গণেশ পাইনের ছবিতে স্থাপত্যধর্মিতা রয়েছে, তার একটা সুসংবদ্ধ গঠন থাকে, এই কাঠামোগত দিকটি তৈরি করার জন্য ছবির নির্মাণে তিনি প্রায়শ ডিস্টোরশনের বা মোচড়ানোর উপায় নেন। এমন উপায় নেওয়া আধুনিক চিত্রকলার চালু পদ্ধতি। এবং একারণেই গণেশ পাইনের ছবির রূপায়ণ অ্যাকাডেমিক যথার্থতা দিয়ে তৈরি হয় না। সত্তর দশক থেকে তিনি যদিও ছবিটির যে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন, তার ভেতর নিটোলতা রয়েছে, হেলাফেলা করে বা দ্রুত তুলি চালিয়ে তিনি ছবি শেষ করতেন না, আবার অনেক ছবিতেই রাত্রি, জল, গাছের ডাল, শেকড়, পাতা, চাঁদ ইত্যাদি দিয়ে এক গভীর রাত্রির পরিবেশ তৈরি করতেন। যেমন ১৯৭২ সালে আঁকা টেম্পেরায় 'ফিশারম্যান' ছবিটি। আবার এই আপাত-পূর্ণতার পরিবেশে ছবির ভ্রান্তিও দর্শক ভালো করে খেয়াল করেন না কখনও। যেমন তাঁর দুটো বিখ্যাত ছবি রয়েছে যা ভালো করে উতরায়নি। ১৯৭৮-এ আঁকা টেম্পেরায় 'বিফোর দ্য চ্যারিয়ট'। চ্যারিয়েটটা জমে গেলেও সামনের ফিগারটি কোনো গভীর অনুভবই তৈরি করে না। তেমনই আরেকটি ছবি হল ১৯৭৯তে করা *'দ্য অ্যাসাসিন'*। ছবিটিতে নাটকীয়তা থাকলেও মূলত অভিব্যক্তিহীন থেকে গেছে ছবিটি, এমনকী *অ্যাসাসিন*-এর ফিগার তরবারি সহ জবরজং

মাত্র, ফিগারটার চারপাশে যা রয়েছে তারও কোনো স্বচ্ছতা নেই। গণেশ পাইনের *অ্যাসাসিন* বা ঘাতক মনে পড়ায়, রেমব্রান্টের 'Blinding of Samson', ১৬৩৬-এর ছবিটির কথা, দর্শকের দিক থেকে দেখলে বাঁদিকে তরবারি হাতে যে ঘাতকটি রয়েছে রেমব্রান্টের ছবিতে, তার কথা। গণেশ পাইনের বহু ছবিতে অতিরিক্ত কাজের সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে, যার ফলে ছবির রংও ভারী হয়ে থাকে, রং মিলে খণ্ড হয়ে ওঠার প্রবণতা থাকে। আবার এমন মনোযোগের কারণেই সফলও হয়েছে অনেক ছবি, হালে আঁকা 'The Bones' নামে যে ছবিটি রয়েছে দিল্লির ভাদেরা আর্ট গ্যালারিতে, আশ্চর্য সুন্দর, পূর্ণাঙ্গ একটা ছবি, ছবিতে দেয়াল জুড়ে হাড়-এর মালা রয়েছে এবং বেদিতে রয়েছে একটা প্রদীপ যার আলো দেয়ালটাকে আলো-অন্ধকারের একটা মায়াময় জগতে বদল করেছে। কোথাও কোনও বাহুল্য নেই কিন্তু ছবিটি সক্রিয় হয়েছে। তেমনই এক বিচিত্র অসহায় আবেগের সৃষ্টি হয় তাঁর আঁকা নানান পশু দেখলে— বিশেষত টোপর ও মালা পরা বাঁদরগুলি দেখলে। এক্ষেত্রেও এই পশুদের ভেতর রূপান্তরের ক্রমটা থাকে যেন এরা মানুষই, কেবল ভিন্ন আদল নিয়ে এসেছে। বা ফুলের বাগানেও তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথা থেকে যেন দড়িও বাঁধা রয়েছে। বাঁদরের সঙ্গে শিল্পীর যোগাযোগ রয়েছে অন্তত এই অর্থে দুজনেই প্রাথমিক ভাবে নকল করে এবং ভ্যাংচায়, বাঁদর যদি মানুষকে— তবে শিল্পী এই বিশ্ব জগৎকে। সেই অর্থে একটা আত্মসত্তা ও আত্ম-অবস্থানকে খোঁজ করেন গণেশ পাইন এই ছবিগুলির ভেতর দিয়ে। এমনই একটা ছবি, ১৯৯৭-এর 'দ্য জেস্টার' বা ২০০৯-এর 'The Blind Animal'। এবং এইভাবে টোপর পরা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা বাঁদর আঁকা তাঁর শুরু হয়েছিল ১৯৬৭-তে। এই আঁকাগুলি দেখলে মনে পড়ে পিটার ব্রুসেনের আঁকা 'Two monkeys' ছবিটির কথাও। সেখানেও শেকলে বাঁধা দুটো বাঁদর অসহায়, ভাবনা-পীড়িত অবস্থায় বসে আছে। শেষের দিকের এরকম অনেক টেম্পেরায় করা মুখগুলি ক্যানভাসের ওপর ফাঁকা অংশ বলে কিছু না রেখেই উপস্থিত হয়েছে, এই nead room না রাখা তাঁর শেষের দিকের ছবির একটা বৈশিষ্ট্য। যেমন তার 'ফিশারম্যান' কেবল মাছ ধরা একজন জেলে মাত্র নন, তার আঁকা পশুগুলিও তাই, অতিরিক্ত কিছুর প্রতি গণেশ পাইনের বিচিত্র আকর্ষণ। ফ্যানাটোস বা মর্ষকামিতা, মৃত্যু আকর্ষণ যেমন গণেশ পাইনকে এবং তাঁর সমস্ত শিল্পজীবনকে আকর্ষিত করে রেখেছে, তেমনই নস্টালজিয়া, স্মৃতিমেদুরতা, শৈশবের প্রতি আকর্ষণ থেকে তাঁর কিছু কিছু ছবিতে মানুষের ফিগারগুলিই যেন খেলনায় পরিণত এবং এই খেলনার জগৎকে ঘিরেই রাত্রির কিংবা দিনের রূপকথাগুলি গড়ে ওঠে তাঁর ছবিগুলিতে। কখনও মৃত্যু-আকর্ষণ এমন বেড়ে গেছে যে ছবিতে কঙ্কাল বা করোটির আধিক্য ঘটে গেছে। আবার ১৯৯৭-এর ছবি 'Remembering Apu' ছবিতে শৈশবের দিকে তিনি চলে গিয়েছেন। কখনও যেন মনে হয় পরিণত গণেশ পাইন বদলে গিয়েছেন তাঁর বালকবেলার দিনগুলিতে। এমনই আরেকটা ছবি হল ১৯৯৭-তে 'দ্য উডেন হর্স'। এই ছবিতে তাঁর আত্ম-প্রতিকৃতিটি অ্যাকাডেমিক ভাবেই করা কিন্তু পুরো ছবিটিতে তিনি যেমন ডিস্টোর্শন করেন, তার ফলে খসড়া ড্রইংটির মতো উতরোয়নি টেম্পেরা ছবিটি। বরং এরস তাঁর ছবিতে পরোক্ষভাবে থাকে। শিল্পী হিসেবে তাঁর এই সীমাবদ্ধতা ফিগারেটিভ শিল্পী হয়েও তিনি অতিক্রম করতে চাননি এবং এই সীমাবদ্ধতার ভেতর তাঁর শিল্পীসত্তার খোঁজ করেছেন। প্রতীক ও প্রতিমাকে তিনি মেশাতে চেয়েছেন তাঁর চেনা চৌহদ্দির ভেতর। সংস্কারের অন্ধকারও তাঁকে ঘিরে ধরেছে। যে স্যাঁতস্যাঁতে, গলিময়, মধ্যযুগীয় কলকাতা রয়েছে, যে প্রাচীন, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবীয়, পুরাণ-নির্ভর জীবনধারা রয়ে গিয়েছে কোথাও কোথাও, যে তুলসীতলা, প্রদীপজ্বালা অন্ধকার, গণেশ পাইনের ছবি সেই চেতনার সারাৎসার হয়ে ওঠে। শিল্পী হিসেবে তাঁর সততা এখানেই, তিনি যেমন, তিনি তাই আঁকতে চেয়েছেন। না বদলাবার ব্যর্থতা যেমন থেকে যায়, প্রত্যয়ের বিশ্বাসযোগ্যতাও থাকে। অপস্রিয়মাণ, বিলীয়মান জগতের কবি হয়ে ওঠেন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে। কুহকী আমেজ মর্মেমর্মে বোঝা যায়, যা ঘিরে রেখেছে আলো-ছায়া ঘেরা দেয়াল, কাটাছেঁড়া শরীরের আভাসও রয়ে গিয়েছে 'দ্য হ্যান্ড' (১৯৯৮)-এর মতো ছবিতে। গণেশ পাইন হয়ে ওঠেন আমাদের ভেতর বয়ে চলা প্রাচীন এক ভারতের শিল্পী প্রতিনিধি। আত্মগত অবক্ষয়ের ভেতর থেকেই নন্দনবোধ জেগে উঠেছিল তাঁর।

গণেশ পাইনের কিছু ছবি সম্পর্কে বলা যায়, যা নিশ্চিতভাবে পশ্চাদমুখী, যেমন বেহুলা-লখীন্দর নিয়ে তাঁর ছবি, এ যেন প্রাচীন হিন্দু মূল্যবোধের প্রত্যাবর্তন। কিছু কিছু ছবি হয়েই দাঁড়িয়েছে নতুন চেহারা-দেওয়া পুরনো জিনিসের মতো। যদিও সাধারণভাবে তিনি ঝুঁকেছিলেন সেকুলার মিস্টিসিজমের দিকেই অর্থাৎ তিনি ছবির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে চাইছেন ইহজাগতিক অতীন্দ্রিয়তার মতোই কোনো মরমি অনুভব। সত্তর দশক থেকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি এমন উদ্দেশ্য নিয়েই আঁকা হয়েছে। তবে খসড়া ড্রইংয়ে তিনি যেমন বিম্বটির নানান সম্ভাবনাগুলিকে পাশাপাশি আঁকতেন এবং অন্যরকম লিখতেন, তাতে উদ্ধৃতি দিতেন তা যদি তাঁর টেম্পেরা ছবিগুলিতেও আরও বিশদভাবে করতেন, তবে সমসাময়িকতার দিক থেকে আরও নতুন অর্থপূর্ণ হতে পারত ছবিগুলি। আড়ষ্টতার কারণেই তিনি তাঁর খসড়া ড্রইংগুলি থেকে আরও যে কত সম্ভাবনা আছে তা ভাবেননি। তবুও তাঁর নির্বাচিত ড্রইংয়ের বই প্রকাশ করে এখনও মূল্যায়ন হয়নি এমন গণেশ পাইনকে সামনে আনা যেতে পারে। ছবি আঁকার অভিনিবেশে যে গভীরতায় তিনি ঢুকতে চাইতেন বা ঢুকেওছেন কখনও, তা খুবই আকর্ষণ করে একজন পর্যবেক্ষণকারীকে। তিনি নিজেকে জর্জরিত করেছিলেন ছবির এই অন্ধকার মঞ্চে অভিনীত ক্রমাগত নাটক দিয়ে। তার অস্তিত্বই ক্রমাগত জন্ম দিয়েছে এই অন্ধকারের কবিতা।

ছবির ভেতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানাও তৈরি করেছিলেন যাতে ভিড় করে আসত নির্বাচিত পশুরা। এমন ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা নির্মাণ— বিংশ শতাব্দীর অনেক লেখক, শিল্পীর ঝোঁক। আমাদের মনে পড়ে ফ্রাঞ্জ মার্কস, পল ক্লি, পিকাসো থেকে ফ্রাঞ্জ কাফকা, জর্জ লুই বোরহেসকেও। গণেশ পাইনের চিড়িয়াখানাতে ঘটে চলে পশুতে, মানুষের মধ্যে কত রূপান্তর। নির্মীত হয় মাঝখানের কোনও ধূসর অঞ্চল। হাড়, কঙ্কাল ইত্যাদির ভেতর দিয়ে ভীতিভাব এসেছে তাঁর ছবিতে, যা সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে মেলানকোলিয়ায়, মধুর বিষণ্ণতায়। তীব্র আকর্ষণ শিল্পী গণেশ পাইন অনুভব করেছেন এমন বিষণ্ণতায়, এসেছে অদ্ভুত কোনও ক্যারিকেচারও। মৃত্যুকে ঘিরে হয়ে চলে মশকরার নাটক। মানুষের নড়বড়ে হাড়ের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ঘটে যেখানে। কত কাটাকুটিতে তাঁর একটা ড্রইং নির্মাণ হত। তিনি যেমন নানান আধারে আলোর শিখা আঁকেন, তেমন পোকাও আঁকেন, এভাবেই মৃত্যু ও জীবনের একাত্মতা প্রকাশিত হয়। সমকালেরও একটা পরোক্ষ, বিলীয়মান উপস্থিতির উদ্ভব হয়। পুরো শিল্পী-জীবন জুড়েই গণেশ পাইনের মনে হয়েছে, তিনি লিখেছেনও বারবার যে, হৃদয়হীনতা, বিপর্যয়, হতাশার ভেতর দিয়ে সমকালের যে প্রত্যক্ষ বাস্তবতা, তার সঙ্গে তাঁর কল্পনা-প্রবাহের সরাসরি যোগ তিনি নির্মাণ করে উঠতে পারছেন না। একথা সত্য হয়েও, পুরো সত্য নয়। আংশিক যোগ, পরশ যোগ তাঁর ঘটেই যেত বাস্তবতার সঙ্গে— কিন্তু তা সরেও থাকত ব্যক্তিগত মননের জোরে।

অনিল আচার্য সম্পাদিত 'অনুষ্টুপ' ৪৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ২০১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ইন্দ্রনাথ মজুমদার

যুগাবসান। পঁচিশে বৈশাখ প্রথম বিকেলে শেষ নিশ্বাস। বাঙালি চৈতন্যচর্চার জগৎটা তো দরিদ্রতর হয়েই চলেছে; ইন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে শেষটুকুও নিঃসম্বল হল। ইন্দ্রনাথ মজুমদার মানে বাংলার বিদ্যাচর্চার এক অভয়াশ্রয়, বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত থেকে শুরু করে অনামা, অখ্যাত গবেষক, লেখক, ছাত্রের জন্য এক উন্মুক্ত অঙ্গন। গ্রন্থের অন্বেষক, ভাণ্ডারী, নির্মাতা, সন্ধানদাতা ও সরবরাহকারী— তাঁকে গ্রন্থবিদ বললেও কম বলা হয়। আশি বছরের জীবনের তিন-চতুর্থাংশই নিবেদিত গ্রন্থবিদ্যার তন্নিষ্ঠ-চর্চায়, যে-চর্চার অন্তর-প্রেরণা জ্ঞানানুশীলনের মানবকল্যাণমুখী ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা।

জন্ম ১৯৩৩ সালে; অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে চলে আসেন সীমান্তের এপারে। সেই যে সীমানা ছাড়ানো শুরু, সারা জীবন জুড়ে তার অনন্ত বিস্তার। কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে প্রথম যৌবন— ঘুরতে ঘুরতে লোক চেনা, লোকসমাজকে চেনা, লোকসংস্পর্শে লোকজিজ্ঞাসা, জ্ঞানজিজ্ঞাসা। নিজের জন্যই খোঁজা নয়— অনেকের জন্য, বিপুল অসংখ্য অনুশীলকের জন্য—যার উত্তর পেলেন গ্রন্থজগতে।

এককালে বাংলায় বুদ্ধিচর্চার কেন্দ্রবিশেষ, নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ'-এর প্রকাশনার সঙ্গে যোগের সূত্র ধরে প্রকাশনার দুনিয়াতে পদার্পণ, বিধান ছাত্রাবাসে স্বল্পকালের সুপারিনটেনডেন্ট-এর চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি বইয়ের জগতে আত্মনিয়োগ। ১৯৬২ সালে 'সুবর্ণরেখা'-র প্রতিষ্ঠা, এখন যার দপ্তর ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড-এ। তখন থেকেই চলছে গ্রন্থ অনুসন্ধান ও সংগ্রহ, ছাত্র, গবেষক, পণ্ডিতদের হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া দুষ্প্রাপ্য, অমূল্য সব মণি-মাণিক্য।

গ্রন্থবিদ্যার চর্চায় ঘুরে বেড়িয়েছেন মাইলের পর মাইল, নানান জায়গা থেকে সন্ধান করে তুলে এনেছেন বিরল গ্রন্থরাজি। বাংলার বিদ্যানুশীলকদের মধ্যে এমন লোক কমই আছেন, যিনি ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সাহায্য পাননি। এক গবেষকের কথায়, 'ইন্দ্রদা-র সাহায্য ছাড়া কত লোকের কত কাজ যে অপূর্ণ থেকে যেত তার ঠিক নেই।' কথাটাতে এক বিন্দু বাহুল্য নেই। বাস্তবিকই, বিদ্যানুসন্ধানের কাজে ইন্দ্রনাথ মজুমদারের গ্রন্থভাণ্ডারটাই শুধু নয়, জ্ঞানভাণ্ডারটাও ছিল অপরিহার্য।

সংগ্রহ তো অনেকেরই থাকে, দোকানে দোকানে থরে থরে সাজানো আছে বই; গ্রন্থাগারে, ফুটপাথের পুরোনো বইয়ের দোকানে, অধুনা ইন্টারনেটে, বইয়ের বিপুল সম্ভার। কিন্তু, কোনটা কার কাজে লাগবে, সে জ্ঞানটা থাকে গ্রন্থবিদের, সেই বিদ্যায় ইন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিষ্ঠান। ছাত্র, গবেষক, লেখক, অধ্যাপক, শিল্পী, প্রত্যেকের কাছেই ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সুবর্ণরেখা হয়ে উঠেছিল এমন এক সরাইখানা, যেখানে আশ্রয় না নিলেই নয়।

গ্রন্থবিদ্যাচর্চার শুরু থেকেই নানান নক্ষত্রের সাহচর্য; অনেকের নক্ষত্র হয়ে ওঠাতেও তাঁর বিপুল অবদান। কিন্তু তিনি যে গ্রন্থপথিক এটা এক মুহূর্তের জন্যও কেউ তাঁকে বিস্মৃত হতে দেখেনি। বিশ্বাসে বামপন্থী, কিন্তু অন্য মতাবলম্বীদের সঙ্গেও তার অকৃত্রিম সখ্য— সে মৈত্রীর বন্ধন ছিল জ্ঞানানুশীলন ও তার মাধ্যম বই। এত এত খ্যাতিমান যাঁর বন্ধু, তাঁর কাছে অখ্যাত বিদ্যানুসন্ধিৎসুরও সমান আদর, সেও তাঁর স্নেহভাণ্ডারের সমান অংশীদার।

১৯৮৪ সালে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য অম্লান দত্তের সক্রিয়তায় শান্তিনিকেতনে 'সুবর্ণরেখা'-র শাখা খোলেন। তখন থেকে বাঙালি মননের কাছে শান্তিনিকেতনের অন্যতম— অনেকের কাছে একমাত্র— আকর্ষণ হয়ে উঠল 'সুবর্ণরেখা'। শুধু বইয়ের সন্ধান দেওয়া বা বই জোগাড় করে দেওয়া নয়, আগ্রহীদের আর্থিক অসহায়তার বাধা দূর করাটাও তাঁর কাজের মধ্যে পড়ত। শান্তিনিকেতনের 'সুবর্ণরেখা'-য় একবার এক অল্পবয়সী ছেলে পরপর তিনদিন ধরে একটা বই পড়ে চলেছে— সেখানে বই পড়ার বাধা তো নেইই, বরং বসে পড়বার জন্য মোড়ার ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় দিন ছেলেটিকে ডাকলেন, পাশে বসিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন। বললেন পরের দিন যেতে। কথামতো ছেলেটি ঢুকেছে; তখন সেখানে বসে অমর্ত্য সেন; সদ্য সদ্য নোবেল পেয়েছেন, তাঁকে ঘিরে আরো কয়েকজন খ্যাতিমান পণ্ডিত, ঔপন্যাসিক, চিত্রতারকা। ছেলেটি সংকুচিত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আড্ডার ভেতর থেকেই ইন্দ্রনাথের ডাক— 'এদিকে এসো হে!' যেতেই হাতে ধরিয়ে দিলেন কয়েকটা বই: 'নিয়ে যাও। তাড়াতাড়ি পড়ে ফেরত দিয়ো। এগুলোর গ্রাহক আছে; ব্যবসা করি তো!' বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। কোনোভাবেই সে বইগুলো তরুণের নাগালে আসত না।

একবার এক বিখ্যাত লোক দোকানে সাজানো একটা দামি বই নিয়ে কাউন্টারে গেলেন। পাশে মোড়ায় বসা ইন্দ্রনাথের প্রত্যাখ্যান— ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর, এক দৃশ্যত সম্বলহীন ছেলে ঢুকল। ইন্দ্রনাথ তার হাতে বইটা দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যাও হে! এটা এখানে রাখা যাচ্ছে না, লোকের নজরে পড়ছে। আটশো টাকা দাম, নতুন কিনতে আড়াই হাজার লাগবে। তুমি মাসে একশো করে আট মাসে শোধ দিয়ো, তা হলেই হবে।' নির্ভেজাল হাসিমুখে খ্যাতিমানকে বললেন, 'ও বইটা ওরই বেশি দরকার। আপনার তো এটাতে তেমন কাজ নেই, সংগ্রহ বাড়ানো ছাড়া!'

লোক দেখানোর জন্য ঘরে বই সাজিয়ে রাখার প্রতি স্পষ্ট বিরক্তি ছিল। একবার এক অধ্যাপক পরামর্শ চাইলেন, বইতে পোকা লাগছে, কী করবেন। ইন্দ্রনাথের চটজলদি সমাধান— 'বই পড়ুন, পোকা লাগবে না। বই ভালো রাখার আর কোনো ওষুধ নেই, পড়া ছাড়া। পড়তে না চান দান করে দিন। তাতেও যদি রাজি না থাকেন, আমাকে বিক্রি করে দিন— কিনে নেব!'

শারীরিকভাবে ভালো থাকার নিয়মকানুনগুলো কোনোকালেই মানেননি। গ্রন্থবিদ্যায় চর্চায় যিনি এত সুশৃঙ্খল, নিজের দেহ সম্পর্কে ছিলেন ততটাই অগোছালো। শেষদিকে শরীর বড়ো বেশি প্রতিশোধ নিচ্ছিল। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোডে বসছিলেন না অনেকদিন। এ বছরের গোড়া থেকেই শান্তিনিকেতনের 'সুবর্ণরেখা'তেও আসতে পারতেন না। নিজেও বুঝতে পারছিলেন, অন্যরাও— যাবার সময় হল। চলে গেলেন।

মজা করে বলতেন, 'আমি তো ব্যবসায়ী— পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।' ব্যবসায় কথাটার তো অনেক অর্থ— তার একটা হচ্ছে একনিষ্ঠ। বাংলার সমাজে এমন একনিষ্ঠ গ্রন্থপথিক আর আসবে? গ্রন্থবিদ্যার শ্রম-পবিত্র অনুশীলনের সেই পথটা ধরে কজনই বা হাঁটতে পারেন? যাঁরা পারেন তাঁদের হাত দিয়ে যুগারম্ভ— তাঁদের মৃত্যুতে যুগাবসান।

অশোক মিত্র সম্পাদিত 'আরেক রকম' ১৬ মে, ২০১৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত। কৃতজ্ঞতা: সমাজচর্চা ট্রাস্ট

কবিতা-পরিচয়

ফুল ফুটুক না ফুটুক: সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শঙ্খ ঘোষ

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শানবাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
— তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধরে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।

'বসন্ত' শব্দটি এই কবির রচনাকে ক্রমশ তার নিজের ভেতর দিকে টেনে নিচ্ছে। পদাতিকের দিনগুলোতে মনে ছিল একরোখা যৌবন, গলায় ছিল বাঁকা সুর, তাই এই ধরণের কথা: 'সদলে বসন্ত তাও পদত্যাগপত্র পাঠাবে না?' অথবা 'বসন্ত সত্যিই আসবে? কী দরকার এসে?' কিন্তু অগ্নিকোণে এসে বিমুখ বসন্তের প্রয়োজন বোঝা গেল: 'পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে।' এই ছবিতে লেগে থাকে নিশ্চিত সফলতার আশ্বাস, সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার দীপ্ত ভরসা। কিন্তু পোড়া মাঠে কি বসন্ত তার সমস্ত সম্ভার নিয়ে জেগে উঠতে পারে শেষ পর্যন্ত? সন্দেহের কি কিছুই থাকে না, নেতির কোনও চিহ্ন? তার উত্তরে জানতে পাই এখন: 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।' নিরাশ্বাসের বস্তুপরিবেশকে মেনে নিয়েও যখন তার থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই, তখন স্পর্ধার স্বরে বলতে পারি 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।' তাই কবিতাটি লেখবার মাত্র দশ বছরের মধ্যে এখন এটি এক প্রবাদপ্রতিম লাইন।

অবশ্য প্রবাদে পর্যবসিত হওয়ার আরও একটি কারণ আছে হয়তো। আটপৌরে-শব্দে-ভরা ছন্দোমুক্ত সমস্ত কবিতাটির এই একটিমাত্র অংশে সহসা এসে গিয়েছে (হয়তো সচেতনভাবেও নয়) অন্তর্লীন ছন্দের দুল্‌কি, যা পাঠকের শ্রুতিতে মুহূর্তমধ্যে নিবিষ্ট হয়ে যায়। ধরা যাক, এই কটি কথা: ফুটুক, ফুটুক, বসন্ত। একে যদি টুকরো করে সাজাই: ফুটুক্/ফুটুক্/বসন্/-তো, তিনটি অংশেই থাকে একটি স্বরান্ত একটি হসন্ত সিলেব্‌ল, ফলে বেশ একটা নিয়মিত ধরণে স্বরাঘাত (অ্যাক্‌সেন্ট) পড়ছে, শব্দগুলির মধ্যে চলে আসছে কুচকাওয়াজের ভঙ্গি। প্রতি অংশে এখন জুড়ে দেওয়া যাক্ একটি করে অতিরিক্ত সিলেব্‌ল— (ফুল) ফুটুক/ (না) ফুটুক/ (আজ) বসন/-তো। এবার যদি দ্রুত পড়ি সবটা 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত'— তাহলে রক্তের তালে স্পর্ধিত পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে শেষ 'তো' ধ্বনিটিতে মাথা উঁচু করে তুলতে ইচ্ছে হয় এবং তখন বোঝা যায়, বাণীতে-বিন্যাসে মিলিয়ে কথাটি যে এ-যুগের কবিতাপাঠকের মনে গেঁথে যাবে, তা খুব স্বাভাবিক।

কবিতাটির প্রথম অংশ পড়তে গিয়ে বেশি কোনও জটিলতা দেখি না। শানবাঁধানো ফুটপাতে কাঠখোট্টা গাছের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চেনা কলকাতার নাগরিক পট বিস্তৃত হয়ে পড়ল, পাঁজর-ফাটানো হাসি নিয়ে গাছটি অবশ্য সরে দাঁড়াল একটু দূরে, আপাতনিরাসক্ত কৌতুকে, কবির মতো। পাথর থেকেও জীবনরস সংগ্রহ করে দাঁড়াতে হয় নগরনির্ভর এই গাছটিকে। অতঃপর দেখা দিচ্ছে বাস্তব জীবনযাত্রার চলচ্চিত্র। অন্ধকার এবং মৃত্যুতে মাখানো দিনগুলো চলে যাচ্ছে, কোকিলডাকা হরবোলা ছেলেটাও হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের মধ্যে, আর এইসব ভাবনা ভাবছিল 'এ গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে'।

এইখানে এসে একবার থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। আইবুড়ো মেয়ে? রেলিঙে বুক চেপে ধরে আইবুড়ো, এক কালোকুচ্ছিত মেয়ে এইসব সাত-পাঁচ ভাবছিল, এই কথার পর এখন গায়ে-হলুদ, হল্‌দে চিঠি, আইবুড়ো, প্রজাপতি শব্দগুলি একত্র সঞ্চিত হয়ে হঠাৎ আবার টান দিয়ে নিয়ে আসে পুরোনো লাইন: 'ফুল ফুটুক না ফুটুক'। যেন এই কথাগুলি এখন আয়তনে

অনেক বেড়ে যায় কবিতার কৌশলে, গোপনে গোপনে বিয়ের সঙ্গে ফুল শব্দের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, এবং তখন, যে লাইনটিকে আগে ঠিকই ভেবেছিলাম মাথা-উঁচু-করার স্বর, তার মধ্যে, এখন এসে মিশে যাচ্ছে কিছু-বা বাষ্প-আভাস, করুণার টান। ফুল ফুটুক না ফুটুক, তবু, আজ বসন্ত— এই পৌরুষময় স্বীকৃতির সঙ্গে কথাটিতে এক প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাস এসে ভর করছে: ফুল ফুটুক না ফুটুক, হায়, আজ বসন্ত। স্পর্ধা-করুণার এই মিশ্র স্বরেই লাইনটি আরও ঋদ্ধ হয়ে ওঠে, আরও স্তরান্বিত, আরও বাস্তব।

প্রজাপতিটির কথাও ভেবে দেখা যায়। 'আ মরণ' কথাটির কণ্ঠস্বর লক্ষ করলে ধরতে পারি, পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া এই প্রজাপতি কিন্তু পদাতিকের প্রজাপতি নয়। 'ও সব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া/আমরা তো নই প্রজাপতি-সন্ধানী,/ অন্তত আজ মাড়াই না তার ছায়া' এ-রকম নিষ্ঠুরভাবে এখন আর কবি বলছেন না, একটু মায়া কোথাও লাগছে। কিন্তু তাই যদি, যদি মায়াই লাগছে, তবে কেন অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে দড়ি-পাকানো গাছটি হাসছে তখনও? লক্ষ করতে হবে যে এখন আর সূত্রপাতের কাঠখোট্টা গাছটির পাঁজরফাটানো হাসি নেই, আইবুড়ো মেয়েটির প্রসঙ্গ এসে যাওয়ার পর এখন সে-অট্টহাসি নিশ্চয় অমানবিক হত, এখন আসছে একরকম মুখচাপা হাসি। যেন, 'তুমি তো জানো না, আমি সব জানি'! কিন্তু কী জানো না? প্রজাপতি-সন্ধানী মনের দিকে ব্যঙ্গ করে এই হাসি? তাহলে তো সেই মায়াকরুণার প্রশ্ন ওঠে না কোনও। না, আক্রমণ তাকে নয়, হাসির আক্রমণ মধ্যবর্তী এই লাইনটিকে: 'তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ'। দরজা বন্ধ করে এইভাবে বহির্বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করছ, এমন ভুল মেনে নেয় না জীবন— এই ভেবে ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে মুখচাপা হাসি হাসতে থাকে দড়িপাকানো গাছ, নিয়তির মতো।

অন্য একটি কবিতায় লিখেছেন কবি: 'এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে/দেখ/ আমি জটায় বাঁধছি বেদনার আকাশগঙ্গা'। বেদনার আকাশগঙ্গা মাথায় নেওয়ার সময়ও পৃথিবীতে ভর করে দাঁড়ানো চাই। এই বেদনার এবং পৃথিবীর ভর এ-কবিতাটির মধ্যে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছে, এইরকম মনে হয়।

২

বেদনা এবং পৃথিবীর ভর কবিতাটির ভেতরদিকে অনুস্যূত হয়ে আছে, কিন্তু কবি তাঁর এই দুই ভূমিকাকে আপাত-স্বাতন্ত্র্যেও সাজিয়ে নিয়েছেন কবিতায়। একদিকে এই কবিতার স্থির অধিনায়ক গাছ, পৃথিবীতে ভর দিয়ে সে ভবিতব্য জানছে— অন্যদিকে বর্তমানে আবিষ্ট চলমান নগরজীবনের ছবি। দুটির মধ্যে কবির দুই পৃথক্ অস্তিত্ব। এবং সেই কারণে প্রথম তিনটি স্তবক শেষ হওয়ার পর নতুন চলনের (movement) সূত্রপাত, একটু ডানদিকে সরানো পরবর্তী অংশ।

এই নতুন অংশে গতির ভঙ্গি এল ভিন্ন ধরণে, সমধর্মী শব্দের একরকম স্তিমিত পুনরাবর্তনে: 'কালো ঠুলি পরিয়ে/ তারপর খুলে/...শুইয়ে দিয়ে/ তারপর তুলে...', 'ফুল ফুটুক'-এর দ্রুতদোলন চাল এখন আর নেই। পরিয়ে খুলে শুইয়ে দিয়ে তুলে— এইসব অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পরস্পর বাহুল্যেও ক্ষান্তিহীন ক্লান্তির ছায়া তৈরি হয়, এমন দিনযাপনের প্রত্যাবর্তন আর আমরা ফিরে চাই না। দিনরাত্রির নির্জীবতার ছবিও এখানে ফুটছে ভালো: দিনের পর রাত্রির পর আবার দিন, কিন্তু কালো ঠুলির (রাত্রি) ব্যবহারের পর চোখ এখন নিষ্প্রভ দেখে পরবর্তী দিনকে, আলো আর উজ্জীবনী থাকে না। মৃত্যুর মতো ঘুম থেকে মানুষকেও যখন আবার তুলে আনা হয় দিনের মাঝখানে তখন সে যেন আর তার প্রতিষ্ঠিত আত্মচরিত্রে নেই; সময় এখন তাকে ব্যবহার করে জীবনহীন পুতুলের মতো। তাই 'আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে/ তারপর খুলে/ মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে/ তারপর তুলে/ যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে' তারা আর যেন না ফিরে আসে। কিন্তু এ-সব কার ভাবনা? এখনও জানি, কবির। ফিরে যে আসবে না, তার শর্ত কী? এখনও তা জানি না আমরা।

যে হরবোলা ছেলেটিকে আর দেখা যায় না এখন, প্রেম ('কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত') ও করুণার ('একটা দুটো পয়সা পেলে') চিহ্ন নিয়ে যে সরে যাচ্ছে জড়ত্বময় দিনগুলোর টানে— সেখানে পৌঁছে আরেকটু বিশেষ-ছবি ধরা পড়ল, কিন্তু এখনও কবিতার কেন্দ্রে আসিনি। কবি যে তাঁর 'কথাগুলোকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে' চান এবং প্রত্যেকটি ছায়ার চোখ ফোটাতে চান, সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে পরবর্তী স্তবকে, যেখানে একেবারে চরিত্রের মুখোমুখি এসে পড়লাম, কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো এক মেয়ের চরিত্রে। স্পর্শগ্রাহ্য এই চরিত্রটির সামনে এসে জানলাম, দিনগুলোর বিষয়ে ওই-সব নৈরাশ্যময় অভিভব তবে কবিরই নয়। ওর মধ্যে আছে নাটকীয় টান, আমরা পূর্বতন স্তবক দুটিকে পাচ্ছি আসলে মেয়েটিরই ভাবনাসূত্রে।

তখন, গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেল কেবল কনে-দেখা-আলোর অলংকৃত বর্ণনা হিসেবে থাকে না, বরং পুঞ্জ হয়ে ওঠে মেয়েটির হৃদয়ভারে। তেমনি, তারই ছিন্নস্বপ্নের টানে দেখা দেয় 'লাল কালিতে ছাপা হলুদে চিঠির মতো আকাশ'। অবশ্য, কৌশলের দিক থেকে বুঝতে পারলেও (অথবা সেইজন্যই হয়তো) এ-লাইনটি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে টানে না, দুর্বল প্রতিমা বলেই বোধ হয়, যদিও অনুমান করি যে অনেক পাঠকের পক্ষে এটি মুগ্ধতাজনক। এ আকাশ তো ঠিক প্রান্তিক আকাশ নয় যে সায়ন্তনী রঙের কথা ভেবে মেনে নিতে পারি ছবিটিকে, মাথায় নেওয়া সমগ্র আকাশের কথা এখানে। এতে লাল অক্ষরে হলুদে চিঠির কল্পনা কতটা খোলে, সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু, গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেলে এবং এই হলুদে চিঠির প্রসঙ্গ একত্র হয়ে কবিতায় অনেকটা কন্‌সীটের মতো আসছে, আইবুড়ো মেয়েটির জন্য ছকবাঁধা প্রস্তুতি হিসেবে। পরিকল্পিত নিপুণ ভঙ্গিতে সাজানো তাঁর অলংকারগুলি (এবং প্রায়ই তা ব্যক্তিত্বযুক্ত, পরিভাষায় যাকে বলা যায় সমাসোক্তি) যদি কবির পরিকল্পনাটিকেও এভাবে ব্যক্ত করে দেয়, তাহলে শব্দ-প্রতিমার চাপ অনেকটা খুলে যায় বলে মনে হয় যেন।

মেয়েটির সামনে তবে এইসব ইচ্ছাপূরণের ছবি, মরীচিকার মতো অপ্রাপণীয় চরিতার্থতার স্বপ্ন। এই নিয়ে সে ভাবছিল দিনগুলো যেন আর না ফেরে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? স্বপ্ন থেকে তাকে সম্প্রতিমুহূর্তের মুখোমুখি ফিরিয়ে আনল একটি প্রজাপতি। বাস্তবে টেনে আনবার জন্য কোনও রূঢ় আঘাতের আয়োজন নেই, কবি যেন গায়ে একটু টোকা দিচ্ছেন অন্যমনস্কতা ভেঙে দেওয়ার জন্য, যেন একটু মজা করবার জন্য— আর তখনই: দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

দিনগুলো যেন না ফেরে। কিন্তু ফিরে যে আসবে না তার শর্ত কী? তার জন্য প্রস্তুতি কী? দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে যখন মুখ চাপা দিয়ে হাসতে থাকে দড়িপাকানো গাছ, তখন এ-দুটি উচ্চারণের প্রতিবিন্যস্ত সম্পর্কের মধ্যেই পেয়ে যাই আমাদের উত্তর। বহির্জীবন থেকে নিজেকে খণ্ডিত করে নয়, তার মধ্যে সরে এসেই হতে হবে প্রস্তুত। আপন অসম্পূর্ণতার বেদনায় ধিক্‌কৃত হয়ে নয়, সেই বেদনা আত্মসাৎ করেও নামতে হবে পৃথিবীর কেন্দ্রে, কেননা: ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।

কিন্তু ও-লাইনটি আর ফিরে আসেনি; সংগত সংযমে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্তসংকলন
(মাস-সাল অনুল্লিখিত)

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

উত্তর লিখেছেন: অমিতাভ দাশগুপ্ত

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১। ক্ষমা করবেন, প্রথম প্রশ্নটিতে অতিশয়োক্তির ঝোঁক বড্ড কানে বাজে। দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনের নিয়মে অর্থনৈতিক সংগ্রাম যখন রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, কেবল সেই স্তরেই তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা বা তীব্র সামাজিক অস্থিরতার প্রসঙ্গটি যথাযথ বলে মনে হতে পারে। এখন আমার দেশে সাধারণভাবে রাজনীতি-মনস্কতা বেড়েছে। এই মনস্কতা-বৃদ্ধির স্বাভাবিক ফল হিসেবে দেখা যায়, আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী সামাজিক স্থিতাবস্থা মানুষেরা স্বীকার করে নিতে চাইছেন না। বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তি ও দু-দুটি যুক্তফ্রন্টের উত্থান-পতন এ-অস্থিরতাকে এখন ১৯৭০-এর গোড়ায় এক দিশাহারা জায়গায় ঠেলে দিয়েছে। একই সঙ্গে, গত পনেরো বছর ধরে আমি এ- দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন দীন কর্মী এবং মাঝারি বহরের কবিতালেখক। প্রাণে ও কর্মে বারবার রাজনৈতিক ও সামাজিক পালা-বদল চেয়েছি, মার-খাওয়া মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতা আমাকে বরাবর আশা-নিরাশায় ভাসিয়েছে, ডুবিয়েছে। প্রথম তারুণ্যের আবেগ এখন সতর্ক হতে চাইছে। সময়ের যে-বাঁকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তার অনুযায়ী করে নিজের আবেগ ও বিবেচনাকে ঘোরাতে পারব কিনা, তার ওপরেই আমার আগামী দিনের কবিতা লেখা-না-লেখা নির্ভর করছে।

২। দুশো বছরের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং উনিশ শতকের অসমাপ্ত ও অসম রেনেসাঁসের কল্যাণে আমার দেশে বুদ্ধিজীবী পাঠক হিসেবে গড়ে ওঠার প্রিভিলেজ পেয়েছেন শতকরা তিন চারজন মানুষ। কবিতা তাঁদেরই একটি অংশ পড়েন। সুতরাং 'বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা' নিয়ে কোনও সাধারণ মন্তব্য করা যায় না। যে-বয়স সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার গনগনে আঁচ থেকে উত্তেজনা বা তীব্র প্রেরণা পাওয়ার বয়স, আমরা সে-সময়টাকে অতিক্রম করে এসেছি। আমাদের অনুজ কবিরা সরাসরি আজ সে-তাপের মুখে এসে পড়েছেন। তাঁরা কী লিখছেন বা তা কতখানি কবিতা হচ্ছে জানি না, তবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, বাধ্যতামূলক ভাবে তাঁদের আমাদের চেয়ে বেশি সমাজমনস্ক হতে হচ্ছে। এই সামাজিক বোধের কাব্যিক রূপায়ণের সার্থকতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাজমানসে কবিতার প্রভাব বাড়া-কমা নির্ভরশীল।

৩। কবিতার ভাষা ও মুখের ভাষার দীর্ঘকাল ধরে যে বিরোধ চলে আসছিল, সক্ষমভাবে আমার সমসাময়িক কবিরাই তাকে কমিয়ে আনার দায়িত্ব বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রথম অনুভব করেছেন, এ-কথা আমি বেশ জোর দিয়ে বলতে পারি। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সন্তান আমরা কবিতাকে উঁচু মাচায় বাঁধা কোনও দুর্লভ সামগ্রী করে রাখতে চাইনি, আমরা তাকে অস্তিত্বের একটা শর্ত হিসেবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা কবিতায় আমরাই প্রথম সরাসরি ও ডেলিবারেট কবিতা লিখতে চেয়েছি, এবং কে না জানেন, কবিতার ভাষা ও মুখের ভাষাকে কাছাকাছি করে না আনলে অমন ধরণের কবিতা লেখা যায় না। নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি এই দুই ভাষাকে কাছাকাছি রাখার পক্ষপাতী। কবিতার কারু ও মুখের ভাষা কাছাকাছি এলেই কবিতার সত্যিকারের নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠতে পারে। কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয়, বাংলা কবিতার প্রাগাধুনিক যুগ পর্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এ-অভিযোগ ছিল না। অনগ্রসর, পরাধীন ও সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত বাংলাদেশে আধুনিক কবিতার প্রথম পুরুষ মাইকেল মধুসূদন থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত কবিদের সারি দীর্ঘকালীন একমাত্রিক কবিতা পাঠে অভ্যস্ত পাঠকসাধারণের কাছে অবোধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে উঠলেন। অজ্ঞতা ও অনভ্যাস থেকেই বিরাগ জন্মায়। কয়েক যুগের আধুনিক কবিতা-চর্চার ভেতর থেকে সে-বিরাগ বেশ কিছুটা কমে এসেছে। তবে সবসময় এ-দেশের আপামর জনসাধারণ ও কবিতা পাঠকদের তুলনামূলক হিসেবটা মনে রাখবেন।

৪। ভণ্ডামি-বিহীন এবং সফলভাবে হলে, নিশ্চয়ই।

৫। যাঁরা কবিতার সামাজিকীকরণে বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে কবিতা লেখার এই তো সময়। যাঁরা নন, তাঁদের ঈশ্বর তাঁদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, জানি না।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

বীথি চট্টোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত ছয়টি কবিতা

অ বা ধ্য

বিদ্বজ্জনে কী বলেছে
ভাবতে গেলে বাঁচা অসম্ভব,
প্রাণ থাকতে পরোয়া নেই
হয়ে উঠব নদীর কলরব।

বাড়ির লোকে কী বলেছে
মনে রাখলে বাঁচা অসম্ভব,
একটু প্রাণ এখনও আছে
শুকনো ডালে লুকোনো পল্লব।

প্রবীণ কবি কী ভেবেছে
মেনে চললে লেখা অসম্ভব,
বাংলাভাষা দুহাত তুলে
তোমাকে চায় নতুন বিপ্লব।

হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে
খরস্রোত জলের কলরব
কে তাতে কী বলল সেটা
মাছির মতো উড়িয়ে দিলে বাঁচাও সম্ভব।

(অগ্রন্থিত কবিতা)

মা র খে য়ে কে উ কা লী হয়

কত মার খেয়ে কেউ কালী হয়
সেটা তোদের জানার কথা নয়,
লোকে ভয় পায় এত বড় জিভ
ছিল পায়ের তলায় শুধু শিব।
হাতে খড়্গ-খেটক-খোলা বুক
যেন জীবনে আসেনি কোন সুখ,
তাজা রুধিরের স্বাদ মিষ্টি
খেতে বারণ করেছে সৃষ্টি।
ঘোর অন্ধকারের দৃশ্য
একী অপরূপ কালো নিঃস্ব,
চুলে ঢেকে যায় নক্ষত্র
হাতে সময়ের প্রেমপত্র।
সে তো জিতবেই যার বেশি জোর
আমি সবচে বেহায়া লাথখোর,
ডোম-চণ্ডাল যত জাত-পাত
ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি বড় হাত...
সব মুখোশের প্রতি ধিক্কার
মনে প্রেম ছাড়া কিছু নেই আর,
যার কিছু নেই আমি তার ধন
পানের দোকানে আমি আমরণ।
রোজ নয়ছয় করি সিন্দুক
ছুঁতে খুব ভয় পায় নিন্দুক,
তবু পদতল কাঁপে থরথর
এক শিব ছাড়া সব নশ্বর।
ভেবে বেরিয়েছি নিয়ে খড়্গ
আমি বানাব এখানে স্বর্গ,
খোলা বুক আর বড় লাল জিভ
ছিল পথে বাধা হয়ে শুধু শিব।

(অগ্রন্থিত কবিতা)

দু' লা ই ন লে খা র প রে

দু'লাইন লেখার পরে
একটা সমস্যা হয়,
অশ্বত্থগাছ লিখলে
গাছের পাতাই চমকে ওঠে
অনেক সময়। সমস্যা হয়, লেখার সময়।

প্রাণ যায়, চাঁদের আলো
কে তুমি, তুমি-ই জানো,
অশ্বত্থগাছের পাতা
ঝাঁকড়া মাথা, সবচে সহজ
না জন্মানো, তুমি-ই জানো, কখন-ওই না জন্মানো।

দু'লাইন মেঘ ভাঙা চাঁদ
না হলে অন্ধকারে,
তোমাকে হাতের কাছে
পেলেই আমি জড়িয়ে ধরি, হঠাৎই
নদীর ধারে। অন্ধকারে, নদীর ধারে।

এইসব জড়িয়ে ধরা
চাঁদ ওঠে মিষ্টি হেসে,
নদীতে একটি স্টিমার
ঝমঝম দুলছে নদী,
বৃষ্টি এসে, মিষ্টি হেসে, ঝমঝম ঘুমের দেশে।

কখনও তোমায় পেলে
তোমাকে রাখব কোথায়?
দু'লাইন লেখার পরে
একথা, ভাবলে আমার, নিমেষে
হাত কেঁপে যায়। লিখলে হাত কেঁপে যায়।

গু রু চ ণ্ডা ল

আমি গুরু তবু মুড এসে গেলে
চণ্ডাল হ'য়ে যাই,
যখন তোমাকে মুঠোর মধ্যে
একদম একা পাই।

আমি চণ্ডাল, আমাকে কখনো
ছুঁয়ো না নিজের হাতে,
আমি যদি ছুঁই তোমার চিবুক
কোনো দোষ নেই তাতে।

আমি গুরুদেব কেটে দিতে পারো
আমার পায়ের নখ,
রামকৃষ্ণ তো বলেই দিয়েছে
লোক মানে হল পোক।

আমি রাক্ষস তুমি টিন এজার
নিচু ক'রে নাও মাথা
আমার জন্যে তোমার হার্টের
মধ্যে আসন পাতা।

আমি ভগবান তোমার বয়েস
যদিও মাত্র ষোল,
আর দেরি নয় বানানো পোশাক
বিশুদ্ধভাবে খোলো।

গুরু চণ্ডাল তবু চোখে জল
দেশান্তরের পানি,
তোমার শরীর প্রথম ভাগের
মতন পড়তে জানি।

সা মন্ত যু গে র প্রে মি ক

মনে মনে আমি সামন্ততান্ত্রিক
অন্তঃপুরে ফিরে যাই বারেবারে,
এমনকী আমি নারী স্বাধীনতা বিরোধী
যেকেউ আমাকে পাগল ভাবতে পারে।
মেহগনি খাট, লেসের চাদর বোনা
মেঘচুল তাতে হিরের গয়না জ্বলে,
এইসব ছাড়া প্রেম দানা বাঁধে নাকি?
দূরে গঙ্গায় সরোজিনী ভেসে চলে।
সরোজিনী নামে একটি স্টিমার ছিল
সেটির মালিক রবিঠাকুরের দাদা,
এইসব ছাড়া প্রেম করা যায় নাকি?
ঝাড়লণ্ঠন জ্যোৎস্নায় সুর বাঁধা।
জ্যোৎস্নারাত্রে সামন্তযুগ রাতে
আমি একা ঘরে এলোচুলে জুঁইমালা—
দেখলে অনেকে পাগল ভাবতে পারে
রত্নপেটিকা ডায়মণ্ডকার্ট বালা।
খুলে প'ড়ে আছে শ্বেতপাথরের ঘরে
আমি অভিমানে আলুথালু নীলশাড়ি,
আমার প্রেমিক দেবদাস মুখোপাধ্যায়
মাল খেতে গেছে চন্দ্রমুখীর বাড়ি।
আমার প্রেমিক সামন্তযুগে থাকে
আমাকে ছেড়ে সে বাঈজী নাচাতে যায়,
অভিমানে আমি আত্মহত্যা করি—
ঝড় ওঠে ঘরে বিদ্যুৎ চমকায়।
আমার প্রেমিক উত্তর কলকাতার
একটি পুরোনো রঙ্গমঞ্চে ওঠে,
তার অভিনয়ে দর্শক ফেটে পড়ে
আমার প্রেমিক শিলাইদহের বোটে—
কবিতালেখা ও জমিদারি পরিদর্শন
বজরা থেকেই আমাকেও চিঠি লেখে,
স্বপ্নেও আমি সামন্তযুগ দেখি
আমার প্রেমিক মেঘনাদবধ লেখে।
লেখে লিখুকনা আমি দোলনায় দুলি
বিকেলবেলায় গায়ে চন্দন মাখি,
আমার প্রেমিক উদীয়মান এক কবি
মনে মনে আমি সামন্তযুগে থাকি।

প্রা ণা ধি কে যু

আমি এখন একাকী মাঝরাত
মাধুরীলতা পাশে ঘুমিয়ে আছে,
তুমি এখন শিলাইদহে বোটে
নিবিড় চিঠি ইন্দিরার কাছে।

তোমার বোটে জ্যোৎস্না ফটফটে
আমার কথা ভুলে যাবার মতো,
উপযুক্ত স্নিগ্ধ পটভূমি
জ্যোৎস্নারাত আকাশ যথাযথ।

এখন তুমি প্রেমিক কবি চিঠি
এখন তুমি হারানো বউঠান—
বিবির কথায় আত্মহারা হও
ওকে পাঠাও নতুন লেখা গান।

আমি তোমার আটপৌরে বউ
তোমাকে আমি সত্যি ভালবাসি,
আমার শরীর যখন তুমি নাও
যখন তোমার শোভন মধুর বাঁশি।

বুঝতে পারি অন্য কাউকে ভাবছ
আমার বুকে কোমল রঙ সুখ,
অথচ তুমি আমাকে দেখছ না!
দিগন্তে কার গভীর স্মিতমুখ?

এসব কথা তোমাকে বলবো না
আমার বলার ভাষাও ভালো নয়,
রাগরাগিণীর সুর চিনতে আজও
আমার দারুণ ভুলভ্রান্তি হয়।

আমি একটা বোকা গ্রাম্য মেয়ে
তোমার লেখা বুঝতে ভয়ে সারা,
আমায় তোমার কীইবা প্রয়োজন?
রান্নাঘর আর শয্যাকক্ষ ছাড়া?

প্রথম প্রথম তোমার ছন্দ ভুল
শুধরে দিতেন নতুন বউঠান,
এখন যেমন বিবি তোমার লেখা
অসামান্য সুরে বসিয়ে গান।

আমি নীরব একাকী মাঝরাতে
আমার কোনও নিজস্ব সুর নেই,
যে সুর দিয়ে তোমার ঘুম ভাঙে
তোমার সে ঘুম আমায় ছুঁতে নেই।

যেদিন তুমি পদ্মা থেকে ফেরো
বিবির মতো আঁট ক'রে চুল বাঁধি,
তবুও তুমি আবার চিঠি লেখো
শুনছ আমি লুকিয়ে একা কাঁদি।

যেদিন তোমার অমন মুখে মেঘ
আমি সেদিন চোখে কাজল পরি,
আত্মঘাতী বউঠানের মতো
পিঠের ওপর চুলটা মেলে ধরি।

তবুও তুমি মেঘ হয়েই থাকো
আর কীভাবে কত নকল করি?
যারা তোমায় মেঘ বানিয়ে দেয়—
তাদের মতো অধরা অপ্সরী...

আমি তো নই, এটাই আমার দোষ!
আমার দুঃখে আভিজাত্য নেই,
আমার অশ্রু লেখো না কোনদিন
আমার ক্রোধেও রুচির ছাপ নেই।

আমার কথা ফুরিয়ে এল যেন
এসব কথা ফুরিয়ে যাওয়াই ভালো
তুমি এখন শিলাইদহে একা
ফুটছে প্রথম রুপোর মতো আলো

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

আরও অনেক
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, *বলাকা বুক স্টল* (কলেজ স্ট্রিট),
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

বিষাদগাথা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

১৩

(পরিচ্ছেদ: ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬)

৪৩

গভীর রাতে কয়েকজন মিলিটারি-পুলিশ লালকমল-নীলকমলকে তুলে নিয়ে গেল। তিরিশে আগস্টের কয়েকদিন আগে সৈনিক স্কুলের পাহাড়ি স্টেশন থেকে যে তিনজন বালিসোনায় এসেছে, এত বছর পরেও তাদের প্রত্যেককে সেই রাতেই নিঃশব্দ অভিযান চালিয়ে অজানা কোথায় নিয়ে যাওয়া হল কেউ জানে না। টানা

চিন্তামগ্ন পরীক্ষিত হঠাৎ ঘোর ভেঙে বলে উঠল, 'ছেলে-দুটোর সাহস যদি আমার থাকত আমি দেশের দূষিত শাসনব্যবস্থাটাই বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতাম! দুর্নীতির দুর্গন্ধে আজকাল আমার গা গুলোয়।'

তিনদিন জেরা করে লালকমল ও নীলকমলকে রেখে অন্যজনকে বালিসোনায় ফিরে যাবার ট্রেনের টিকিট ও পথের খাওয়াখরচ হাতে দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। তিরিশে আগস্টের মিছিলে পুলিশকে লক্ষ করে ছোড়া গ্রেনেডগুলো সৈনিক স্কুলের পাহাড়ি স্টেশনের জন্য পাঠানো লুঠ হওয়া গ্রেনেড হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে। তিরিশে আগস্টের ঘটনার প্রধান উদ্যোক্তা চৌধুরী পরিবারের যে-দুজনকে সেদিন ভিড়ের মধ্যে দেখা গেছে তারা আগের দিনই পাহাড়ি স্টেশন থেকে বালিসোনায় এসেছিল।

রাজধানীতে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সচিবালয়ে অনেক অনুসন্ধানের পর পরীক্ষিৎ জানতে পারল, গুডস ট্রেনের সিল ভেঙে আর্মির অস্ত্র লুটের অভিযোগে লালকমল-নীলকমলকে প্রাথমিক জেরার পর তাদের উত্তর-পূর্ব ভারতের সেনা-অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সদ্য ভারপ্রাপ্ত সহকারি সচিব, তার প্রাক্তন ছাত্রী উষা অফিসের বাইরে এসে মনের দ্বিধা কাটিয়ে পরীক্ষিৎকে বলল, 'আপনাদের তিন পুরুষের আই বি রিপোর্ট রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আনানো হয়েছে। আপনার আলাদা পুলিশ রিপোর্টের ফাইলও দেখা হচ্ছে, স্যার। এগুলো ওদের বিরুদ্ধে যাবে মনে হয়।'

নীলা হঠাৎ উষার একটা হাত ধরে কাতর স্বরে বলল, 'বিশ্বাস করো ভাই, আমার ছেলে-দুটো বদমাস নয়, কোনওদিনই ওরা সন্ত্রাসবাদী নয়, দোষ ওদের একটাই, বালিসোনাকে বড্ড ভালোবাসে। সে তো ওদের বংশেরই দোষ। আমার শ্বশুরমশাইয়ের সময় থেকে চলছে।'

'জানি, ম্যাম, জানি। আমি তো লক্ষ্মী-

মনসা পুজোর আগেরদিন সন্ধেবেলা রান্নাপুজোর বাজার করে ফেরার পথে সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার নবীন গুছাইত তথাগতর মাধ্যমে খবর পাঠাল, বালিসোনা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিশেষ আদালতের পথে হ্যান্ডকাফের আঘাতে লালকমল একজন রক্ষীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ায় তাকে আর্মির গাড়ি থেকে নামিয়ে সেই মুহূর্তে গুলি করা হয়। নীলকমলেরও দ্রুত বিচার শেষ করে তাকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

বড়দির স্কুলের ছাত্রী, স্যারের কাছেও পড়েছি।'

যাওয়া-আসায় প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার ট্রেন জার্নিতে বিধ্বস্ত পরীক্ষিৎ নীলাকে বাড়ির দিকে এগিয়ে দিয়ে নদীখাতের ধারে এসে বসে পড়ল। এখনও হাঁটুজল আছে, জলের ওপর হাওয়া বিলি কাটছে।

সারা বছর বুকজল, হাঁটুজল, কাদাজল নিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও সামনের গ্রীষ্ম পর্যন্ত নদী বাঁচল না। জৈষ্ঠে পঁয়ষট্টি মাইলের বেশিটাই ধুলো বালি শুকনো মাটিতে মরুপথের চেহারা নিল।

বালিসোনার কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে লালকমল-নীলকমলের পক্ষে কথা বলতে গেলে তাদের সকলকেই জানানো হল, তাদের কিছু করার নেই, এটা পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর হাতে।

প্রদীপ খবরের কাগজ ফুটো করে সেই ফুটো চোখের সামনে ধরে কুঁজো হয়ে বসে লিখছিল, পরীক্ষিৎ ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে বলল, 'লেখায় ব্যাঘাত ঘটালাম হয়তো। প্রদীপদাদা, তোমাকে একবার দিল্লি যেতে হবে।'

প্রদীপ মুখ তুলে ভুরু কুচকে পরীক্ষিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'দিল্লির পাঠ আমি তুলে দিয়েছি রে। আমার হাঁটুও আর ঠিক নেই।'

'তোমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে প্লেনে নিয়ে যাব। আমাদের বড় বিপদ। বালিসোনার সামনে মস্ত ফাঁড়া। লালকমল-নীলকমলকে হয়তো প্রাণ দণ্ড দেওয়া হবে! একবার চলো, হয়তো তুমিই বাঁচাতে পারো।'

দিল্লির অফিসেও লিফট থেকে হুইল চেয়ারে বসেই নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিরক্ষা সচিবের ঘরে ঢুকে প্রদীপ বলল, 'কল্লোল, একে তুমি চেনো?'

'বিষাদগাথার লেখককে কোন বাঙালি না চেনে, স্যর! রোজ সকালের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে আমার বাংলা কাগজ আসে।' কল্লোল উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষিতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবিনি। আমি ভাগ্যবান। আপনি কেমন আছেন স্যর?' শেষ কথাটা প্রদীপের উদ্দেশে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে প্রদীপের চাকরির শেষ দুবছর কল্লোল ছিল তার অনেক জুনিয়র, প্রদীপের উপদেশে ও সুপারিশে, সেইসঙ্গে শিডিউল কাস্ট হবার বিশেষ সুযোগে সে ক্রমশ ওপরে উঠে আসে। সকলের জন্য কফি বলে দিয়ে প্রদীপকে জিজ্ঞেস করল, 'আমি আপনার জন্য কিছু করতে পারি স্যর?'

'পরীক্ষিতের দুই ছেলে লালকমল আর নীলকমলকে ভুল করে মিলিটারি পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছে। ওরা দুটি যমজ ভাই, মানুষ হিসেবে দুটি রত্ন। তুমি কিছু করো। তোমরা চাইলে আমি পরীক্ষিৎ দুজনেই বন্ড দিয়ে যেতে পারি।'

কল্লোলের কাছ থেকে ফেরার পথে প্রদীপ হঠাৎ পরীক্ষিৎকে বলল, 'শীতের ফুলকপির মতো এখন নাকি ছোট ছোট অ্যাটম বোমাও বাজারে উঠছে?'

চিন্তামগ্ন পরীক্ষিৎ হঠাৎ ঘোর ভেঙে বলে উঠল, 'ছেলে-দুটোর সাহস যদি আমার থাকত আমি দেশের দূষিত শাসনব্যবস্থাটাই বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দিতাম! দুর্নীতির দুর্গন্ধে আজকাল আমার গা গুলোয়।'

গান্ধিজীর ডান্ডি অভিযানের ভাস্কর্য ছাড়িয়ে এসে পরীক্ষিৎ আবার তার নীরবতা ভাঙল, 'গানের মিছিল রাজধানীর রাস্তায় আনা যায় কিনা ভাবতে হবে।'

প্রদীপ পরীক্ষিৎ কেউ জানত না, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের যে গাড়িতে তাদের এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তাতে যে-কোনও কথা বা শব্দ অলক্ষ্যে রেকর্ড হয়ে যায়।

বালিসোনায় ফিরে প্রদীপ সেই রাতেই পরীক্ষিৎকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বলল, 'লাল-নীল আমার মতো একই ভুল করল, ওরাও বিয়ে করল না। রাঙাকাকা আত্মনিধনের ঠিক আগে আমার ঘরে— তুই যেখানে বসে আছিস, সেখানে দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিলেন, ভালো মানুষের বীজের বড় অভাব রে। এটাই হয়তো রাঙাকাকার শেষ কথা।'

পরীক্ষিতের গভীর দীর্ঘশ্বাসে তার বুকের কাছাকাছি শুকনো ডালপালা থেকে ধুলো উড়ল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে কথা বলতে পারল, 'জাহাঙ্গীর সাহেবও মানুষ আনার কথা বলতেন।'

একটু বেলার দিকে গরমে ঘেমে পরীক্ষিতের ঘুম ভেঙে গেল। চারদিকে ভাদ্রের গুমোট। প্রচণ্ড গরমে রাসমাঠে মাপজোক তদারকি করতে করতে আনন্দমোহন হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথেই তার মৃত্যু হল। ডাক্তার একমুহূর্ত পরীক্ষা করে বললেন, 'ম্যাসিভ হার্টঅ্যাটাক!'

নীলা, পরী, মিতা, নন্দিনী, চিরন্তনী, অরণ্য, মেঘাবৃত সকলেই দিনের পর দিন লালকমল-নীলকমলের পথ চেয়ে থাকে। শিউলিও তার লালমামা নীলমামার কথা জিজ্ঞেস করে। লক্ষ্মী-লিওন দুবেলা খোঁজ নিয়ে যায়। পরীক্ষিৎ ছেলে দুটোর ভবিষ্যৎ জানতে চেয়ে নানা জায়গায় যাতায়াত করে রোজই বিফল হয়ে ঘরে ঘরে।

দু-ভাইকে বালিসোনায় আর দেখা গেল না। তাদের নিয়ে নানা গুজব এখানকার বাতাসে ভাসে। কখনও শোনা যায়, কোনও দুর্গম অঞ্চলে জেলের দুটি আলাদা সেলে দুজনকে রাখা হয়েছে। কখনও রটে, তারা জেল ভেঙে বেরিয়ে গেছে। এমনও শোনা গেল, পালাতে গিয়ে রক্ষীদের গুলিতে তারা মারা গেছে। শহরের এক অল্পবয়েসি সাংবাদিক বলল, মণিপুর, নাগাল্যান্ড হয়ে লুকিয়ে বালিসোনায় ফেরার পথে সশস্ত্র বাহিনীর চোখে পড়ে গিয়ে গ্রেপ্তার এড়াতে দুজনে একসঙ্গে কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে নিজেদের গুলি করেছে।

পরীক্ষিতের এক প্রাক্তন ছাত্রের তরুণপুত্র গর্বভরে জানিয়ে গেল, লালকমল-নীলকমল ভারতীয় গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে চিনে ঢুকে গেছে।

মনসা পুজোর আগেরদিন সন্ধেবেলা রান্নাপুজোর বাজার করে ফেরার পথে

সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার নবীন গুছাইত তথাগতর মাধ্যমে খবর পাঠাল, বালিসোনা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিশেষ আদালতের পথে হ্যান্ডকাফের আঘাতে লালকমল একজন রক্ষীর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ায় তাকে আর্মির গাড়ি থেকে নামিয়ে সেই মুহূর্তে গুলি করা হয়। নীলকমলেরও দ্রুত বিচার শেষ করে তাকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। গুছাইত বলে পাঠিয়েছে, তাকে এয়ার ফেয়ার সমেত হাজার-পনের টাকা দিলে সে আর্মির হেডকোয়ার্টার থেকে লেটেস্ট খবর এনে দিতে পারে।

টাকা নিয়ে চলে যাবার পর তথাগত বা নীলাঞ্জনারা কেউই আর গুছাইতের দেখা পায়নি।

পরীক্ষিৎ সারা রাত জেগে বসে বিষাদগাথা লেখে। হঠাৎ যদি রিফিল ফুরিয়ে যায় তাই আরও একটা কালো কালির বলপেন হাতের কাছেই রাখা থাকে। লাল কালি নীল কালির আলাদা দুটো কলমও তার আছে। একটা দিয়ে লালকমলের বাল্য-কৈশোরের কথা যখন যেমন মনে পড়ে লিখে রাখে, অন্যটা দিয়ে একইভাবে নীলকমলের বাল্য-কৈশোর লিখে যায়। তাদের দুঃসাহসিক দুষ্টুমির কথা লিখতে লিখতে কোনও শব্দ চোখের জল পড়ে অবোধ্য আকার নিলে শব্দটি সে নিঃস্ব লোকের শেষ সম্বল আগলানোর মতো তক্ষুনি আবার লিখে ফেলে।

প্রায় পাঁচ বছরের সমুদ্রযাত্রায় দেখা অদ্ভুত যে-সব দেশের কথা তার বালকপুত্রদের বলা হয়নি, সেই সব কথা সেই বালকবয়েসি লালকমল-নীলকমলকে সামনে বসিয়ে রাতের পর রাত শুনিয়ে যাওয়া তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল।

নীলাঞ্জনা সারা বছরই পরীক্ষিতের প্রিয় কিছু জিনিস যেভাবেই হোক জোগাড় করে আনে। গ্রীষ্মে ফলসা, বর্ষায় কদমফুল, শরতে শিউলি, হেমন্তে ছাতিম, শীতে পাটালি গুড়ের পায়েস, বসন্তে সজনেডাটার সুক্তো বাড়ি থেকে বয়ে এনে কালো ভারী একটা টেবিলে পরীক্ষিতের উদ্দেশে পিণ্ডদানের মতো নামিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত সময় শেষ হলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে যায়। নীলাঞ্জনা অনেক আবেদন-নিবেদন করে, পরীক্ষিতের লেখার অভ্যাসের কথা বলে, শেষ পর্যন্ত কারামন্ত্রীর অনুগ্রহে তার হাতের শিকলিবেড়ি খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেও পায়ের ডান্ডাবেড়ি কাটাতে পারেনি।

বংশে আত্মহত্যার ইতিহাস আছে বলে চারখানা কলম রাখার অনুমতি পেতেও নীলাঞ্জনাকে অনেক উদ্যোগ করতে হয়েছে।

একেকদিন কাছে-পিঠে সেপাই সান্ত্রী বা গোয়েন্দা অফিসারকে দেখা না গেলে পরীক্ষিৎ হঠাৎ ঝুঁকে এসে জালের ওপর ঠোঁট চেপে

পশ্চিমপাড়ায় এক রাতে একটা মেয়ের ঘরে একজন রাজনৈতিক নেতার ছেলে খুন হওয়ায় ক'দিন পতিতাপল্লিতে যখন-তখন পুলিশি তল্লাসি চলার পর পাড়ায় আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এল। সেই ভরা ব্যবসার সময় পল্লির লাগোয়া অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া নতুন কয়েকটা ঘরে পুলিশ আচমকা তল্লাসি করতে এসে দ্যাখে দরজায় দরজায় 'গৃহস্থের বাড়ি', 'গেরস্তপাড়া', 'ব্রাহ্মণকুটির' লেখা রয়েছে। ব্রাহ্মণকুটিরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে মেয়েকণ্ঠে 'রেশম ফিরিরি, রেশম ফিরিরি' শোনা যাচ্ছে।

নীলাঞ্জনাকে ফিসফিস করে বলে, 'একটা ঘোড়া আর এক বাক্স হোমিওপ্যাথি এনে দেবে? একটা গাধা হলেও হবে। দাও না গো।'

৪৪

দুয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ছাড়া মেঘাবৃত এমনিতে খুব কম কথা বলে। কিন্তু তিস্তার সঙ্গে দেখা হলে তার কথা আর শেষ হয় না। রোজই ছাড়াছাড়ি হবার সময় মনে হয় কী যেন বলা হয়নি।

দুজনে দুটো উভচর সাইকেলে যখন উড়তে থাকে, তখনও তারা কথা বলে। তখনও মেঘাবৃতই বক্তা। একটু পর পর তিস্তাকে শুধু বলতে হয়, বলো শুনছি। হাওয়া কাটিয়ে মেঘাবৃতর কথা তিস্তার কানে ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে কি না তারই প্রমাণ দিতে হয় তাকে। তাতেও কাজ না হলে সাইকেলের সুরেলা বাঁশি বাজাতে হয়। ক্রিং ক্রিংয়ের বদলে সাঁওতালি বাঁশির সুর। লালকমল-নীলকমলের কাছে পাওয়া।

তিস্তা যদি কথা বলে, মেঘাবৃত সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ওড়ে, শুনতে পাওয়ার প্রমাণ দেয় না। তিস্তা যদি বলে, 'আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ তুমি?' মেঘাবৃত উত্তর দেয়, 'তোমার শিউলি রঙের কথা আমি মেঘের ওপর থেকেও শুনতে পাব। তুমি বিশ্বাস করো না, কিন্তু তোমার কথা আমি দেখতে পাই। সাদা আর কমলা মেশানো। শিউলিফুলের মতো।'

'তুমি একটা পাগল! তোমার মেঘাবৃত নাম কে রেখেছে বলো তো! আমি তোমাকে শুধু 'মেঘ' বলে ডাকব।'

'মেঘ, মেঘা, মেঘু, মেঘবর্ণ, যা খুশি ডাকতে পারো। মেঘাবৃত নামটা আমার পরীক্ষিৎমামার দেওয়া।'

দূর থেকে দীর্ঘ বকের সারি লম্বা চাঁদমালার মতো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে দেখে দুজনেই সাইকেলের গতিমুখ কিছুটা বদলে নিল।

'তোমার মনের সবটাই সাদা, তোমাকে আমি মাঝেমাঝে সাদা মেঘও বলব। আচ্ছা, পরীক্ষিৎমামাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমরা গভর্নমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি না? গানের মিছিল থেকে আরও বড় জনমত তৈরি করতে পারি না? গান্ধিজীর মতো অহিংস আন্দোলন তো এখনও করা যায়, তাই না?'

বকের সারির নীচ দিয়ে যেতে যেতে মেঘাবৃত বলল, 'আমার সে শক্তি নেই। অরণ্যদা কিছু করার কথা ভাবছে। লক্ষ্মীমাসিদের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা হয়।' বলে চুপ হয়ে গেল।

'থামলে কেন? বলো, শুনছি।'

'নীলামাসি, আমার মা— সবাই পরীক্ষিৎমামাকে নিয়ে ভাবছে।'

তিস্তা ও মেঘাবৃতকে একসঙ্গে সাইকেলে ঘুরতে দেখলে বা আকাশে উড়তে দেখলে নীলাম্বরের মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাদের সাইকেল না থামা পর্যন্ত সে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে।

কিছুদিন ধরে সব কিছুতেই তার বিরক্তি ও অধৈর্য উমাশশীরও চোখে পড়েছে। তার আলমারি থেকে টাকা চুরি যাবার দুয়েকদিনের মধ্যেই তার মুখের ভাবে, চালচলনে হঠাৎ বদল দেখে উমাশশীর ভাবনা হয়।

পশ্চিমপাড়ায় এক রাতে একটা মেয়ের ঘরে

তিস্তা একচুমুকে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে মেঘাবৃতর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'চলো না, আমরা আকাশে উড়ি!'
মেঘাবৃত জড়ানো গলায় বলল, 'তোমার নেশা হয়ে গেছে। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'
'আমি বাড়ি যাব না। আমার মোটেই নেশা হয়নি। আমি মেঘের মধ্যে উড়ব। চলো, আমরা দুজনে উড়ে বেড়াই।'

একজন রাজনৈতিক নেতার ছেলে খুন হওয়ায় ক'দিন পতিতাপল্লিতে যখন-তখন পুলিশি তল্লাসি চলার পর পাড়ায় আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এল। সেই ভরা ব্যবসার সময় পল্লির লাগোয়া অ্যাসবেসটসের ছাদ দেওয়া নতুন কয়েকটা ঘরে পুলিশ আচমকা তল্লাসি করতে এসে দ্যাখে দরজায় দরজায় 'গৃহস্থের বাড়ি', 'গেরস্তপাড়া', 'ব্রাহ্মণকুটির' লেখা রয়েছে। ব্রাহ্মণকুটিরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে মেয়েকণ্ঠে 'রেশম ফিরিরি, রেশম ফিরিরি' শোনা যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার গানের ভাষা বোঝবার চেষ্টায় দরমার দরজায় কান পাতল। কয়েকটা ছেলে একসঙ্গে কিছু বলছে বলে কারও কথা বোঝা গেল না। গান থামিয়ে মেয়েটা বলল, 'ব্লাউজ খুললে এস্ট্রা দশ টাকা, লুঙ্গি খুললে এস্ট্রা কুড়ি। কে আসবে ঠিক করো, বাকি দুজনকে কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।'

দুজন পুলিশ আস্তে দরজা ফাঁক করল। লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরা একটা নেপালি মেয়ের সামনে তিনটে ছেলে বসে আছে। তাদের একজন খুব চেনা, সুষমা-স্কুলের উমাশশীর ছেলে নীলাম্বর।

আজই প্রথম আগের স্কুলের দুজন বন্ধুর সঙ্গে নীলাম্বর এপাড়ায় এসেছিল। মেয়েটার সঙ্গে তাদের তিনজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে শুধু মেয়েটার নামে কেস দিয়ে তিনজনকেই ছেড়ে দেওয়া হল। কাউকে খবরটা জানানো হবে না— এই শর্তে মাথাপিছু চারশো করে ঘুষের টাকা নীলাম্বরই প্যান্টের ভেতরের পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিল। এটা আলমারির টাকা চুরির পরদিনের ঘটনা।

সেই থেকে নীলাম্বরের হাবভাবের বদল উমাশশীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল। বিরহ বা উদাস-উদাস ভাব নয়, এ অন্য কিছু। নন্দিনীর ছেলের সঙ্গে তিস্তার মেলামেশার কথা সেও শুনেছে, নীলুর মুখে হয়তো তার মনের সেই ঈর্ষা। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করা, ঘুমের সময় ঘুমনো— এসবও আর আগের মতো নেই দেখে উমাশশী সমস্যার মীমাংসা খোঁজে। তিস্তাকে তিলফুল ছুঁতে সে নিজে দ্যাখেনি, কিন্তু তিলখেতে ছোটাছুটির সময় ফুলের ছোঁওয়া তার গায়ে লাগেনি বলে মেনে নেওয়াও তো শক্ত। নীলুর অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত সন্দেহের সুযোগ নিয়ে তিস্তাকে তিলস্পর্শদোষ থেকে মনে মনে অব্যাহতি দিয়ে উমাশশী তিস্তার মায়ের কাছে ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাড়ল।

'বিয়ের মন বলো, বয়েস বলো, তিস্তার তো এখনও কোনওটাই হয়নি, দিদি। তাছাড়া ও তো লেখাপড়া শেষ না করে নিজের সংসার শুরুই করবে না।'

'তিস্তাকে একবার ডাকো না ভাই।'

'ও তো এখন বাড়ি নেই। তোমাদের সুষমা-স্কুলের খুব সুনাম শুনতে পাই, ছেলেটাকে তৈরি করছ? তোমার পরে তো ওকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে।'

'স্কুলের পরিচালনার ভার তো লিওন-লক্ষ্মীর ওপর। ওদের চেষ্টাতেই গতবছর আমাদের হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হল। সুষমা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল।'

'সুষমা কি তোমার মেইডেন নেম? মানে কুমারীকালের নাম?'

উমাশশী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল, 'ও-নাম এখানে আর কে-ই বা জানে! দেখি, দরখাস্ত তো দেওয়া হয়েছে।

'কিসের দরখাস্ত?'

'স্কুলের নাম বদলাবার।'

উড়ন্ত সাইকেলের গতিপথ অনুসরণ করে নীলাম্বর বুঝে নিল, ওরা আজ ঘোড়াদহের মাঠে নামবে। বছরে দুবার ধান কাটার পর এই মাঠেই চাষিদের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা জমিদারি আমল থেকে চলে আসছে। তখন বিজয়ীদের পুরস্কারও দিতেন জমিদারবাবুরা। এখন দেয় ধানের মহাজনরা।

দুজনে মাঠে নামতেই নীলাম্বর দৌড়ে গিয়ে কপট বিনয়ে হাত জোড় করে বলল, 'দোলের দিন অপরাহ্নে আমাদের স্কুলের ছাদে ঘরোয়া বসন্ত-উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা পায়ের, থুড়ি, সাইকেলের ধূলি দিয়া, কপালে আবির দিয়া নিজেদের ও অন্যদের আনন্দবর্ধন করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন। পত্র ছাড়া নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।'

দুজনে এতক্ষণ শুনছিল, নীলাম্বরের কথা শেষ হতেই হো হো করে হেসে উঠল।

নীলাম্বর বলল, 'তোমাদের কিন্তু আসতেই হবে। আবির খেলা হবে, গান হবে, ভালো সরবতের সঙ্গে জলযোগের ব্যবস্থাও থাকবে।'

রাস্তা দিয়ে ফেরার সময় মেঘাবৃত নীলাম্বরকে সাইকেলে তুলে নিল।

হিন্দি ও বাংলায় হোলির গানের পর তিনটি রবীন্দ্রসংগীত শেষ হতে আবির দেওয়া শুরু হল। সমবয়সিদের কপালে ও বড়দের পায়ে ছাড়া শরীরের আর কোথাও আবির দেওয়া বারণ।

মিষ্টিমুখের শুরুতেই ছোট-বড় সবাইকে মাটির গেলাসে শাঁস ঘেঁটে দেওয়া ডাবের জল, রুহ্‌আফজা সিরাপ, দুধ-বাদাম-মধু দিয়ে সরবত, বাদামবাটা মেশানো সিদ্ধি যার যার পছন্দমতো পরিবেশন করা হল।

'তুমি কী নেবে?' এক হাতে সিদ্ধি, আরেক হাতে দুধ-বাদাম-মধুর সরবত তিস্তার সামনে ধরে নীলাম্বর অপেক্ষা করে আছে।

তিস্তা হেসে হাত বাড়িয়ে সরবতের গ্লাস নিল।

'তুমি, মেঘাবৃত?'

'আমাকেও সরবত দিতে পারো।'

নীলাম্বর মেঘাবৃতর সরবত নিয়ে না ফেরা পর্যন্ত তিস্তা গ্লাস হাতে বসে থাকে, সাদামেঘের সঙ্গে গ্লাস ঠোকাঠুকি করে পান করবে।

নীলাম্বর মেঘাবৃতর হাতে সরবত তুলে দিয়ে আরেকজনকে রুহ্‌আফজার লাল সরবত দিতে চলে গেল।

তিস্তা মেঘাবৃতর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিজের গ্লাসটা তাকে দিয়ে খুশিতে চোখে-চোখে হাসল।

মেঘাবৃতর সরবত শেষ হয়েছে দেখে নীলাম্বর কাছে এসে দুজনের চোখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'আরেক গ্লাস হবে নাকি? এবার একটা সিদ্ধি নিয়ে দেখবে? সব কিন্তু বাবার কয়লাখনির সময়কার ওস্তাদ কারিগরের পাকা হাতের কাজ। পুরী-মোহনভোগও ওরাই বানাচ্ছে। খাঁটি ঘিয়ের। হতে আরও খানিকটা সময় লাগবে। পোস্ত দিয়ে হাতে-গরম আলুর

খোসাভাজা আসছে, এক গ্লাস সিদ্ধি এনে দিই?'

'আমাকে আর-এক গ্লাস ওই দুধ-বাদামের সরবত দিতে পারো।'

'তিস্তা, তোমাকে?'

'আগেরটা সরবতের বদলে সিদ্ধি দাওনি তো? মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে।'

'সরবত খেয়ে মাথা ঝিমঝিম! তাহলে এক গ্লাস সিদ্ধি খেয়ে দেখো, মাথা ছেড়ে যাবে।'

নীলাম্বর একহাতে সরবত, আরেক হাতে সিদ্ধি এনে দুজনকে দিয়ে গেল।

তিস্তা চুমুক দেবার আগে মেঘাবৃত তার হাত থেকে সিদ্ধির বড় গ্লাসটা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সরবত তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এতটা সিদ্ধি খেলে আর দেখতে হবে না! তুমি সরবতেই থাকো।'

সরবতের চমৎকার স্বাদে ও মৃদু নেশায় নীলাম্বরের হাত থেকে তৃতীয় বারের সরবতও নিয়ে মজার খেলা হিসেবে নিজেদের মধ্যে পালটা-পালটি করে নিল।

তিস্তা একচুমুকে অর্ধেক গ্লাস শেষ করে মেঘাবৃতর একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'চলো না, আমরা আকাশে উড়ি!'

মেঘাবৃত জড়ানো গলায় বলল, 'তোমার নেশা হয়ে গেছে। চলো, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'আমি বাড়ি যাব না। আমার মোটেই নেশা হয়নি। আমি মেঘের মধ্যে উড়ব। চলো, আমরা দুজনে উড়ে বেড়াই।'

মেঘাবৃত তিস্তার চোখে নিজের ঘোর-লাগা চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে মেঘের মধ্যে থাকবে? আমি বাসা বানাব?'

চতুর্থ দফায় মেঘাবৃত সিদ্ধি নিল, তিস্তা নিল সরবত। এবার তিস্তাই জোর করে গ্লাস বদলে নিল।

অর্ধেক গ্লাসও শেষ হয়নি, তিস্তা দুহাতে নিজের মাথা শক্ত করে চেপে ধরে 'অসহ্য যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা, মাথা জ্বলে যাচ্ছে, মাথা বার্স্ট করবে' বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল।

চেঁচামেচি শুনে নীলাম্বর দৌড়ে এল। তিস্তার আধখাওয়া সরবতের গ্লাস তুলে নিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কি! এ তো সিদ্ধি!' এবার মেঘাবৃতর দিকে চেয়ে, 'এটা তোমাকে দিয়েছিলাম! তোমার প্রথম সরবতটা তুমি খেয়েছিলে?'

'আগে ডাক্তার, এখুনি একজন ডাক্তার চাই!' বলতে বলতে সে কোলে করে নিজেই তিস্তাকে হাসপাতালে নিয়ে চলল।

'আমি গাড়ি বের করতে বলছি। চলো, তুমি আমি দুজনে ধরে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাই। পয়লা সরবত তুমি খেয়েছিলে?'

খড়্গা দেখে তিস্তা ক্রমশ শান্ত হল। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালীর বেশে কাক তাড়া করে উঠোনময় ছুটে বেড়ানো এখন বন্ধ হয়েছে। বেশির ভাগ সময় সে হাতের খড়্গা কখনও কোলে নিয়ে কখনও বুকে নিয়ে, সেটাকে নাচাতে নাচাতে 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে' বলতে বলতে একসময় হুহু করে কেঁদে ওঠে।

'তিস্তা গ্লাস বদলাবদলি করে নিয়েছিল।'

হাসপাতালে পেট পাম্প করে সবটুকু সরবত তুলে ফেলেও তিস্তার মাথার যন্ত্রণা কমল না। তাকে একসপ্তাহ পর্যবেক্ষণে রাখা হল। নিওরোলজির ডাক্তার যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে, গ্লাসের অবশিষ্ট সরবতের রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায় দিলেন, 'মেয়েটাকে পাগল করে দেওয়া হয়েছে। চার-গ্লাস সরবতের মধ্যেই ধুতরোর বিচি বেটে মেশানো হয়েছিল। মধুর পরিমাণ খুব বেশি ছিল বলে জিভে টের পাওয়া যায়নি।'

পুলিশ কয়লাখনির পুরনো লোক, বাড়ির অন্যান্য কাজের লোক, উমাশশী, নীলাম্বর, মেঘাবৃত— সবাইকে আলাদা আলাদা জেরা করে শেষ পর্যন্ত নীলাম্বরকে গ্রেপ্তার করল। ধুতরো বাটার শিল-নোড়াও সঙ্গে নিয়ে গেছে। যে মেয়েটি বেটেছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হল। কী বাটছে না জেনে সে শুধু দাদাবাবুর নির্দেশ মতো বেটেছে।

পুলিশি হেপাজত ও জেল হেপাজতে মিলিয়ে ন-মাস আটক থাকার পর বড় বড় উকিলদের যুক্তিতর্কে একমত হয়ে বিচারক আসামীকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিলেন। দুটি শর্ত, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামী বালিসোনার বাইরে যেতে পারবে না এবং প্রতি সপ্তাহে একবার করে থানায় হাজিরা দিতে হবে।

হাসপাতালে, বাড়িতে, নার্সিং হোমে অনেক চিকিৎসা করিয়েও তিস্তার সুস্থ মনটাকে আর জাগানো গেল না। সিদ্ধ যোগীপুরুষের মন্ত্রপড়া ছাই মাথায় দিয়ে, নানা জনের পরামর্শে নানান শেকড়বাকড় শুঁকিয়ে, মন্ত্রপূত লোহার বালা পরিয়ে, কিছুতেই মানসিক সুস্থতার সামান্য লক্ষণও দেখা গেল না। এই ঘটনার পর বালিসোনার কোনও কোনও বাড়িতে দোল খেলাই বন্ধ হয়ে গেল।

তিস্তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার পর যখনই মেঘাবৃত তার কাছে গিয়ে নির্বাক বসে থাকে, তখনই অন্তত একবার সে বলবে, 'আমাকে মারতে চেয়েছিলি, তার বদলে তিস্তার জীবনটা শেষ করে দিলি কেন?' একথা সে কার উদ্দেশে বলে সবাই জানে, কিন্তু এ বাড়িতে কথাটা কাকে শোনায় সে নিজেও জানে না।

বাড়ির ঝিরা সবাই মিলে তিস্তাকে জোর করে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে স্নান করাবার পর সে আর জামাকাপড় পরবে না। হাতের কাছে লাঠি, খুন্তি, ঝুলঝাড়া, যা পাবে তা-ই নিয়ে সে মা-কালীর বেশে উঠোনের কাক মারতে যায়। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবার পর জামাকাপড় পরানো হয়।

সব শুনেও উমাশশী নীলাম্বরকে অপরাধী ভাবতে পারল না। তার ধারণা, তার ছেলেকে বিনা দোষে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে। তিস্তার যে এরকম কিছু ঘটবে সে তো আগেই জানত। তিলফুল তুলে মা-লক্ষ্মীই নিস্তার পাননি, এ তো এক সামান্য মেয়ে।

কলকাতার সরকারি হাসপাতালের নিউরোলজির প্রফেসর-ডাক্তার, পরীক্ষিতের স্কুলের বন্ধু সুব্রত একদিন এসে তিস্তাকে পুরো তিনঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করে বেশ কয়েকটা ওষুধ বন্ধ করে, কয়েকটা বদলে দিয়ে বিধান দিলেন— পিসবোর্ডে ভালো করে রাংতা সেঁটে কালীর হাতের খড়্গের মতো একটা খড়্গা বানিয়ে রোগীর চোখের সামনে রেখে দিন।

খড়্গা দেখে তিস্তা ক্রমশ শান্ত হল। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কালীর বেশে কাক তাড়া করে উঠোনময় ছুটে বেড়ানো এখন বন্ধ হয়েছে। বেশির ভাগ সময় সে হাতের খড়্গা কখনও কোলে নিয়ে কখনও বুকে নিয়ে, সেটাকে নাচাতে নাচাতে 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে' বলতে বলতে একসময় হুহু করে কেঁদে ওঠে।

সরস্বতীপুজোর দিন সকালে রোজকার

গামছা-পরা শুচিবায়ুগ্রস্ত গয়লার বদলে তার জিনস পরা ছেলেটা দুধ দিতে এলে তিস্তা ঝাঁপিয়ে পড়ে খড়্গটা তুলে নিল। এক লাফে ছেলেটার সামনে গিয়ে দুহাতে খড়্গটা উঁচিয়ে ধরে কুড়ুলের কোপের মতো গয়লার ছেলের মাথায় মারল। ছেলেটার নাক কেটে রক্ত পড়তে লাগল, কপালেও অনেকখানি কেটে গেছে।

অরণ্য একদিন গভীর সহানুভূতিতে মেঘাবৃতর সঙ্গে তিস্তাদের বাড়িতে এল। তার মা-বাবাকে দেখে মনে হল তাঁদের কথা ফুরিয়ে গেছে, জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটানো ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও নেই।

তিস্তাকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে দেখে সাহস করে অরণ্য তার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বলল, 'তুমি বড্ড কষ্ট পাচ্ছ, বোন। কিসে তোমার একটু শান্তি হবে আমাকে বলো। তোমাকে সুস্থ দেখতে, আগের মতো হাসতে দেখতে তুমি যা বলবে আমরা তা-ই করব।'

তিস্তা মাথা নামিয়ে কোলের খড়্গের দিকে চেয়ে শান্ত হয়ে বসে আছে। তাকে পাগল বলে চেনাই যায় না। অরণ্য আগের কথাটা আরেকবার বলতে বলতে থেমে গেল— তিস্তা চোখ খোলা রেখেই ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে।

মেঘাবৃত কী ভেবে তার সাইকেলের বাঁশির সুর বাজাতে লাগল। তিস্তার নিদ্রামগ্ন দৃষ্টিতে তার কোনও ছাপ পড়ছে কিনা বোঝা গেল না।

৪৫

সন্ত্রাসবিরোধী আটক আইনে সেনাবাহিনীর অস্ত্র লুঠের অভিযোগে গ্রেপ্তারের এগারো মাসের মাথায় তৃতীয় দফার জেরায়ও লালকমল নীলকমল আগের মতোই জানাল— মালগাড়ির সিল ভেঙে অস্ত্র লুঠের ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। পাহাড়ে খানিকটা উঠে জঙ্গলের মধ্যে একইরকম কয়েকটা বাক্সের একটা মুখ-খোলা বাক্স থেকে দুজনে দুটো গ্রেনেড তুলে নিয়েছিল। সেই গ্রেনেড দুটোই তাদের হাতে ছিল, পরদিন মিছিলে লোকেদের ছোটাছুটিতে জোর ধাক্কা লেগে হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। দুজনকে আলাদা আলাদা এবং একসঙ্গে জেরা করেও এর বেশি আর কিছু জানা যায়নি।

তৃতীয় বারের জেরার বেশ কিছুদিন পর একদিন গভীর রাতে দুজন সান্ত্রী এসে তাদের কুঠুরির দরজা খুলে দুজনকে আর্মির ট্রাকে তুলে দিল। পরদিন ভোর রাতে পাহাড়ি গ্রামের রেল স্টেশনের অনেকটা আগে গাড়ি থামিয়ে সঙ্গের সেনা অফিসার বললেন, 'এখানেই তোমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। পাহাড়ে জঙ্গলের ঠিক যেখানে গ্রেনেড পেয়েছিলে সেই জায়গাটা এদের দেখাবে। তোমাদের দেখে পাহাড়ের সন্ত্রাসবাদীরা যদি আক্রমণও করে তোমাদের ভয় নেই, সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গুলি করা হবে।'

দুই ভাইয়ের হ্যান্ডকাফ খুলে ছেড়ে দেওয়া হল। একই সময়ে ট্রাক থেকে নেমে সাধারণ পোশাকের ছ-জন এদিক ওদিক কে কোথায় মিলিয়ে গেল, দু-ভাই জানবার সুযোগই পেল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর নীলকমল প্রথম জায়গাটা দেখতে পেয়ে ভাবছে কাকে দেখাবে, এদিক-ওদিক তাকাবার আগেই একজন বুড়ো ডাকহরকরা পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুমঝুম শব্দে নেমে এসে বলল, 'ঠিক আছে, ট্রাকের কাছে ফিরে যাও।'

দু-ভাই সাবধানে পা ফেলে জঙ্গল থেকে বেরতে যাচ্ছে, গর্ত থেকে সাপের মতো চারজন লিকলিকে চেহারার যুবক জঙ্গল ফুঁড়ে এসে তাদের ঘিরে ধরল। দুজনের হাতে রিভলবার, একজনের দুহাতে দুটো, দুজনের হাতে বন্দুক। গামছা দিয়ে সকলের মুখ বাঁধা। 'তোরাই সেই স্পাই!' বলে খুঁড়িয়ে হাঁটা লোকটা লাফিয়ে এসে লালকমল-নীলকমলের কপালে দুহাতে দুটো রিভলবার ঠেকিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, 'চল শালা, খোচরের বাচ্চা!' কয়েক পা এগিয়ে খোঁড়াটাই সঙ্গের অন্য দুজনকে বলল, 'আলো ফোটবার আগেই হাত-পা কাটা ধড় দুটো স্টেশনের কাছে ফেলে আসবি। 'গুপ্তচরের শাস্তি' লেখা কাগজ-দুটো মুণ্ডু দিয়ে চাপা দিয়ে রাখবি!'

লালকমল-নীলকমলকে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরবার মুখে সশস্ত্র চারজনই মাথায় গুলি খেয়ে গুলি চালাবার আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

'খান্ডেলওয়ালা, তোমার ট্র্যাপ খুব কার্যকর হয়েছে। ওয়েল প্ল্যান্ড, ওয়েল লেড আউট। অ্যান্ড ইট ইন্ডেড দ্য ভেরি বেস্ট রেজাল্ট।' ট্রাকে অপেক্ষায় থাকা অফিসার অপারেশন করে ফেরা ছ'জনের দলটার লিডারকে একথা বলে লালকমল-নীলকমলকে দেখিয়ে আবার বললেন, 'নাউ উই আর কনভিন্সড, দে আর ইনোসেন্ট।'

'ইয়েস স্যার, দে অলসো হেল্পড আস গেট ক্লোজার টু দ্য মিলিটারি ওয়াগান ব্রেকার। এই জঙ্গলেই তাদের ডেরা। ডিলেড কম্বিংয়ে তারা আরও গভীর জঙ্গলে সরে যাবে।'

চলন্ত ট্রাক থেকে ওয়ারলেসে কোড ল্যাঙ্গোয়েজে দূরের কারও সঙ্গে বার্তা চালাচালি চলতে লাগল। কর্নেল খাণ্ডেলওয়ালা ওয়ারলেসেই লালকমল-নীলকমলের উদ্দেশে ক্যাপ্টেন বিৎসের অভিনন্দন শুনিয়ে দিলেন।

নিরাপত্তার কারণে লালকমল-নীলকমলকে আরও তিন মাস বি-এস-এফ গেস্ট হাউসে অন্তরীণ রেখে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হল।

অনেকদিন পর এক রবিবার ভোরের ট্রেনে বালিসোনা পৌঁছে দুজনে বাড়িতে ঢোকার আগে রাসমাঠের সামনে এসে থমকে গেল। মাঠের সামনের অংশ জুড়ে বিরাট একটা অট্টালিকার অল্প খানিকটা গাঁথা হয়ে পড়ে আছে। বেশিটাই নিমচারা খেজুরচারা চোরকাঁটা বুনো লতাগুল্মে ঢাকা। তার পিছনে গানের মিছিল বেরবার তোড়জোড় চলছে। আগের মতো দৈর্ঘ্য আর নেই, কিন্তু পুরো মিছিল জুড়ে শুধুই বিষাদগাথা।

সাদা কাগজে, সাদা কাপড়ে লাল-কালো কালিতে লেখা পরীক্ষিতের নানা সময়ের লেখার টুকরো উঁচুবাড়ির বারান্দা থেকে পড়া যায় না, দূর থেকে শুধু সাদা প্ল্যাকার্ড আর ফেস্টুনের ঢেউ চোখে পড়ে। তবে কয়েকশো মানুষের একসঙ্গে গাওয়া গান বালিসোনার সব জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন-পুরনো অনেকে এসে মিছিলে যোগ দিল। নন্দিনীও এই প্রথম গানের মিছিলে এসেছে। অরণ্য অনেক কাল পরে আবার নিয়মিত আসতে শুরু করেছে।

জনশূন্য মোড়ে মিছিলের সামনের দিকে কিসের গোলমালে সমবেত গান ক্রমশ এলোমেলো হয়ে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল মিছিলে লালকমল-নীলকমলের ভূত দেখার গুজবে ভয় পেয়ে অনেকে পালাচ্ছে, অনেকে গানের খেই হারিয়ে ফেলেছে। আসল ব্যাপারটা কী বুঝতে লক্ষ্মী-সরস্বতী, লিওন, চিরন্তনী এগিয়ে গিয়ে দেখল, বন্ধ একটা রেশন দোকানের রোয়াকে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলা যুবক-যুবতীদের দলটা সকলে মিলে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে শুধু আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলে চলেছে। তারা নাকি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ বর্ণনা করছে। তা দেখতে হাটভাঙা মানুষ রাস্তায় এসে ভিড় করেছে। কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে একজন একটা মেয়ের গা থেকে শাড়ি ধরে টেনেই চলেছে, মেয়েটাও উল্টো পাকে ঘুরে যাচ্ছে। সবটা খোলার কিছু আগে বস্ত্রহরণ থামিয়ে দলের অন্যরা কতগুলো ঝুলি খুলে উৎসাহী জনতাকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস দেখাতে লাগল। প্রত্যেকটা জিনিসের সঙ্গে কাগজে জিনিসটার গুণ লেখা আছে। কোনওটা কুরূপাকে সুরূপা করে, কোনওটা চোখে দিলে নারী পুরুষ পরস্পরের দৃষ্টির বশীভূত হয়, কোনওটা মধু মিশিয়ে খেলে বৃদ্ধ বয়েসে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়— এরকম আরও অনেক জিনিস চোখের নিমেষে বিক্রি হয়ে যাবার পর আবার বস্ত্রহরণ শুরু হল।

শাড়ি খুলেই চলেছে। পুরোটা খুলে যাবার পর দেখা গেল বুকে দুটো নারকোল মালা লাগানো ল্যাঙট-পরা একটা লোক দ্রৌপদী সেজেছিল। শুধু হাত-মুখের আকারে-ইঙ্গিতে দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ পালার কথা শুনে প্রথমে যারা এসেছিল, তার পরও অনেকে এসেছে, তাদের ধারণা ছিল রাস্তায় নাচগানের আসর

বসেছে। তারও পরে যারা এসেছে তারা কিছু শোনেওনি, ভাবেওনি, ভিড় দেখে চলে এসেছে। ফলে রাস্তা বন্ধ। মিছিল এগোবার উপায় নেই। বাজারে, স্টেশনে, চৌরাস্তায় আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলা নারী-পুরুষের দল কিছুদিন ধরে অনেকেরই চোখে পড়েছে। পুরুষই বেশি। অচেনা হলেও বোবা-কালা ধরে নিয়ে এইসব মানুষের প্রতি সহানুভূতিতে কেউ বিরক্ত বা বিরূপ হয় না। কিছু দিন পর পর এরকম আরও একটা করে দল এসে এদের সঙ্গে মিশে যায়। এরা সবসময় অন্যদের দেখিয়ে দেখিয়ে, নিজেরা তাদের দিকে না তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে শুধু আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলে।

লক্ষ্মী-লিওন দুজন ভিড়ের সামনের দিকের কয়েকজনের উদ্দেশে দু-হাত তুলে তাদের কথা শোনবার অনুরোধ জানালে সামনের লোকেরা আগ্রহে লক্ষ্মীদের কাছে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

লক্ষ্মী বলল, 'আপনারা যদি রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এদের মূকাভিনয় দেখেন, গানের মিছিল তাহলে এগিয়ে যেতে পারে।'

ভিড় থেকে আরও কয়েকজন সামনে চলে এসেছে। কেউ কেউ গানের মিছিলেও কয়েকবার হেঁটেছে। সবাই মিলে রাস্তার একটা পাশ পরিষ্কার করে দিল। হাটের অনেকে মিছিলে চলে এল।

আরও এগিয়ে এবার সারি সারি মুড়কি-বাতাসার দোকানের সামনে দোকানদারদের সঙ্গে লম্বা জুলফিওলা চাঁদা পার্টির হুমকি-হাতাহাতির ভিড়ে সন্ত্রস্ত পরীকে দেখে লক্ষ্মী মিছিল ছেড়ে পরীকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল।

লক্ষ্মী শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। ওই অবস্থায় পরী কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার বাতাসার ঠোঙা ধুলোয় পড়ে গেছে! চাঁদার ছেলেরা দোকানদারদের পেটাতে পেটাতে বাতাসার টিন লুট করছিল! তারাও একটা গুণ্ডার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

গান গাইতে গাইতে দীর্ঘ মিছিল এগোতে লাগল। চাঁদা তোলার ছেলেরাও ততক্ষণে উধাও, লালকমল-নীলকমলের ভূত তারা স্বচক্ষে দেখেছে।

লক্ষ্মী শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। ওই অবস্থায় পরী কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার বাতাসার ঠোঙা ধুলোয় পড়ে গেছে! চাঁদার ছেলেরা দোকানদারদের পেটাতে পেটাতে বাতাসার টিন লুট করছিল! তারাও একটা গুণ্ডার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।'
গান গাইতে গাইতে দীর্ঘ মিছিল এগোতে লাগল। চাঁদা তোলার ছেলেরাও ততক্ষণে উধাও, লালকমল-নীলকমলের ভূত তারা স্বচক্ষে দেখেছে।

অরণ্য সুস্থ হয়ে ফিরে এসে বাবাকে আর বাড়িতে দেখেনি।

দিন-রাতের বেশিটাই সে পরীক্ষিতের পড়ার ঘরে কাটায়। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরীক্ষিতের লেখা পংক্তির প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন বানায়। রাতে প্রদীপ এসে পরদার পিছনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কাল পারবি রে পরীক্ষিৎ? নতুন রাস্তার দুধারে অনেক জায়গায় এখনও বীজ ছড়ানো বাকি, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাল যাবি তো?'

অরণ্য বাবার হয়ে প্রক্সি দেয় 'না প্রদীপদা, কাল পারব না। পরশু তোমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই বেরব।'

'রাতে আমার ঘরে একবার আসিস। অবনীকাকার তৈরি মেডিসিনাল প্ল্যান্টের তালিকায় আরও অনেক গাছ লতা-গুল্ম আমি যোগ করেছি। একুশ একর খালি জমির একটা ম্যাপও এঁকেছি। তোকে দেখাব।'

লালকমল-নীলকমলকে সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকতে দেখে নীলাঞ্জনা দুহাতে দুজনকে বুকে টেনে নিয়ে একবার লালের গালে একবার নীলের গালে মুখ ঘষতে ঘষতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

লাল বলল, 'কান্না না, তোমার হাসি দেখতে এসেছি মা।'

নীল বলল, 'মাগো, হাসো তো দেখি।'

চোখের জল নিয়ে নীলাঞ্জনা হেসে ফেলল, 'তোমরা বুঝি এখন দাড়ি কামাও?'

'তুমি আমাদের চিরকাল ছোটই ভাববে?'

নীলের কথার পিঠে লালের সংযোজন, 'আমাদের তুমি যুদ্ধফেরতও বলতে পারো।'

দুই ছেলেকে তখনও ধরে রেখে নীলাঞ্জনা বলল, 'তোমরা সিগ্রেট ধরেছ! তামাকের বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছি!'

লালের অকপট কৈফিয়ৎ— 'রেলে বিরাট পাগড়িওলা এক গুজরাটি বিড়ি-ব্যবসায়ী বস্তাবস্তা বিড়ি নিয়ে ডিব্রুগড় যাচ্ছিল, সে-ই আমাদের দুজনকে দুটো গুজরাটি বিড়ি চাখতে দিয়েছিল।'

নীল যোগ করল, 'তার মাথায় যেমন দুহাত উঁচু পাগড়ি, তার বিড়িও তেমনই চার ইঞ্চি লম্বা। কাশতে কাশতে আমাদের যা অবস্থা হয়েছিল দেখলে তুমি ভয় পেতে মা। বাবাকে দেখছি না তো!'

পায়ে শেকল দিয়ে বাবাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে শুনে দুভাই শিকারের ওপর সিংহীঝাঁপ মেরে বলল, 'আমরা এখুনি যাব।'

নতুন দুজনের অনুমতি জোগাড় করতে পুরো সপ্তাহ কাটল। দু-ফেরতা মোটা জালের ওপর দুহাতের জোড়া ঘুঁষি মেরে লালকমল চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাকে আটকে রাখে সাধ্য কার!' ঘুঁষি ও হুংকার শুনে দুজন কারারক্ষী ও একজন গোয়েন্দা অফিসার একসঙ্গে দৌড়ে এসে প্রথমজন লালকমলের কাঁধে জোর একটা চাপড় মেরে বলল, 'দেশে আইন-কানুন নেই? চুপচাপ দেখে চলে যান!'

'কাঁধ থেকে হাত নামান! আমাদেরও একই প্রশ্ন— এ কি মগের মুল্লুক নাকি?'

নীলকমলের গলার স্বরে ও কথা বলার ধরনে লালকমলের কাঁধ থেকে কারারক্ষীর হাত আপনিই নেমে এল।

লালকমল-নীলকমলকে চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা গেল না, তবে পরীক্ষিতের মরা চোখে ঝিলিক দেখা গেল, ফ্যাসফেসে গলায় জোর এনে বলল, 'তোদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।' যতবারই জালের ওপর ঝুঁকে কথা বলতে যায়, জালের ওপারে যে-কোনও নড়াচড়া দেখলেই সে দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। কিছু বলতে পারে না।

লালকমল-নীলকমল গোয়েন্দা ও কারারক্ষীদের আলাদাভাবে অনুরোধ করল, 'আপনারা কাইন্ডলি একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াবেন? বাবা আমাদের কিছু বলতে চাইছেন।'

রক্ষীরা দুজন রাজি হলেও গোয়েন্দা

অফিসার এক ইঞ্চিও সরবেন না।

শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মির ক্যাপ্টেন বিৎসের নামে কাজ হল। পরীক্ষিৎ তবু চোখ ঘুরিয়ে সামনের দু-পাশটা দেখবার চেষ্টা করে জালের ওপর ঝুঁকে এসে বলল, 'কুয়াশাদ্বীপের সাধু আমাকে অনেক ওষুধ দিয়ে গেছে, তোরা একটা ঘোড়া এনে দে, মানুষ বড় কষ্টে আছে রে।'

লালকমল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, 'বাবা, আমাদের চিনতে পারছ না?'

পরীক্ষিৎ গোঁফ-দাড়িতে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'তোরা তো সেই লালকমল-নীলকমল!'

তারপরই চোখের তারা ঘুরিয়ে গায়ের পায়ের শেকল দেখতে দেখতে খুব মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে কেন শেকলে বেঁধেছে রে? কে বেঁধেছে?'

নীলকমল লোহার জালে কপাল ঠেকিয়ে বলল, 'এ শেকল আমরা ভাঙবই।'

লালকমলও একইভাবে জালে কপাল চেপে বলল, 'এই মুহূর্ত থেকে লড়াই শুরু!'

লক্ষ্মী সরস্বতী নীলাঞ্জনা লিওনের সঙ্গে সেদিন সন্ধের আলোচনায় পরীক্ষিতের ব্যাপারে দেশের বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক সমাজসেবকদের সমর্থনের বিষয়ে বিশদ জানা গেল। বিদেশ থেকেও কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক, দার্শনিকের কাছ থেকে পরীক্ষিতের মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন মাঝেমাঝে খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। এর পাশাপাশি কেস রিওপেন করার বিষয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা চলছে।

'আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান কোথায়?' লালকমলের কথার পিঠে নীলকমল বলল, 'একটা দিনও আর নষ্ট করা যাবে না।'

লালকমল-নীকমলের কাছে সকলেই তাদের বন্দীজীবনের কথা জানতে চায়। সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে লালকমল বলল, 'আমাদের কথা শোনবার অনেক সময় পাবে। বাবাকে বাইরে আনা এখন সবচেয়ে বড় কাজ। এটাই আমাদের টপ মোস্ট প্রায়রিটি।'

রাসমাঠের শপিং মল নির্মাণ নিয়ে হরেন ভদ্রের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা ও সেই সূত্রে স্ট্যাটাস কোর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে অরণ্যকে মেজো-জ্যাঠার বাড়িতে যেতে হয়েছিল। রাতে বাড়ি ফিরে লালকমল-নীলকমলকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'তোদের ফিরে পেয়ে নতুন শক্তি পাচ্ছি রে! বাবাকে এবার মুক্ত করবই। বাবার জন্য খুব বড় অ্যাডভোকেটও মেজো-জ্যাঠা ঠিক করে দিচ্ছে।'

চৌধুরীবাড়িতে যেন সান্ত্বনার পরব চলছে। নীলাঞ্জনা মিতাকে, সরস্বতী নন্দিনীকে, লালকমল-নীলকমল পরীকে— নিরুপায় হয়ে সবাই সবাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তিস্তাদের বাড়িতে সাইকেলটা রেখে মেঘাবৃত রাত করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। নীলাম্বর তার তিনবন্ধুকে নিয়ে কোথাও যাবার পথে মেঘাবৃতকে দেখে বলে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমার ভি-ভি-আই-পি কথা আছে, একটু দাঁড়াবে?'

থানায় সাপ্তাহিক হাজিরার দিন বাদে বাকি ছ-দিন নীলাম্বর বন্ধুদের নিয়ে মদের আসর বসায়। পোস্ট অফিসের সামনে এই নির্জন রাস্তায়ও তাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বন্ধুদের ছেড়ে দিয়ে মেঘাবৃতর একটা হাত টেনে নিয়ে নীলাম্বর বলল, 'এভাবে মনের যন্ত্রণা ভোলা যায় না বন্ধু। শকুন্তলার কাছে চলো, ও সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।'

'ডাক্তার শকুন্তলা মিত্র, সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'সাইকিয়াট্রিস্ট না, পতিগৃহে যাত্রার শকুন্তলাও না, নতুন এসেছে।'

'আমাদের হাসপাতালে? কিসের ডাক্তার?'

'যাব্বাবা! ব্যাটাছেলের জন্য মেয়েছেলের ডাক্তারি তো একটাই।' রহস্যময় হেসে নীলাম্বর আবার বলল, 'তুমি তো লেখাপড়ায় এক নম্বর, বলো তো পণ্ডিত, তপোবনের সেই শকুন্তলার বয়েস কত?'

বিস্ফোরণের আগে ক্রোধ স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হতে যেটুকু সময় লাগে, সেই সময়টুকুতে নীলাম্বর অবুঝের মতো বলল, 'তুমি হেরে গেলে। আমি বলব? চোদ্দ।'

মেঘাবৃতর চড়ে নীলাম্বর লাট খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পরই মেঘাবৃতর মুখ দেখে লালকমল-নীলকমল তার বড় কোনও অঘটন সন্দেহ করেছিল, তিস্তার সম্পূর্ণ কাহিনি শুনে তাদের মনের ভাব কী হল বোঝা গেল না।

পরের সপ্তাহে থানায় হাজিরার আগের রাতে জঙ্গলে নীলাম্বরের ধড়-মুণ্ড পাশাপাশি পাওয়া গেল।

অনেক রাতে লালকমল-নীলকমল প্রদীপের দরজায় টোকা দিতে গিয়ে ভেতরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরেই দ্বিধা ঝেড়ে দরজার বাইরে থেকে বলল, 'ছোট্‌দাদু, জেগে আছ?'

প্রদীপ সময় নিয়ে ভেতর থেকে গলা তুলে বলল, 'আমি তো লিখছি রে, আমার কি ঘুমোলে চলে?'

আজকাল দরজা খুলতেও তার সময় লাগে।

সারা ঘর ঝোপঝাড়ে ভরা। ধুলোর গন্ধে দম আটকে আসে। বেশির ভাগ লতা-পাতা শুকনো বিবর্ণ। মরা ডালপালার ফাঁকফোঁকড় দিয়ে অল্প কয়েকটা সজীব গাছ কোনও রকমে মাথা তুলে আছে। মেঝেময় হিজিবিজি লেখা কাগজ ছড়ানো।

দরজা খুলে দিয়ে প্রদীপ ভাঙা কোমরে ঝুঁকে হাঁটুতে এক হাত রেখে কয়েক পা হেঁটে মেঝেয় গিয়ে বসে পড়ল।

ঘাড় না ঘুরিয়ে লালকমল-নীলকমলের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা তো কেউ পরীক্ষিৎ না। তোমরা কে?'

ঘরের কোথাও বসবার মতো জায়গা নেই। লালকমল-নীলকমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম প্রায় বন্ধ করে প্রদীপের কুঁজো চেহারা দেখছিল, প্রশ্ন শুনে লালকমল বলল, 'আমরা লালকমল আর নীলকমল।'

'তোমাদের তো ঠিক চিনলাম না।'

'আমরা পরীক্ষিতের দুই ছেলে।'

প্রদীপ অবিশ্বাস্য এক ঝটকায় দুজনের দিকে ফিরে বলল, 'সে কী! ভগবান কি সত্যিই আছে নাকি রে!'

নীলকমল এই প্রথম কথা বলল, 'তখন বললে লিখছ, চোখে না দেখে তুমি লেখো কী করে?'

'অক্ষরের চেহারা, শব্দের রূপ কখনও ভোলা যায়!'

'এখন কী লিখছ, ছোট্‌দাদু?'

লালকমলের প্রশ্ন শুনে প্রদীপ তাকে কাছে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কপিখেতের যুদ্ধের ইতিহাস।'

মেঝেয় বসে তক্তাপোষে বিছানার ওপর কাগজ রেখে প্রদীপ দিনরাত লেখে, দুভাই মেঝে থেকে কয়েকটা কাগজ তুলে নিয়ে দেখল, লাইনের ওপর লাইন, শব্দের ওপর শব্দ জড়াজড়ি হয়ে কিছুই পড়া যায় না।

নিওরোলজিস্ট সুব্রত সরকারি হাসপাতালের কাজে ইস্তফা দিয়ে কয়েক বছর বিদেশে কাজ করে বালিসোনায় ফিরে এসেছে, এখন এখানেই স্বাধীনভাবে প্র্যাক্টিস করার কথা ভাবছে।

তার বিদেশি শিক্ষক বিশ্ববিখ্যাত নিউরোলজিস্ট ডাঃ জ্বাভিতেল কলকাতায় একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়ে আসছেন শুনে সুব্রত তিস্তার কেস হিস্ট্রি ও চিকিৎসার বিবরণ আগে ভাগে তাঁর ব্রাটিস্লাভার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিল। সম্মেলনের শেষ দিনের আনুষ্ঠানিক ডিনার বাদ দিয়ে ডাঃ জ্বাভিতেল সুব্রতর সঙ্গে বালিসোনায় এসে তিস্তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। অধিকাংশ ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে পরামর্শ দিলেন— রোজ তিস্তার নাগালে তার ডানাওলা সাইকেলটা রেখে, তার চোখের সামনে অন্য সাইকেলটা চড়ে তার প্রেমিক যেন মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়। যত উড়বে, যত দূরে যাবে ততই ভালো, তবে একেবারে

মেয়েটির দৃষ্টির বাইরে যেন চলে না যায়।

সেদিন ও তার পরদিন স্নায়ুবিজ্ঞানের অতল রহস্যসন্ধানী গুরুশিষ্য তিস্তাদের বাড়িতে থেকে নিজেরাই রোগীর পরিচর্যা করলেন। ওষুধ ও ইনজেকশানও নিজেরাই দিলেন।

ন-মাস রোজ একা-একা সাইকেলে উড়ে মেঘাবৃত যখন ক্লান্ত ও বাকিরা হতাশ, চৈত্র-বৈশাখের আগুনে, খ্যাপা ঝড়জলে, শ্রাবণের চারদিক সাদা-করা বৃষ্টিতে তাকে মরিয়া হয়ে সাইকেল চালাতে দেখে সকলেই যখন চিন্তিত, তখন শরতের এক সকালে মেঘাবৃত টের পেল তার থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে অন্য সাইকেলটাও আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে ডানামেলা সাইকেলে সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা তিস্তাকে দেখতে পেল। ঘণ্টির বদলে বাঁশি বাজিয়ে বাঁশিতেই তার উত্তরও পাওয়া গেল।

আরও পাঁচ মাস পর বসন্তের এক বিকেলে ঘোড়াদহের মাঠে দুজনে সাইকেল নামানোর আগে থেকেই অনেককে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

সকলের মুখ থমথমে। লিওনার্দো এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে, অভ্যাসমতো ধীরে ধীরে মেঘাবৃতকে বলল, 'অরণ্য নীলাঞ্জনা জেলে চলে গেছে, বালিসোনার বহু মানুষ তাদের সঙ্গে গেছে, পরীক্ষিৎকে নিয়ে ফিরবে বলে। ফিরবে ঠিকই, কিন্তু ফিরবে পরীক্ষিতের মরদেহ নিয়ে। শহরের মানুষও জেলের সামনে ভিড় করে আছে। খবর পাচ্ছি, ভিড় বেড়েই চলেছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মরদেহ বালিসোনায় আনতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

লিওনার্দো আরও কী বলতে যাচ্ছিল, মেঘাবৃত বাধা দিয়ে বলল, 'মরদেহ? তাঁর তো আজ মুক্তি পাবার কথা!'

তিস্তা স্তম্ভিত— 'মুক্তির কথা শুনেই তো আজ আমরা বড় আনন্দে উড়াল দিয়েছিলাম!'

কথার সঙ্গে তিস্তার দু-চোখ জলে ভরে উঠেছে।

'সেটা তোমরা কেউ ভুল শোনোনি। পরীক্ষিতের নিঃশর্ত মুক্তির রায় গতকালই বেরিয়ে গেছে। তা শুনেই বালিসোনার সবাই তাঁকে আনতে শহরে গেছে। কিন্তু আদালতের রায়ের কপি জেলে এসে পৌঁছয়নি বলে কাল তাঁকে ছাড়া যায়নি। আর আজ তার মৃত্যুর খবরটুকু পর্যন্ত ভোরের আগে জানানো হল না।'

বালিসোনার দীর্ঘতম শবযাত্রায় প্ল্যাকার্ডে ফেস্টুনে পরীক্ষিতের সারাজীবনের কথাগুলো ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না। অদ্ভুত নীরবতা ছাড়া কোনও সংগীতও শোনা যায়নি।

পরীক্ষিতের মৃত্যু প্রদীপের মনে থাকে না। তাকে আর ঘরের বাইরেও বিশেষ দেখা যায় না। অনেকদিন পরে পরে হঠাৎ কখনও কোমর ভেঙে লাঠি ঠুকে ঠুকে পরীক্ষিতের দরজা পর্যন্ত

'অরণ্য নীলাঞ্জনা জেলে চলে গেছে, বালিসোনার বহু মানুষ তাদের সঙ্গে গেছে, পরীক্ষিৎকে নিয়ে ফিরবে বলে। ফিরবে ঠিকই, কিন্তু ফিরবে পরীক্ষিতের মরদেহ নিয়ে। শহরের মানুষও জেলের সামনে ভিড় করে আছে। খবর পাচ্ছি, ভিড় বেড়েই চলেছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মরদেহ বালিসোনায় আনতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে।' লিওনার্দো আরও কী বলতে যাচ্ছিল, মেঘাবৃত বাধা দিয়ে বলল, 'মরদেহ? তাঁর তো আজ মুক্তি পাবার কথা!' তিস্তা স্তম্ভিত— 'মুক্তির কথা শুনেই তো আজ আমরা বড় আনন্দে উড়াল দিয়েছিলাম!'

এসে বলে যায়, 'কাল যাবি তো রে, পরীক্ষিৎ? বীজে পোকা ধরে যাচ্ছে!'

অরণ্য গলা পাল্টে উত্তর দেয়, 'কাল পারব না, প্রদীপদা। পরশু নিশ্চয়ই যাব।'

'মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখন কাল-পরশু করলে কি চলে! প্রকৃতিকে যারা ভালোবাসে না তারাই শুনছি এগিয়ে আছে।'

একদিন ফাল্গুনের হাওয়ায় তিস্তা-মেঘাবৃত ডানা মেলে অনেক উঁচু দিয়ে সাইকেলে উড়তে উড়তে দেখল, নীচে অরণ্য দুই ভাইকে নিয়ে আধখোড়া নদীখাত পার হয়ে শিমুলবনের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। তিনজনের চোখ মাটিতে। হয়তো কিছু খুঁজছে।

শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে হঠাৎই একঝাঁক বন্দুকের গুলি এসে লালকমল-নীলকমলের মাথা চুরমার করে দিল। কাগজ বাঁধা দুটো তীরও এসে দূরের মাটিতে গেঁথে গেছে।

মেঘাবৃত-তিস্তা চিলের মতো ডানা গুটিয়ে দ্রুত নেমে এল। তিস্তা অরণ্যের কাছে দৌড়ে গেল, মেঘাবৃত কাগজ দুটোর ভাঁজ খুলে দেখল, দুটোতে একই কথা লেখা— 'গুপ্তচরের শাস্তি।'

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অরণ্য যখন লালকমল-নীলকমলের কাছে ফিরে এল তখনও তাদের শবদেহের ওপর শতাব্দীর শেষ শিমুলফুল ঝরে পড়ছে।

পুলিশের গাড়িতেই রক্তস্নাত দুই ভাইকে তুলে সকলে মিলে হাসপাতালের দিকে রওনা হল।

নতুন শতাব্দীও যেন একটা কথার কথা। সেভাবেই নিজের পথে এগিয়ে চলে।

বছর বছর বালিসোনায় রক্তপাত বেড়েই চলল। বর্ষাকালে মরা গাঙ যেখানে যতটুকু প্রাণ পায় সেখানকার অস্বচ্ছ জলে রক্ত গিয়ে মিশে যায়।

প্রোমোটারের লোকজন চৌধুরীবাড়ি ভাঙা প্রায় শেষ করে মহালয়ার আগের দিন একতলার একটা বন্ধ দরজা বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কেটে ফেলল।

শুকনো, মরা, ধুলো খাওয়া গাছপালা লতা-গুল্মের মধ্যে আস্ত একটা মানুষের কংকাল জড়াজড়ি করে আছে দেখেও অরণ্য কথা বলতে পারল না।

কংকালের খবর পেয়ে তরুণবয়সি প্রোমোটার গাড়ি থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে কাটা দরজায় এসে দাঁড়াল। ভেতরে একপলক চোখ বুলিয়ে অরণ্যকে জিজ্ঞেস করল, 'কে ইনি? আপনার কে হয়?'

বলেই খেয়াল হল লোকটা বোবা। নিজের লোকদের বলল, 'চৌধুরীদের একজন শাসকদলের কিছু একটা ছিল, হয়তো এ-ই। চুপিচুপি পাচার করে দে। করাত দিয়ে টুকরো করে বস্তায় ভরে নিবি।'

এক যুগ আগে শিমুলতলায় পুলিশ ডেকে আনার পরই অরণ্য তার ঠাকুর্দার মতো কণ্ঠস্বর হারিয়েছিল, প্রোমোটারের কথায় মুখ বেঁকিয়ে-চুরিয়ে কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না।

শেষ

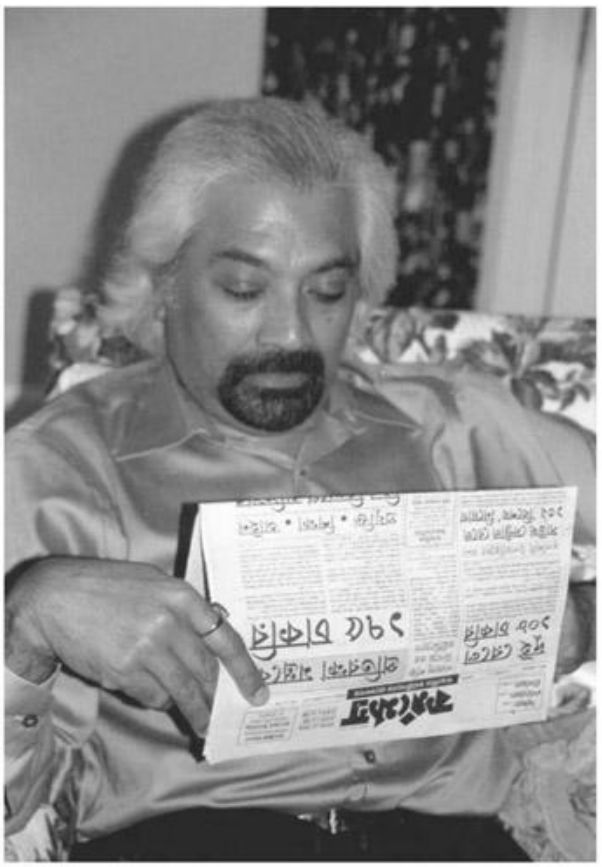

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অন্ত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

"একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।"

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

এই নতুন কলামটি শুরু হল যার বিষয় কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত হবে সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

সদর স্ট্রিট

‘সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের ওপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল।’

জীবনস্মৃতির ‘প্রভাতসংগীত’ পর্যায়ের এই অংশটি কতবার কতভাবে যে পড়েছি, পড়তে পড়তে সদ্য-যুবক রবীন্দ্রনাথের অশ্রুপূর্ণ মুখে ঋজু ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো দীর্ঘ কাঠামোটি কল্পনা করার চেষ্টা করেছি, তিনি তখন নিমগ্ন এক আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে, তাঁর আয়ত দুটি চোখ তখন ন্যস্ত লাল সূর্যের দিগন্তের ওপর ওঠার দৃশ্যটির ওপর। কীভাবে চোখের ওপরের একটি পর্দা সরে গিয়ে তাঁর অন্তর্জগতে জন্ম নিচ্ছে একটি বিখ্যাত কবিতার সেই দৃশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করাই তখন আমার অভীষ্ট। তারপর নিশ্চয় তিনি ধীর পায়ে সেখান থেকে চলে গিয়ে প্রবেশ করেছেন তাঁর ঘরে যেখানে টেবিলের ওপর অপেক্ষা করছে তাঁর লেখার খাতা ও কলম। বসলেন চেয়ারের ওপর, তারপর একুশ বছরের সেই যুবক লিখতে শুরু করলেন:

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের ’পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!

না জানি রে কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

বহুবার মানসচক্ষে দেখা এই দৃশ্যটি চাক্ষুষ করতে একদিন অফিসফেরত গিয়ে উপস্থিত হলাম সদর স্ট্রিটের মুখে। তখন সন্ধে থিতু হচ্ছে চৌরঙ্গি রোডের ওপর। কলকাতা মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে সোজা ঢুকে গেলাম নাতিদীর্ঘ পাকা রাস্তা ধরে। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে মির্জা গালিব স্ট্রিটে, যার কিছুকাল আগেই নাম ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, যে এলাকাটির একটা বড় পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য দপ্তরের অফিস হিসেবে।

কিন্তু আমার গন্তব্য মির্জা গালিব স্ট্রিট পর্যন্ত নয়, তার আগেই ১০ নম্বর বাড়িতে, যে-বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাস করেছিলেন ইংরিজি আঠারোশো বিরাশি, বাংলা বারোশো উননব্বই সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘প্রভাত সংগীত’এর কবিতাগুলি। এই পাড়াটা তখন খ্যাত সাহেবপাড়া নামে, কিন্তু সেখানে কিছু বাসিন্দা ছিলেন যারা এ-দেশীয়।

আমি পৌঁছেছি সন্ধেবেলা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যটি দেখেছিলেন প্রাতের প্রথম মুহূর্তে। আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি রবীন্দ্রনাথের সামনে ফুটে-ওঠা দৃশ্যপট কল্পনা করে নিতে কেননা সদর স্ট্রিটের ইতিহাস-ভূগোল সবই বদলে গিয়েছে এখন। আমার ভূমিকা এক নীরব দর্শকের। আমার মানসচক্ষু তখন আবিষ্কার করছে সেই রবীন্দ্রনাথকে যিনি এই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনুভব করেছিলেন: ‘দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।’

সেই অনুভূতি দিয়েই তিনি অতঃপর লিখলেন:

‘জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠিছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।’

আমি তখন চেষ্টা করছি মনের ক্যানভাসে আঁকতে আজি হতে শতাধিক বৎসর পূর্বের সেই সদর স্ট্রিট। তখন তো ছিল না এরকম—ঘিঞ্জি, সস্তার হোটেল-পরিবৃত এই প্রেক্ষাপট। ছিল না ঘন ঘন গাড়ির হর্নের বিশ্রী আওয়াজ। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উলটে হাঁটছি সেই ‘আনন্দে ও সৌন্দর্যে তরঙ্গিত’ পুরনো কালের রাস্তায়। সে খুব বেশিদিনের কথা নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তার ২ নং

বাড়িতে বাস করেন সেন্ট পলস স্কুলের সেক্রেটারি আর টি সিভেস্টার, তার কটা বাড়ি পরে এক নিলামদার কোম্পানি— ম্যাকেঞ্জি লায়াল অ্যান্ড কোম্পানির কর্তা জে ওয়াটসন। আর একটু এগিয়ে ১০নং বাড়িতে খুব স্বল্পকালের জন্য বাস করতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর একটু এগিয়ে ১২ নং বাড়িতে এক বিখ্যাত অ্যাটর্নি এন টি ডেনম্যান। তার পরের ১৩ নং বাড়িতে কলভিন অ্যাইস অ্যান্ড কাউই কোম্পানির একজন ক্লার্ক আর কে উইলসন।

এত কাল পরে, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি এক অপার বিস্ময়ে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা বলছে সদর স্ট্রিট নামকরণের অনেক আগে, এই রাস্তার কিছু অংশের নাম ছিল ফোর্ড স্ট্রিট, কিছু অংশের নাম ছিল স্পিক স্ট্রিট।

ফোর্ড সাহেবের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তৎকালীন কলকাতার দুটি বিখ্যাত নকশায়, তার একটি আঁকা হয়েছিল সতেরোশো চুরাশিতে, এঁকেছিলেন উড সাহেব, অন্যটি সতেরোশো চুরানব্বইয়ে আঁকা, নকশাটির প্রস্তুতকারক আপজন সাহেব।

স্পিক সাহেব সম্পর্কে যা জানা যায়, তিনি ছিলেন সতেরোশো উননব্বই থেকে আঠারোশো এক পর্যন্ত- দীর্ঘ বারো বছর ধরে কাউন্সিলের সদস্য। তাঁর বসতবাড়িটি ছিল বর্তমান ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের এলাকার মধ্যে। বাড়ির চতুর্দিকে ছিল মস্ত পাঁচিল, সেই পাঁচিলের একটা অংশ গিয়ে ঠেক খেয়েছিল কিড স্ট্রিটে। তাঁর বাড়ির প্রধান ফটকে পাহারায় থাকত উর্দিধারী সিপাহিরা। সেই সিপাহিদের টপকে এক ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ শিখ তার আরজি পেশ করতে চেয়েছিল স্পিক সাহেবের কাছে। স্পিক সাহেব বাড়িতে সেই আরজি নিতে অস্বীকার করায় সেই বিরক্ত শিখ সিপাহিদের বাধা অতিক্রম করে জোর করে ভেতরে ঢুকে এক চাকরকে খুন করে, তারপর সোজা দোতলায় উঠে যায় ও অন্যদেরও খুন করার হুমকি দিতে থাকে। সে এক থরহরিকম্প অবস্থা! শেষে স্পিক সাহেব তাঁর সিপাহিদের হুকুম দিয়েছিলেন সেই শিখকে হত্যা করতে।

তবে স্পিক সাহেবের নামে এই কাহিনিও প্রচলিত যে, তিনি যথেষ্ট সহৃদয়ও ছিলেন, তাঁর বাড়ির পাঁচিলে একটি ফাঁকা জায়গা রেখেছিলেন যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা পানীয় জল নিতে পারে তাঁর বাড়ি থেকে। এই বাড়ি সম্পর্কে অপর কিংবদন্তি হল এখানকার কোনও একটি ঘরে ফাঁসি দেওয়ার আগে বন্দি করে রাখা হয়েছিল মহারাজা নন্দকুমারকে।

আঠারোশো এগারো সালে, ছেষট্টি বছর বয়সে স্পিক সাহেব মারা যান, পরবর্তীকালে

এখন যদি সেই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন, এসে দাঁড়াতেন বাড়ির সেই বারান্দায়, তবে দেখতে পেতেন ভরা দুপুরে কোনও বিদেশি-বিদেশিনী যুবক-যুবতী একে অপরকে জড়িয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ১০ নং সদর স্ট্রিট, কিংবা কোনও প্রৌঢ় বিদেশি দম্পতি হাতে ঠিকানা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনও একটি সস্তা আস্তানা...

স্পিক সাহেবের সেই বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল সরকারকে, ব্রিটিশ সরকার সেই বাড়িতে স্থাপন করেছিলেন একটি কোর্ট যার নাম ছিল সদর কোর্ট। এই রাস্তার নাম তখন থেকে সদর স্ট্রিট নামেই পরিচিত। সেই বাড়িটি কিছুকাল আগেও ছিল মিউজিয়ামের এলাকার মধ্যে। সদর দেওয়ানি আদালত পরে স্থানান্তরিত হয় অন্যত্র, এই বাড়িতে তখন শুরু হয় সদর বোর্ড অব রেভেনিউয়ের অফিস।

সেই রাস্তা আজ বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের কারণে। তাঁর লেখায় উল্লেখিত ফ্রি স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই সালে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সাহেবদের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য এই অবৈতনিক বিদ্যালয়। অনুমান করে নেওয়া যায় তখন রাস্তা ছিল না এমন প্রশস্ত আর ঝকঝকে, ছিল না এমন ব্যস্ততা আর ভিড়, কিন্তু ছিল প্রতি বাড়িতে চওড়া আঙ্গিনা, ছিল চারদিকে প্রচুর গাছগাছালি। পরিবেশটাই ছিল এমন সুন্দর যে, কবি প্রকাশ করেছেন তাঁর সেই মুগ্ধতা ও জীবনকে নতুনভাবে হৃদয়ঙ্গম করার অভিব্যক্তি।

'আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারী আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত। সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর-এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না- বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারি দিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পারিতাম।'

সেই নিবিড় আত্মমগ্নতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের এক গভীর অর্থ। নিশ্চিতভাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর কাব্যজীবনের এক নতুন বাঁক। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতী পত্রিকায়, বারোশো উননব্বইয়ের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়।

আমি তখন ফিরে এসেছি একবিংশ শতাব্দীতে। তাকিয়ে দেখছি সেই রোম্যান্টিক রাস্তার বর্তমান অবস্থা। সন্ধের আলো নিভে জ্বলে উঠেছে নিয়ন শহর। সেই এলাকা এখন দখল করে আছে নানা ধরনের সস্তার হোটেল যেখানে বাইরে থেকে নানা ধরণের বিদেশিরা খরচ বাঁচাতে রাতের শোয়াটুকু সারেন কোনও মতে, আর সারাটা দিন কাটান তাঁদের যার-যার অভীষ্টে। এইসব হোটেলে এখন পাওয়া যায় গাঁজা, মদ, কোকেন, এমনকী হেরোয়িন পর্যন্ত। নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে হোটেলগুলো। কিছুকাল আগেও ১০ নং বাড়িতে হয়ে গিয়েছে পুলিশি অনুপ্রবেশ যা শুনলে নিশ্চয় চমকে উঠতেন রবীন্দ্রনাথ।

এখন যদি সেই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন, এসে দাঁড়াতেন বাড়ির সেই বারান্দায়, তবে দেখতে পেতেন ভরা দুপুরে কোনও বিদেশি-বিদেশিনী যুবক-যুবতী একে অপরকে জড়িয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ১০ নং সদর স্ট্রিট, কিংবা কোনও প্রৌঢ় বিদেশি দম্পতি হাতে ঠিকানা নিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোনও একটি সস্তা আস্তানা, বা সন্ধের ঝোঁকে কোনও পতিতা দরাদরি করছে তার খদ্দেরের সঙ্গে, অথবা কোনও বারান্দার কোণে গাঁজার আসর বসিয়েছে হাড়গিলে কিছু মধ্যবয়স্ক লোক, সেখানে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কিছু উশকোখুশকো চুলের বসা-চোখ যুবক, বা কোনও গলিতে ছোট ছোট প্যাকেটে হেরোয়িন নিয়ে গোপনে অপেক্ষা করছে কিছু ধুরন্ধর দালাল, বা মধ্য রাতে একের পর এক মাতাল জড়ানো গলায় গান করতে করতে বা অশ্রাব্য গালাগাল দিতে দিতে বা টলায়মান অবস্থায় হেঁটে যাচ্ছে অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে।

এত সব অসামাজিক অবয়বের কোনওটির দিকে ছুটে গিয়ে কোনও পুলিশ হয়তো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পংক্তি ধার করে বলে উঠবে, হ্যান্ডস আপ। হাত তুলে ধরো।

ক য়ে ক টি চি ঠি

নলহাটির ঠিকানা?

'কালের কষ্টিপাথর' মে-জুন সংখ্যায় শ্রদ্ধাভাজন অমিতাভ চৌধুরির 'মহাজনসঙ্গ' স্মৃতি-ভাষ 'প্রেমেন্দ্র মিত্র' পড়লাম। বড় ভালো লাগল। চৌধুরি মশাইয়ের লেখায় জানলাম— আমার প্রিয় লেখক-কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র শৈশবে কোনও এক সময়ে নলহাটিতে বাস করতেন। এ-সম্পর্কে চৌধুরি মশাইয়ের কাছে আমার দুটি জিজ্ঞাস্য: (১) প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন সময়, কোথায়, কার কাছে নলহাটিতে থাকতেন, কোথায় পড়াশুনো করতেন? (২) তাঁর পিতা-মাতার নাম পরিচয় কী?

অশীতিপর বৃদ্ধ পত্রলেখক একসময় নলহাটি হরিপ্রসাদ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে নলহাটির প্রাচীন ঐতিহ্য ও বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে গবেষণারত।

অনুগ্রহ করে আমার জিজ্ঞাস্যর নিরসন করলে বাধিত থাকব।

বিশ্বরূপ কাঁঠাল
নাকতলা, কলকাতা

অনুকূল প্রতিকূল বোঝার ভুল

'কালের কষ্টিপাথর' মে-জুন সংখ্যার 'কয়েকটি চিঠি' বিভাগে মিহির দত্তের পাঠানো চিঠিটি পড়ে না জানি কেন জয় গোস্বামীর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকল। শ্রীদত্ত প্রশ্ন করেছেন, কোনও সময়ই কবিতা লেখার প্রতিকূল না বলে কি কবি যে-কোনও সময়েরই সারথি হয়ে উঠতে পারেন। এর উত্তরে জয় গোস্বামীর সেই কবিতার লাইন-কটিই বলি। কবিতার নাম 'লাল'। রয়েছে 'শাসকের প্রতি' কাব্যগ্রন্থে। 'যখনই প্রেমের কথা লিখব বলে কলম খুলেছি/নিহতের দেহ এসে আমার খাতায় শুয়ে পড়ে।/খাতার প্রান্তর— তাকে/মাঝখান দিয়ে কেটে খাল বয়ে যায়/জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে থাকে লাশ গুম করবার সাইকেল ভ্যান/জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে থাকে মাথায় চাদর মোড়া ভ্যানের চালক'।

অনতিদূর অতীতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে লেখা এ কবিতা। অর্থাৎ শ্রীদত্তের প্রশ্নটি চিরন্তন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে বলার, যে সাক্ষাৎকারের (অর্থাৎ তার আগের সংখ্যায় 'কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা-কবির উত্তর' শীর্ষক ধারাবাহিকে শ্রীশঙ্খ ঘোষের উত্তর) প্রেক্ষিতে শ্রীদত্তের এহেন উপলব্ধির প্রকাশ, সেই কথোপকথনটি বুঝতে শ্রীদত্তের কিঞ্চিৎ উদাসীনতাজনিত ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। শঙ্খবাবু 'কোনও সময়ই কবিতা লেখার প্রতিকূল নয়' বলে মন্তব্য করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে। ষাট-সত্তরের উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এই সময়কে কি কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার? তারই উত্তরে ওকথা বলেন শঙ্খবাবু। তার সঙ্গে পত্রলেখকের প্রতিক্রিয়ার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

বরং মিহিরবাবু শঙ্খবাবুকে করা 'কবিতা-পরিচয়'-এর পক্ষে প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে শঙ্খবাবুর বক্তব্যে, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কিছু উপাদান অবশ্যই পেতেন বলে মনে করি। প্রশ্ন মিলিয়ে উত্তরগুলি পড়লে মিহিরবাবু তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন।

অনিরুদ্ধ বসু
সখেরবাজার, বেহালা

সার্থক মিস্ত্রি, সার্থক কেরানি

আপনার স্বনামধন্য মাসিক পত্রিকা 'কালের কষ্টিপাথর'-এর নিয়মিত পাঠক হলেও গ্রাহক হওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এবার আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। বিশেষ করে 'রাজশেখরের ছেলেবেলা' ও চল্লিশের দশকের কবি 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা ও চিঠি' এর আকর্ষণ অমোঘ।

চন্দ্রশেখর বসু ও লক্ষ্মীমণির চার পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে চতুর্থ সন্তান রাজশেখর ও কনিষ্ঠ গিরীন্দ্রশেখর বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। গিরীন্দ্রশেখর বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। কলকাতার তিলজলায় লুম্বিনী পার্ক মানসিক চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম অবদান। মধ্যম ভ্রাতা রাজশেখরের মতো তিনিও তাঁর রচনা প্রকাশে যত্নবান ছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে 'ইচ্ছার প্রকৃতি', 'সমকামিতার উৎপত্তি', 'ইচ্ছার বিশ্লেষণ', 'ইচ্ছার সুখ', 'ঈদিপাস ইচ্ছার উৎপত্তি ও উপযোজন', প্রভৃতি মৌলিক মূল্যবান গ্রন্থ চিকিৎসকসমাজকে উপহার দেন।

রাজশেখর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মার্চ (বাংলা ৪ঠা চৈত্র, ১২৮৬) মঙ্গলবার মাতুলালয়ে বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে 'বামনপাড়ায়' জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল ফটিক।

নানা প্রকার ভেষজ ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। এজন্য তাঁর পক্ষে কোম্পানির কেমিস্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া সহজ ছিল। হরীতকী ফল থেকে এক বিশেষ ধরণের কালি প্রস্তুত করেছিলেন, যা তিনি আজীবন ব্যবহার করে গেছেন। শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে নীল কালিতে মাত্র দুখানি পত্র লিখেছিলেন।

তিনি আচার খেতে খুবই ভালোবাসতেন এবং এই আচার তিনি নিজের হাতে তৈরি করতেন। নানা রকম নতুন খাবার পরীক্ষার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই করেছেন। এজন্য একবার ঘাস ভেজে খেয়েছিলেন। বলতেন এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় এক্সপেরিমেন্ট। তাঁর লেখা 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ঘাস সিদ্ধ করার কথা আছে।

মানুষ হিসেবে রাজশেখর খুবই সংবেদনশীল ছিলেন। তিনি নিজে বারো বছর বয়স থেকে নিরামিষাশী হলেও পোষা দশ-বারোটি বিড়ালের জন্য মাছ কিনতেন। তাঁর শেষ বয়সে একটির নাম দিয়েছিলেন পি-এইচ-ডি অর্থাৎ ফোকলা-দাঁতী। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তীব্র অভিমানের পরিচায়ক।

সার্থক সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তিনি সাহিত্যিক হিসেবে কদাচ দাবি করেননি। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যেমন বিশেষ বিশেষ বিদ্যা না শিখলে উকিল, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া যায় না, তেমনই স্বদেশের আর কিছু কিছু বিদেশিসাহিত্যে ভালোরকম জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তবে লেখক হওয়া যায় বটে। বাংলা আর বিদেশি সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প, সে-কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রি, আধা কেরানি। অভিধান তৈরি আর পরিভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রির কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরানির কাজ। হালকা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ তা মন্দ বললেও অনেকের তা পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় যাকে 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' বলা হয়, তার মধ্যে আমার রচনার স্থান নেই। শিশু-সাহিত্যের মতো পরশুরামের লেখাও খাপছাড়া আর বিপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে আছে।'

রণধীরকুমার দে
গল্‌ফগার্ডেন, টালিগঞ্জ, কলকাতা

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

বই-ঠক

ফিরে পড়া বই

কুলদীপ নায়ারের 'স্কুপ!'

পড়া হয়ে যাওয়ার পর বইয়েরা সাধারণত ফিরে যায় বইভর্তি শেলফে। তারপর আবার নতুন বই কেনা হয়। পুরনো বইগুলি একটু সরে গিয়ে, একটু পিছু হঠে তাদের বসার, থাকার জায়গা করে দেয়। কলকাতায় দরাজ বাসস্থানের অভাব সুবিদিত, সে আক্ষেপ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ফলে মাথা ঠোকাঠুকি করেই বসবাস, কী মানুষ, কী বই— উভয়েরই ললাটের লিখন। এভাবেই এক সময়ের কত প্রিয় বই মুখ লুকিয়ে কালাতিপাত করে। সব বই-ই দ্বিতীয়বার পঠিতব্য হয় না। কিন্তু এই যে চতুষ্পার্শ্বে এত দুর্নীতি আর রাজনৈতিক দর-কষাকষির কথা কানে আসছে, বিশেষ করে প্রশাসনে, তারপর প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই মনে পড়ল বছর ছয়ের পুরনো একটি বইয়ের নাম। অনেক বইয়ের ভিড় থেকে খুঁজেপেতে এক ছুটির দিনে বের করলাম তাকে। ২১৪ পাতার সেই বইটির নাম, 'স্কুপ!'

স্কুপ হল খবরের আগের খবর। সাংবাদিকের হাতে তা সেই অমূল্য পাশুপত, যা

ইন্দিরা গান্ধি

নেহরু নাকি বলেছিলেন, আমার পরেই 'ইন্দু' নয়, আগে লালবাহাদুর, তারপর ইন্দু। সেই ইন্দিরাই দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন। তারই ফল ১৯৭৭-এর নির্বাচনে তাঁর ভরাডুবি আর মোরারজি দেশাইয়ের বহুকালের লালিত স্বপ্ন সফল হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বে তাঁর অভিষেক।

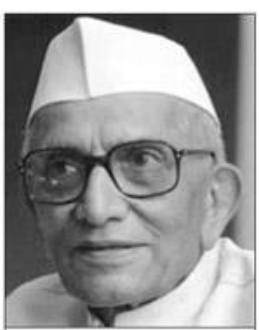

মোরারজি দেশাই

পেশার রণাঙ্গনে তাঁকে অন্যদের থেকে ধারে ও ভারে আলাদা করে। খবরের গন্ধ পেয়ে তাকে ধাওয়া করা, সঠিক মহলে যোগাযোগ এবং লুকনো খবর টেনে বের করে আনার প্রকৌশল জানা— সেই পাণ্ডপত অর্জনের যোগ্যতা। সবসময় সব ভেতরের খবর কি সত্যি হয়? যখন হয় না, তখন রথের চাকা হয়তো বসে যায় মাটিতে। কিন্তু স্কুপ বাস্তবে খেটে গেলে পেশার জগতে সাংবাদিকের মাথায় খ্যাতির মুকুটটি তো ওঠেই, সেইসঙ্গে তা যে কখনও কখনও ইতিহাসের নির্ণায়কও হয়ে দাঁড়ায় তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে এই বইয়ে।

২০০৬-এ 'স্কুপ!' যখন প্রকাশ পায়, লেখক কুলদীপ নায়ার সেসময় তাঁর আত্মজীবনী নিয়ে কাজ করছিলেন। নবতিপর শ্রীনায়ার ভারতের প্রথিতযশা সাংবাদিক, একসময়ের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তথ্য আধিকারিক ছিলেন, জরুরি অবস্থার সময় জেল খেটেছেন, ছিলেন 'দ্য স্টেটসম্যান' পত্রিকার দিল্লির আবাসিক সম্পাদক এবং ব্রিটেনে একদা ভারতের হাইকমিশনার ও রাজ্যসভার সদস্য। অন্তগামী ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনীতির তিনি শুধু একনিষ্ঠ দর্শকই নন, ঘটনাচক্রে এবং তাঁর দাবিমতো কিছু ক্ষেত্রে সেই ইতিহাসের কোনও কোনও পর্বের অনুঘটক।

শ্রীনায়ারের জন্ম অধুনা পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। দেশভাগের পর দুই পাড়ের দুর্ভাগা মানুষের সঙ্গে কাঁটাতারের বেড়া পারাপার করে থিতু হন দিল্লিতে। সেই আসার কাহিনিও সজল আন্তরিকতায় ব্যক্ত করেছেন বইটির প্রথম লেখার একটি অনুচ্ছেদে। গোটা বইটিই এরকম নাতিদীর্ঘ লেখার আয়নায় ইতিহাসের দর্শন।

১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। দিল্লির বিড়লা হাউসে জনারণ্য। মহাত্মা গান্ধি গুলিবিদ্ধ, প্রয়াত। থেকে থেকে গুমড়ে উঠছে কান্নার মতো স্লোগান— 'গান্ধি অমর রহে'। ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হচ্ছে 'স্কুপ!'-এর নাতিদীর্ঘ রচনাপুঞ্জ। দেশভাগের বিভীষিকার পর স্বাধীন ভারতাত্মার আবেগে বোধহয় সেই দ্বিতীয় বড় আঘাত। নেহরু উঠে দাঁড়িয়েছেন বিড়লা হাউসের পাঁচিলের ওপর। চোখের জল মুছে জনারণ্যের দিকে চেয়ে ঘোষণা করছেন, 'আমাদের জীবন থেকে মুছে গিয়েছে সেই আলো...।'

পরবর্তী অধ্যায়েই নায়ার চলে যান মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার প্রসঙ্গে। তখন বেশ বোঝা যায় দেশভাগ এক দগদগে ক্ষত হয়ে রয়েছে তাঁর মনে। ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা দেশ অবশ্যই চেয়েছিলেন জিন্না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মনে পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক কাঠামো নিয়ে যে একধরনের উচ্চাশা ছিল, তা বোঝাতে পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলিতে জিন্নার বক্তৃতার অংশ তুলে ধরেছেন নায়ার। অনেক হিন্দু সেসময় তাঁর কথায় আশ্বস্ত বোধ করেছিলেন। যদিও সে স্বস্তি সার্বিকতা পায়নি। এবং দুই দেশের মধ্যে ঘোরতর অবিশ্বাসের বীজ বোধহয় সেসময় থেকেই উপ্ত হয়। ছেড়ে আসা দেশের জন্য মনোবেদনা জুড়োতে না জুড়োতে শুরু হয়ে যায় দু-দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে মন কষাকষি। তার একটা ভূখণ্ডগত, অমীমাংসিত সীমানার জন্য। অন্যটা পাকিস্তানের দাবিমতো অবিভক্ত ভারত সরকারের ক্যাশব্যালান্সের ভাগাভাগিতে সামঞ্জস্যের অভাব হেতু। নেহরু জমানা শেষ হয় বড়ই মর্মান্তিকভাবে। ১৯৬৪-র ২৭ মে বাথরুমে পড়ে যান নেহরু এবং তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। বিষণ্ণ কংগ্রেসের মধ্যে নেহরুর উত্তরাধিকারীর খোঁজ শুরু হয়। কংগ্রেসের অন্দরে তখন প্রধানমন্ত্রী পদের মুখ্য দাবিদার দুজন— যথাক্রমে লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং মোরারজি দেশাই। শেষপর্যন্ত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কপালেই শিকে ছেঁড়ে, সে অঙ্কও মিলেছিল বহু প্রচেষ্টায়, তেমনই দাবি লেখকের। তখনকার কংগ্রেস নেতৃত্বের টানাপোড়েন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য আর প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন নায়ার। এবং এই প্রসঙ্গে তাঁরও কিছু অবদানের কথা নিবেদন করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধি তখনও তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী। নেহরু নাকি বলেছিলেন, আমার পরেই 'ইন্দু' নয়, আগে লালবাহাদুর, তারপর ইন্দু। তাসখন্দে তৎকালীন সোভিয়েত দেশের মধ্যস্থতায় ভারত-পাকিস্তানের বৈঠকে গিয়ে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর 'বিতর্কিত' মৃত্যুর পর ভারতীয় রাজনীতি তথা কংগ্রেসের একটি অংশের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠলেন ইন্দিরা। তারপর কী করে কামরাজ, অতুল্য ঘোষ, মোরারজি, ওয়াই ভি চহ্বন, নীলম সঞ্জীব রেড্ডি প্রমুখ কংগ্রেসের সনাতনি দ্বাররক্ষকদের প্রভাব সুকৌশলে খর্ব করে ইন্দিরা ধাপে ধাপে কংগ্রেসের একেশ্বরী হয়ে উঠতে লাগলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন নায়ার।

নেহরুর সোশ্যালিস্ট ভারতের স্বপ্ন তাঁর কন্যার কাছেও সাদরে গৃহীত হল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে জনগণের কাছের মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। এরপর, পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতায় তাঁরাই আসবেন, যাঁদের জনগণ চায়। পার্টি কাদের চায়, এ প্রশ্ন ব্রাত্য— এই ধারণা দলের ভেতর চাগিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্য বাড়িয়ে তুললেন ইন্দিরা। একদিকে সোভিয়েত দেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বজায় থাকল, অন্যদিকে দলের ভেতরের বিরোধের প্রেক্ষিতে এদেশের কমিউনিস্টদের আস্থাও তাঁর কাজে লাগল। অথচ, সেই ইন্দিরাই এক দশকেরও কম সময়ের ব্যবধানে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন।

তারই ফল ১৯৭৭-এর নির্বাচনে তাঁর ভরাডুবি আর মোরারজি দেশাইয়ের বহুকালের লালিত স্বপ্ন সফল হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্বে তাঁর অভিষেক।

কুলদীপ নায়ারের আখ্যান ভারতের ইতিহাসের এই তটরেখা ধরেই এগিয়েছে এবং অলংকারের মত ফেলতে ফেলতে গিয়েছে এই ইতিহাস তৈরির নেপথ্যে সূক্ষ্ম ও কূট সমীকরণগুলিকে। সেই সমীকরণের সংখ্যাগুলি যাঁদের হাতে, তাঁরা নায়ারের প্রাঞ্জল বর্ণনায় হয়ে উঠেছেন মহাভারতীয় একেকটি চরিত্র।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জাহিরুল হাসানের 'মুসলমানকোষ'

মুসলমানদের ব্যাপারে এতদিন অমুসলমানদের যা-যা অজানা ছিল, একখানি অভিধান সেসব সহজবোধ্য করে দিয়েছে। যেমন, সেখানে বলা হয়েছে, 'আতরাফ— এটি মূলে আরবি শব্দ, যার অর্থ নিম্ন সমাজ বা বংশের মানুষ। এর মধ্যেও আবার দুটি ভাগ, আজলাফ ও আরজাল। যাঁরা হিন্দু বা অন্য কোনও অমুসলমান জাতি থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাঁরা অস্পৃশ্য শূদ্র হলে আরজাল, আর অন্য বর্ণের হলে আজলাফ। বাংলার গ্রামাঞ্চলে উচ্চবংশীয় আশরাফ এবং আতরাফে ভেদাভেদ প্রবল, অনেকটা হিন্দু জাতিভেদ প্রথার মতো। যদিও ইসলাম এই জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না এবং বাস্তবিক, ভারত-পাক উপমহাদেশের বাইরে *ট্রাইব* বা *ক্ল্যান* আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ জাতি নেই।' দীর্ঘ পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় রচিত গ্রন্থখানির নাম 'মুসলমানকোষ'। রচয়িতা জাহিরুল হাসান। 'সাহিত্যের ইয়ারবুক' যাঁরা দেখেছেন, ইয়ারবুক-প্রণেতা এই সজ্জন মানুষটি সম্পর্কে নতুন করে তাঁদের কাছে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আলোচ্য গ্রন্থের সোয়া তিনশো পৃষ্ঠার পরিসরে উল্লিখিত উদাহরণটি ছাড়াও আমাদের জানাশোনার বাইরে এমন প্রয়োজনীয় তথ্য আরও অনেক আছে। একবার খুলে বসলে আর থামা যায় না। হজরত মহম্মদ (সা.) নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'রোম রাজত্বের অবসান হয়েছে, ভারতেও গুপ্তযুগের স্বর্ণকাল অতীত। এশিয়া-ইউরোপ জুড়ে হুনদের দাপাদাপি। শুধু হুন নয়, ভিসিগথ-ভ্যান্ডালদের আক্রমণেও ধসে পড়েছে রোম সভ্যতা। বিভিন্ন উপজাতির দখলে চলে গিয়েছে রোম-সহ ইউরোপের বহু অংশ। এতখানিই অবক্ষয় হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্যতার যে, গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্যও তাঁরা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিহাসের কী পরিহাস! ইউরোপকে নিজেরই সেই সম্পদ ফিরে পেতে হয় মুসলমানদের হাত থেকে। ইউরোপীয়রা নিজেরাও স্বীকার করেন যে, তাঁদের দেশে রেনেসাঁসের অনুঘটক মুসলমানেরাই, যাঁরা শুধু গ্রিক বইপত্র অনুবাদই করেননি, জ্ঞানচর্চার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন নিজেদের উদ্ভাবনী দক্ষতায়।' গ্রন্থকারের সঙ্গত প্রশ্ন, 'এসব কি সম্ভব হত হজরত মহম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাব না হলে?' হজ যে এক কঠিন ব্রত তা এ গ্রন্থে হজের রীতি-রেওয়াজের ব্যাখ্যা থেকে সহজেই বোঝা যাবে। অবশ্য এরকম শুধু ধর্মীয় ব্যাপারই নয়, এখানে অনেক চেনা-অচেনা ঐতিহাসিক ঘটনা ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আছেন অ্যালজেব্রার জনক আল-খওয়ারিজমি, রেনেসাঁসের জন্য ইউরোপীয়রা যাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী সেই ইবন রুশদ, মধ্যযুগের মুসলমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ইবন সিনা, বাংলার মুসলমান আমলের প্রথম সম্পূর্ণ ইতিহাস-রচয়িতা গোলাম হুসেন সালিম, বাংলার প্রথম মুসলমান মহিলা ঔপন্যাসিক নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাওয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা ফজিলতুন্নেসা, ভারতে মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রধান প্রেরণাদাতা শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ষোলো শতকের বিশিষ্ট কবি 'গোরক্ষবিজয়' কাব্যের রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লা। আছে 'আলিফ লায়লা' (বাঙালি পাঠকের কাছে যা 'আরব্য উপন্যাস' নামে পরিচিত), মুসলমানি চিকিৎসাশাস্ত্র 'ইউনানি', পাটনার বিখ্যাত 'খোদাবক্স ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরি', স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের সহযোগী সংস্থা 'জমিয়ত উলামা-এ-হিন্দ', ঢাকার নবাব পরিবার, নয় শতকে নির্মিত বাগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকের অনুবাদকেন্দ্র 'বায়তুল হিকমা', বাংলার প্রথম সচিত্র মহিলা সাপ্তাহিক 'বেগম', ব্রিটিশ আমলে চালু করা 'মুসলিম পার্সোন্যাল ল', হাল আমলের 'সাচার কমিটি'। এ ছাড়াও বইখানিতে আছে বাঙালি মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত অথচ সাধারণ বাংলা অভিধানে অলভ্য ষোলোশো'র বেশি শব্দের অর্থ, প্রায় সাড়ে সাতশো মুসলমান ব্যক্তিনামের অর্থ, বিশ্ব, ভারত ও বাংলার মুসলমানের নানা পরিসংখ্যান, ইতিহাসপঞ্জি, মুসলমান দেশপরিচয়, বিশ্বের আধুনিক কালের কৃতী মুসলমানদের তালিকা, একালের বিখ্যাত ধর্মান্তরিত মুসলমানদের নাম-পরিচয় ইত্যাদি অজস্র তথ্য। পরিশেষে আছে পাঠকের সুবিধার জন্য নির্ঘণ্ট। বইখানি হাতের কাছে রাখলে জ্ঞানবিকাশে তো বটেই ব্যবহারিক জীবনেও অনেক কাজেই লাগবে।

মনোজকুমার দ গিরিশ

'বেগম'-এর প্রথম দিকের একটি সংখ্যা

আব্বাসিদ পাঠাগারে পঠনপাঠন

বাংলার গ্রামাঞ্চলে উচ্চবংশীয় আশরাফ এবং আতরাফে ভেদাভেদ প্রবল, অনেকটা হিন্দু জাতিভেদ প্রথার মতো। যদিও ইসলাম এই জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না এবং বাস্তবিক, ভারত-পাক উপমহাদেশের বাইরে *ট্রাইব* বা *ক্ল্যান* আছে, কিন্তু উচ্চ-নীচ জাতি নেই।

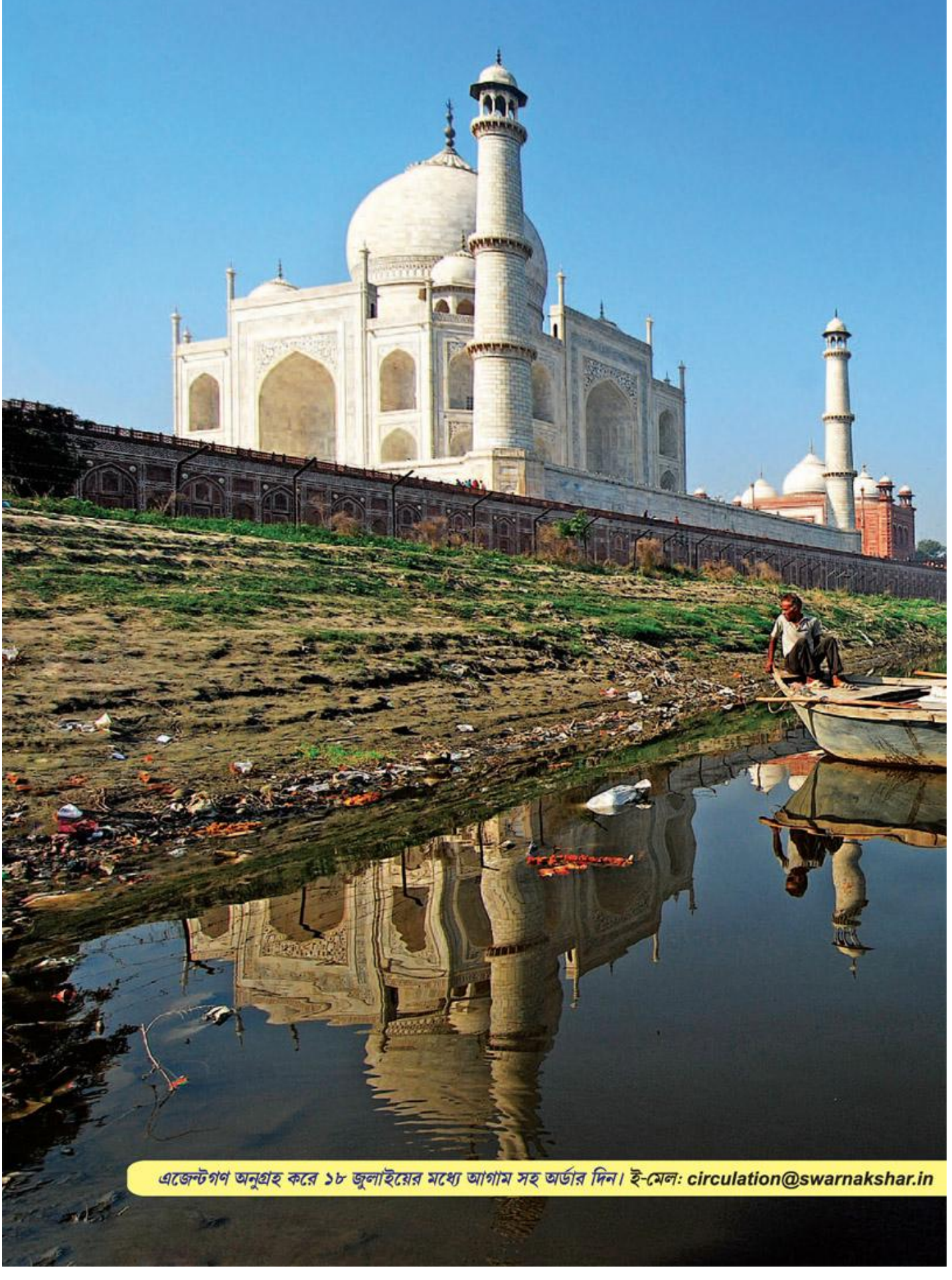

এজেন্টগণ অনুগ্রহ করে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে আগাম সহ অর্ডার দিন। ই-মেল: circulation@swarnakshar.in

পুজো এলে
পুজোর ভ্রমণ
কি আর দূরে থাকে ?
পুজোর
ভ্রমণ
গাইড
২০১৩
দেশ-দেশান্তরের দিগন্ত ছুঁয়ে তৈরি হচ্ছে
শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।
দাম ৯০ টাকা।
সঙ্গে বিনামূল্যে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
আশ্চর্য ভ্রমণ-ভিসিডি
আদিম উগান্ডা
আপনার কপি নিশ্চিত পেতে হলে সংবাদপত্র-বিক্রেতাকে বা পত্রিকাস্টলে এখনই বলে রাখুন

মতি নন্দীর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান'

স্বাধীনোত্তর কালের বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নে মতি নন্দীকে নিয়ে বড় মাপে আলোচনার যে প্রয়োজন ছিল, সেদিকে খুব একটা নজর দেওয়া হয়নি। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো এই যে, মতি নন্দীর সাহিত্যকৃতি পরিমাণে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের তুলনায় নেহাতই স্বল্প। জীবনকালের একটা বৃহৎ পরিসরজুড়ে তাঁকে সংবাদপত্রের কলমচির কাজে আত্মবিনিয়োগ করতে হয়েছে। বাংলায় ক্রীড়াসাংবাদিকতার খোলনলচে বদলে দেওয়ার কারিগর তিনি। আজও বাংলা ভাষায় খেলার লেখায় তাঁরই দীর্ঘ ছায়া পড়ে থাকতে দেখতে পাই। উপরন্তু প্রখর পারফেকশনিজমের জন্য শুনেছি, একই গল্প বা উপন্যাসের একাধিক পাণ্ডুলিপি হত তাঁর। এই পুনর্লিখন একটা বড় সময় দাবি করত নিশ্চয়ই। ফলে মতি নন্দীকে নিয়ে যে সামান্য চর্চা এখনও হয়, তা তাঁর ক্রীড়াসাংবাদিক-সম্পাদক পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর খেলা-সংক্রান্ত কিশোরপাঠ্য কিছু উপন্যাস-গল্প নিয়ে। সকলেই জানেন, আশির দশকে আনন্দবাজারে তিনি নিয়মিত লিখতেন কলকাতা ময়দানে সেসময় নামকরা তরুণ খেলোয়াড়দের প্রকৃত জীবনের কথা, জীবনসংগ্রামের কথা। খুঁজে খুঁজে তাঁদের বের করতেন গোয়েন্দার দৃষ্টিতে। কলকাতায় ফুটবল খেলে তখনও বিলাসে জীবন কাটানো যেত না। বড়জোর সরকারি একটা চাকরি মিলত। তাঁর কলমে এক বিখ্যাত খেলোয়াড়ের হাওড়া স্টেশনে মই বেয়ে ওপরে উঠে গোল বড় ঘড়ি মোছার চাকরির বৃত্তান্ত পড়ে কত সমর্থকের মনে যে শেল হেনেছিল, তার লেখাজোখা নেই। লুকিয়ে আঁচলের খুঁটে চোখের জল সামলেছিলেন কত স্নেহশীলা গৃহবধূ!

আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, মতি নন্দী অসামান্য কিছু ছোটগল্প আর উপন্যাস লিখে গিয়েছেন যা খেলার জগতের বাইরে এবং আমাদের দৈনন্দিনের জীবনচর্যার সুরে বাঁধা।

এইসব কারণে আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, মতি নন্দী অসামান্য কিছু ছোটগল্প আর উপন্যাস লিখে গিয়েছেন যা খেলার জগতের বাইরে এবং আমাদের দৈনন্দিনের জীবনচর্যার সুরে বাঁধা। তাঁর প্রায় সব সর্বজনপাঠ্য উপন্যাস ও গল্পেই সমকাল ধরা দিয়েছে নানাভাবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বাইরেও নরনারীর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণে এবং দেখানোতেও তিনি সমান সাবলীল ছিলেন। সেই আশির দশকেই তিনি লিখেছিলেন আশ্চর্য এক নভেলেট— 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান'।

মনে রাখতে হবে সব সাহিত্যকৃতির সঙ্গে 'আশ্চর্য' কথাটা খাপ খায় না। কিন্তু এই উপন্যাসটির সঙ্গে যায়। কেন, সেকথা বলা যাক এক-এক করে। প্রথমত, দেশভাগের আধশুকনো যন্ত্রণাময় ক্ষত একদিকে, আরেকদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপুল বিস্তার আর উত্তর কলকাতার তথাকথিত খানদানি বিলাসবহুলতার পলেস্তারা খসে গিয়ে হাড় বের করা কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই উপন্যাস।

দ্বিতীয়ত, কাহিনির ব্যাপ্তিকাল মাত্র একটি সন্ধ্যা। এত অল্প সময়কে ভিত্তি করে পৃথিবীতে আর কোনও এমন মাপের ও মানের উপন্যাস রচিত হয়েছে বলে জানা নেই। এবং তৃতীয়ত, উপন্যাসের রীতি মেনেই হাজির হয়েছে অনেকগুলি চরিত্র, যাদেরকে একটা সন্ধ্যার মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যে পুরে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং লেখকের অনবদ্য মুন্সীয়ানায় প্রত্যেকটি চরিত্র তাদের মনের অন্দর-বাহির, রক্ত-মাংস সমেত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

উপন্যাসটি প্রথম পড়েছিলাম সেই আটের দশকেই, যখন তা কোনও সাময়িক পত্রে প্রকাশ পায়। তবে দীর্ঘ কয়েক দশক পরে এই সেদিন যখন 'মতি নন্দীর উপন্যাস সমগ্র'-র প্রথম ভাগটি হাতে এল, তাতে এই ছোট উপন্যাসটি রয়েছে দেখে আবার পড়তে ইচ্ছে হল এবং আগের মতোই ভালোলাগায় ভরে গেল মন।

এ উপন্যাস শুরু হয় (এবং শেষও হয়) উত্তর কলকাতার প্রাচীন এক সরু গলিতে, যা অসংখ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বাসাবাড়িতে পূর্ণ। সেই বাসাগুলি ভরে আছে নানা ধরণের ও নানা পেশার মানুষজনে। লেখক প্রায় ধারাবিবরণী দেওয়ার মতোই নৈর্ব্যক্তিক স্বরে দিয়ে যান এই সরু ও নাতিদীর্ঘ গলির শরীরের বর্ণনা— আস্তাকুঁড়, টিউবওয়েল, ইলেক্ট্রিক বাতি, খাটাল, পাঠশালা, পথচলতি মানুষের কানে আসা রেডিও এবং ক্রন্দনরত শিশুর সংখ্যা সহ।

উপন্যাসের একেবারে সূচনায় দেখা যায়, পথচারীদের কাছে আপাত-ব্রাত্য এই গলিতেই অপ্রত্যাশিতের মতো ঢুকেছে একটি বড় বিদেশি গাড়ি। গাড়ি থামিয়ে নেমে আসে এক সুদর্শন যুবা এবং হাতের কাছে পাড়ার ছেলে এবং পাড়া-বেপাড়ায় খেপ খেলে বেড়ানো ফুটবলার অসীমকে দেখতে পেয়ে পাড়ারই একটি বিশেষ বাড়ি দেখিয়ে দিতে বলে। যুবকটিকে চিনতে পেরে অসীম শিহরিত হয়। এ যে বাংলা সিনেমার সেই বিখ্যাত নায়ক, যার সব সিনেমার সব শো হাউসফুল, মহিলারা যাকে দেখার জন্য আকুল।

মুহূর্তে নায়কের আসার খবর রাষ্ট্র হয়ে যায় পাড়ায়। অসীমের জন্য তো বটেই, শেফালির জন্যও। শেফালি কিঞ্চিৎ পুরুষালি গড়নের নারী। অপমান সইতে না পেরে স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে। ভাইদের সংসারে খিদমত খাটে এবং পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে পরচর্চা করে সময় কাটায়।

নায়ককে সবচেয়ে ভালোভাবে সামনে থেকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন পাড়ার মহিলারা। যে বাড়িতে নায়ক এসেছেন তার আশপাশের বাড়ির জানলায় জড়ো হতে চলেন তারা। আর এই অবসরে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে বাড়ির মধ্যে ও বাইরে পাড়ার মানুষগুলির আন্তঃসম্পর্ক। প্রফেসর হিরণ্ময় এবং শ্যালিকা আভা, পাড়ার একমাত্র বনেদি বাড়ির ভগ্নাবশেষের মালিক অনন্ত সিংহ এবং তার প্রতিবেশী ও ছোটবেলার বন্ধু বাসুদেব, অফিসে যাওয়ার সময় ও ফিরে চোদ্দোবার টিউবওয়েল পাম্প করে রাস্তা ধোয়ানো শুচিবায়ুগ্রস্ত সত্যচরণ এবং কাজের মহিলা আঙুর, অশোক ও তার স্ত্রী ইলা এবং তাদেরই একতলার বাসিন্দা সন্তানহীনা পারুল, বাসুদেবের প্রেম করে বাড়ি-পালানো মেয়ে এবং অবদমিত স্ত্রী

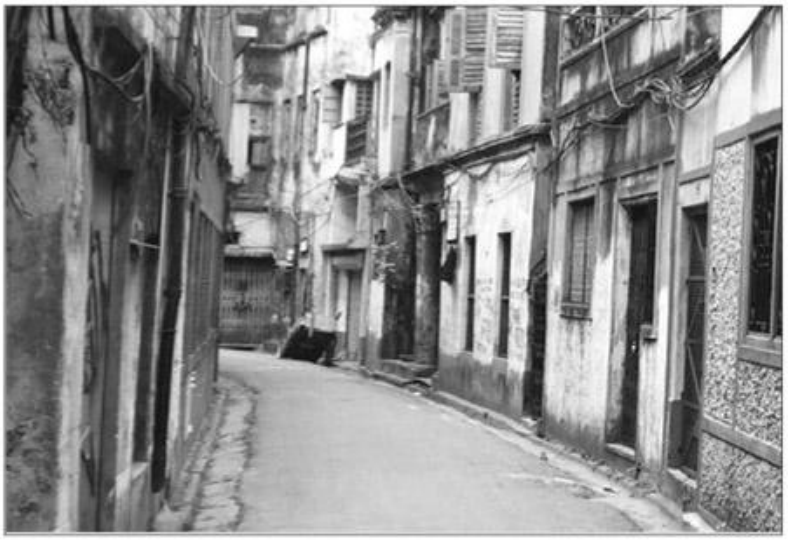

এরই মধ্যে পাড়ায় ঝপ করে লোডশেডিং হয় এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে চরিত্রগুলি যেন আক্ষরিক অর্থেই হাঁচোড়পাঁচোড় করে আলোয় বেরিয়ে আসতে থাকে। পাড়ার বউমেয়েদের নায়ককে দেখা আর হয় না, কেননা লোডশেডিংয়ের মধ্যেই তিনি পাড়া ছেড়েছেন।

রাধারানি, পাড়ার ভারিক্কি ভাবের যুবক দ্বারিক এবং কালো একহারা চেহারার মনীষা— এইসব চরিত্রগুলির মধ্যের টানাপোড়েন যেন এক বিরাট মঞ্চের ভাগ করা কম্পার্টমেন্টে চোখের সামনে ঘটে যেতে থাকে। কেননা জীবনের সেই সত্য মুহূর্তগুলির প্রকাশে যারা বাধা হতে পারত, তারা সকলেই গিয়েছে নায়ক-দর্শনে। এমনকী গিয়েছে শেফালিও, এ পাড়ার কোনও খবরই যার চোখ কিংবা কান এড়ায় না।

এরই মধ্যে পাড়ায় ঝপ করে লোডশেডিং হয় এবং গাঢ় অন্ধকারের মধ্য থেকে চরিত্রগুলি যেন আক্ষরিক অর্থেই হাঁচোড়পাঁচোড় করে আলোয় বেরিয়ে আসতে থাকে। পাড়ার বউমেয়েদের নায়ককে দেখা আর হয় না, কেননা লোডশেডিংয়ের মধ্যেই তিনি পাড়া ছেড়েছেন।

উপন্যাসটি শেষ করে মনে হয়, নায়ক এ কাহিনির প্রকৃত নায়ক নয়, চরিত্রগুলিও কেউ নায়ক অথবা নায়িকা নয়। এ উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক উত্তর কলকাতার সেই ক্লিন্ন গলি। মতি নন্দী নিজেও এরকমই এক গলিতে বাস করে গিয়েছেন আজীবন। —**ক. ব.**

জাহিরুল হাসানের 'সাহিত্যের ইয়ারবুক ২০১৩' (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য কাজ বেশ কয়েক বছর ধরে করে চলেছেন গবেষক-প্রাবন্ধিক জাহিরুল হাসান। যথেষ্ট মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে। এবং বাংলার সাহিত্যসমাজে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তাঁর 'সাহিত্যের ইয়ারবুক'। ফি-বছর একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে, জানুয়ারিতেই প্রকাশ পায় মূল্যবান এই সাহিত্যপঞ্জিটি। ইদানীং এটির প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা সাহিত্যকর্মীদের সংখ্যাও বেশ বেড়েছে। ২০১৩-র বইমেলায় বেরিয়ে এপ্রিলেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হয়েছে প্রকাশককে।

এমন একটা কাজ জাহিরুল করেন, যার উপযোগিতা অসামান্য। ফলে অনেকেরই ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই সংকলন জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সারা বছরের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা বর্ষ-নির্বিশেষে বেশ কিছু জরুরি উপাদান সহ অনেক কিছুই থাকে এই গ্রন্থে। ক্রমাগত পাল্টাতে পাল্টাতে ২০১৩-র সাম্প্রতিক সংকলনে আগের ধারায় ফিরেছে 'সাহিত্যের ইয়ারবুক'। গতবছর নির্মাণ-পদ্ধতি পাল্টে প্রবন্ধভিত্তিক করা হয়েছিল। দরকারি সব তথ্যও অবশ্যই ছিল তাতে। ফলে গতবারের সংকলনটির আকর্ষণ ছিল অন্যরকম। তবুও গ্রন্থকারকে আগের ধারায় ফেরার অনুরোধ জানিয়েছিলেন পাঠকেরা। এখনকার যে রূপ এ গ্রন্থের, তাতে একটি বছরে প্রকাশিত নতুন বই, পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, পুরস্কার ও সম্মাননা, দুই বাংলার প্রয়াত কবি-লেখকদের নামের মতো গুরুত্বের তথ্য যেমন থাকছে, থাকছে কবি, লেখক, শিল্পী, পত্রপত্রিকা, পত্রপত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, প্রকাশন সংস্থার নাম-ঠিকানা, ই-মেল, ওয়েবসাইটেরও হদিশ। যার সংখ্যা প্রায় ৫,০০০।

বাংলাদেশের কবি-লেখকদের নাম-ঠিকানা নিয়ে একটি আলাদা পরিচ্ছেদ থাকছে এবং তা আকারে ক্রমে বাড়ছে— যা খুবই দরকারি। কয়েক বছর ধরে যে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জি ছাপা হচ্ছে তা যে কত কাজের, সেটা লেখাই বাহুল্য। আরেকটি মূল্যবান সংযোজন বিভিন্ন সরকারি সাহিত্য পুরস্কারের সম্পূর্ণ তালিকা। এমনিতে সাহিত্য পুরস্কারের সঠিক তথ্য পেতে প্রায় অন্ধকারে হাতড়াতে হয়। কোনও সাধারণ জ্ঞানের বইয়েও সবটা পাওয়া যায় না। এটা খুব কাজের কাজ করেছেন জাহিরুল।

সবমিলিয়ে এককথায় বলা যায় এটি বাংলা সাহিত্যের গুগল। তবে বইটি যেহেতু একক প্রয়াসে নির্মিত এবং তা নির্ভরশীল সাহিত্যকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার ওপর, ফলে কিছু ঘাটতি হয়তো থেকে যেতে পারে নামধাম ও নানাবিধ তথ্য সংযোজনের ক্ষেত্রে। যা স্বাভাবিক। তবে আগামী বছর সংকলনটি আরও বিস্তৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন জাহিরুল। ফলে প্রাপ্তিও বাড়বে অবশ্যই। এই পরিসরে একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি তাঁকে, বাচিক শিল্পীদের নাম-ঠিকানার একটা আলাদা তালিকা অন্তর্ভুক্ত হলে অনেকের কাজে লাগে, ওঁরা তো বাংলা সাহিত্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন আসলে।

অনীশ ঘোষ

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** *সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** *গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

বিষাদগাথা
দুই শতাব্দী যাপনের জীবন্ত আঁকিবুঁকি
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস

নভেম্বরে প্রকাশিত হবে। ₹২০০

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১২৫ টাকা পাঠালে নীচের ঠিকানায় আমাদের খরচে ক্যারিয়ারে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আরও অনেক
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- ✓ বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓ একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓ চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓ **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- ✓ যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের ছেলেবেলা পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছেও পাওয়া যাবে।

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 1-2 □ July-August 2013 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

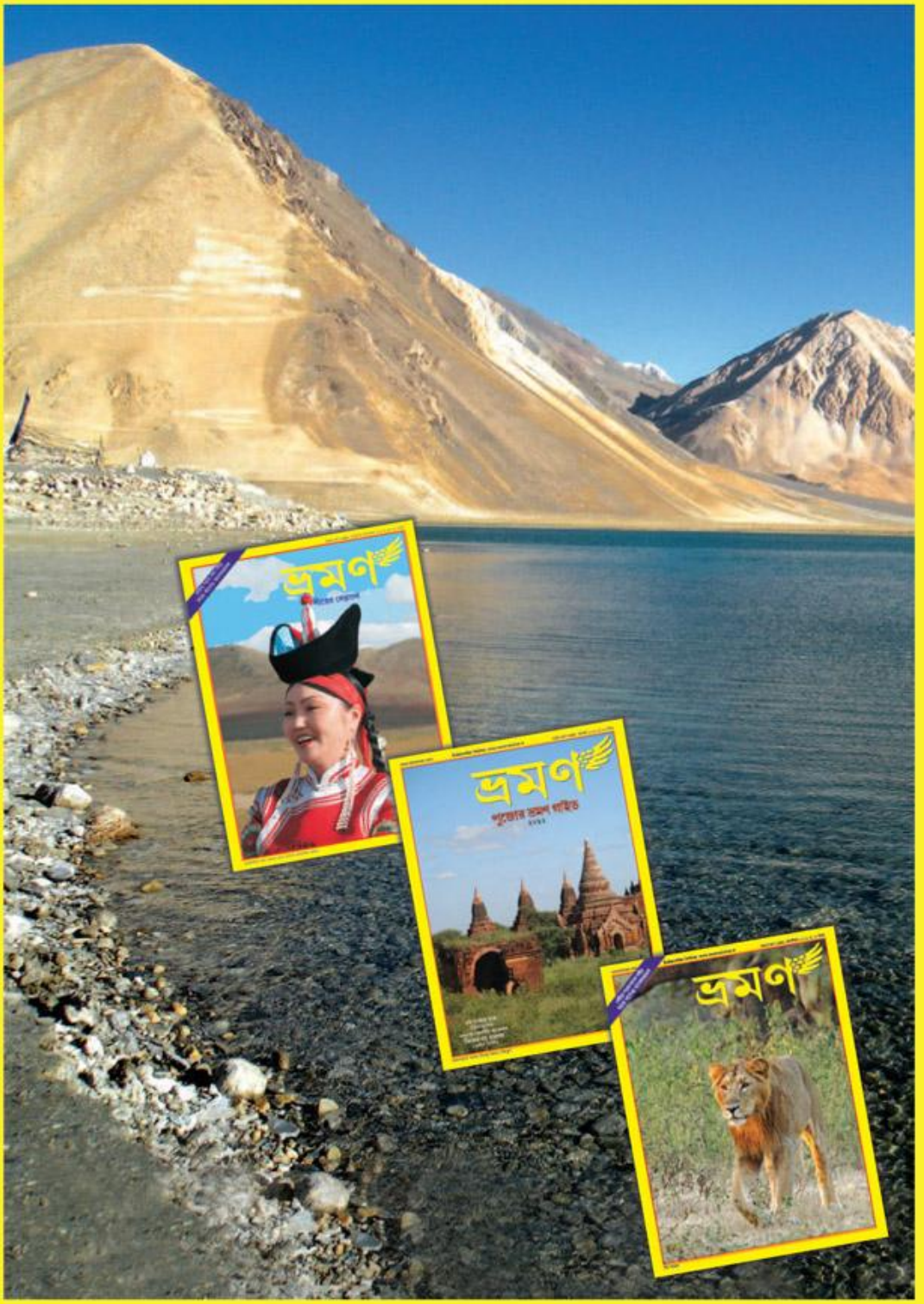

The most read travel magazine in India*

**Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4*